কুলবধূ

(উপন্যাস)

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত বি, এল,

প্রকাশক
শ্রীআশুতোষ ধর
আশুতোষ লাইব্রেরী,
৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩২৯

মূল্য ২৲ টাকা

কুলবধূ

(১)

—অন্তর্গত কুসুমপুর গ্রামে হলধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নিশিকান্ত যখন ভুবনমোহিনীকে বিবাহ করিয়া গ্রামে নিয়া আসিল, তখন গ্রামের যুবকদলের মধ্যে একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, "একেই বলে স্ত্রীভাগ্য"। ভুবনমোহিনী প্রকৃতপক্ষেই ভুবন মোহিনী।

হলধর বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার সরকারে মুহুরিগিরি কার্য্য করিয়া কোনও মতে সংসার নির্ব্বাহ করিতেছেন। বহুদিন হইল তাহার পত্নী বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু বহু কন্যার পিতার অনুরোধ উপরোধ অবহেলা করিয়া তিনি আর বিবাহ করিলেন না। অনেক পরম হিতৈষী বন্ধুগণকে অসন্তুষ্ট করিয়া তিনি একাই তাঁহার সংসার চালাইয়া নিতে লাগিলেন। নিশিকান্তের যখন ৮ বৎসর বয়স তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী বিয়োগ হয়, আজ নিশিকান্তের বয়স ২২ বৎসর। গ্রামে একটি এণ্ট্রেন্স

স্কুল ছিল, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিশিকান্তকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একাধারে পিতা ও মাতার আসন গ্রহণ করিয়া নিশিকান্তকে লালনপালন করায় নিশিকান্ত পিতাকে তেমন ভয় ও সম্মানের চক্ষে দেখিত না। জননীহারা সন্তান বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শত দোষ করিলেও পুত্রকে ভৎসনা করিতে পারিতেন না। অত্যধিক আদর ও শাসনের অভাবে নিশিকান্ত বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্দা[illegible] উঠিতে লাগিল। নিশিকান্ত বহু অধ্যবসায়ে গুণে ও অনেক বৃ[illegible] করিয়া এণ্ট্রেন্স স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিল। সেখানে সেই স্থানটি একেবারে মৌরাশি পাট্টা করিয়া দখল করিয়া লইল। [illegible] শ্রেণীর জন্য নিশিকান্তের এতদূর মমতা হইয়া গেল যে, ঐ স্থানটি আর সে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। পরিশেষে একদিন সেই শ্রেণীর মায়া মমতা চিরদিনের জন্য হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া নিশিকান্ত রীতিমত বাবু হইয়া সমাজের মধ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তখন নিশিকান্তের বয়স ১৯ বৎসর।

নিশিকান্ত বাবু হইয়া সমাজে আসার কএক দিবস পরেই সমাজের অন্যান্য কতক বাবুর সহিত তাহার পরিচয় হয় ও তাহাদের সঙ্গে সে নানা স্থানে যাইয়া নানা ভাবের জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে লাগিল। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় নিশিকান্তের এবম্প্রকারের জ্ঞান উপার্জ্জনের কথা শ্রবণ করিয়াও পুত্রকে কিছু বলিতেন না মনে মনে বলিতেন, ছেলে বয়সের দোষ, বড় হইলেই সারিয়া যাইবে। তাহার চক্ষে নিশিকান্ত এখনও ছেলে মানুষ।

হলধর বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ বুনিয়াদি লোক। যদিও তাহার আয় তেমন বেশী ছিল না, তবুও তিনি তাহা হইতেই কিছু কিছু মাসিক সঞ্চয় করিতেন। এই প্রকারে তিনি কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মনে

করিতেন, এক ছেলে বই ত আর কেউ সংসারে নাই, যা রাখিয়া গেলাম, নিশিকান্ত এক জীবন এক রকম কাটাইয়া যাইতে পারিবে।

একদিন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মনে করিলেন, নিশিকান্তের একেবারে বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকার প্রয়োজন কি, জমিদারকে ধরিয়া সেরেস্তায় একটা কিছু কাজে লাগাইয়া দেওয়া যাক্। জমিদারও তাহাতে রাজি হইলেন। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছেলেকে চিনিতে ভুল হইয়াছিল। তাঁহার ছেলে যে ইংরাজি জানা ছেলে, তাহার কি বাঙ্গালানবিশি ভাল লাগিবে? সে কি আর জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করিতে পারে? সুতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিশিকান্তের নিকট জমিদারি সেরেস্তায় চাকরি করার প্রস্তাব করামাত্রই, নিশিকান্ত তাহা ঘৃণা সহকারে অগ্রাহ্য করিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে বিষয়ে আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। এই প্রকারে আরও কিছুদিন যাওয়ার পর যখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন তিনি মনে করিলেন, বিবাহ করাইলেই নিশিকান্তের বয়সের দোষ সারিয়া যাইবে।

ইহা বিবেচনা করিয়া নিশিকান্তকে তিনি বিবাহ করাইলেন। ভুবনমোহিনীর পিতা মধ্যবিৎ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। তিনি কোনও সহরে থাকিয়া কোনও স্কুলের মাষ্টারি করিতেন। কন্যাকে তিনি ছেলেবেলা হইতে রীতিমত লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। ভুবনমোহিনীকে এণ্ট্রেন্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর পড়া পর্য্যন্ত পড়াইলেন। ভুবনমোহিনীর পিতামাতার ইচ্ছা ছিল, ভুবনমোহিনীকে নানা বিষয়ে গুণবতী করিয়া তাহাকে বেশ ভাল ঘরে বিবাহ দেন, কিন্তু মানবের সব সময়ে সব আশা পূরণ হয় না। একদিন হঠাৎ ভুবনমোহিনীর পিতার কালের ডাক পড়িল, তিনি স্ত্রী, কন্যাকে শোক সাগরে ভাসাইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অনাথা

অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া ভবধামের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। ভুবন-মোহিনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান। ভুবনমোহিনীর পিতার মৃত্যুর পর দেখা গেল, তিনি মাত্র এক হাজার টাকা লাইফ্ ইন্সিয়োরেন্স রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর ভুবনমোহিনীর মাতা স্বামীর শ্রাদ্ধ শান্তি করিয়া যৎসামান্য ধন যাহা উদ্বৃত্ত হইল, তাহাদ্বারা অতি কায়-ক্লেশে দিন চালাইতে লাগিলেন। ভুবনমোহিনী তখন চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ভুবন-মোহিনীর মাতা দেখিলেন, কন্যাকে আর রাখা যায় না, তখন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া ভুবনমোহিনীকে কোনও মতে পাত্রস্থ করিয়া জাতি, কুল রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকল বর্ণেই মেয়ে বিবাহ দিতে হইলে বিস্তর টাকার প্রয়োজন, সেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে ভুবনমোহিনীর মাতা মনে করিতে লাগিলেন, যদি কেহ দয়া করিয়া ভুবনমোহিনীকে গ্রহণ করে, তবে তিনি বাকী দিন কয়টা স্বামীর ও পরলোকের চিন্তা করিয়া কাটাইতে পারেন। এখন যে উঠিতে, বসিতে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কেবল ভুবনমোহিনীর কথাই তাহার মনে উদয় হইতেছে। যাহার ঘরে এত বড় কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় থাকে, তাহার পিতামাতার কি বর্ত্তমান সমাজে আর কোনও চিন্তা থাকিতে পারে?

এমন সময় কোনও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ভুবনমোহিনীর মাতার নিকট নিশিকান্তের সহিত ভুবনমোহিনীর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ভুবনমোহিনীর মাতা ভাবি জামাতার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া প্রথমে এই স্থানে বিবাহ দিতে অসম্মত হইলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন, ভাবী জামাতার পিতার কিছু টাকা কড়ি আছে, জামাতাও পিতার একমাত্র সন্তান, আর যখন দেখিলেন, এমন সদ্বংশের ছেলেও সহজে পাওয়া যায় না, অথচ তিনি

কন্যার বিবাহে এক পয়সাও ব্যয় করিতে পারিবেন না, তখন "বিধাতার নির্ব্বন্ধ" বলিয়া বিধাতার স্কন্ধে সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া নিশিকান্তের সহিতই ভুবনমোহিনীর বিবাহ দিলেন।

নিশিকান্ত সমবয়স্ক দলে যখন বিবাহের পর আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সমবয়স্ক দল তাহাকে বলিতে লাগিল,—খুব জোর কপাল নিয়ে এসেছিলি ভাই, এমন স্ত্রী কি আর যার তার ভাগ্যে জোটে? শাস্ত্রে বলে, স্ত্রী-রত্ন বহু কপালের জোরেই মেলে। দেখিস্ ভাই, সুন্দরী বউ পেয়ে যেন আর বন্ধুবান্ধবকে ভুলে থাকিস্ না।

নিশিকান্ত বন্ধুদের কথার উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া শুধু মুখ টিপিয়া একটু মুরুব্বিয়ানা ধরণের হাসি হাসিল। তাহার অর্থ, এমন স্ত্রী পাওয়া কপালের জোর নয়, তাহা তাহার নিজগুণে আসিয়াছে, তাহার মত পুরুষ-রত্ন জগতে বড় সহজে পাওয়া যায় না।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভুবনমোহিনীকে বরণ করিয়া নিয়া আসিলেন, কারণ পুত্রবধূকে গৃহে বরণ করিয়া আনিবার তাহার ঘরে আর তৃতীয় ব্যক্তি নাই। পুত্রবধূকে বরণ করিয়া আনিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন, মা লক্ষী আমার, কাঙ্গালের ঘরে এসেছিস্ মা, তোর পদ্ম-হস্তের গুণে আমার এই কাঙ্গালের ঘর ধনধান্যে পূর্ণ হউক।

ভুবনমোহিনী কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল, পিতা পুত্রে স্বর্গ মর্ত্ত ব্যবধান। পিতা দেবতা, পুত্র অপদেবতা। সে উভয়কেই পরিতুষ্ট করিবার জন্য তাহার মন প্রাণ ঢালিয়া দিল।

কুসুমপুরের দক্ষিণের গ্রাম নয়নপুর। নয়নপুর গ্রামের রায় চৌধুরী বংশ বহুপুরুষের বুনিয়াদি জমিদার। তাহারা বৈষ্ণবংশীয়। তাহাদের বদান্যতা এবং দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য তাহারা দেশবিদেশে খ্যাত। চৌধুরী বংশের বর্ত্তমান জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী। সে অল্পদিন হইল পিতার মৃত্যুর পরে জমিদারি প্রাপ্ত হইয়াছে। নরেন্দ্র বাবু পিতার একমাত্র সন্তান। অতি দিব্যকান্তি বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ, বয়স ২৫।২৬ বৎসর। অতি বাল্যকালে পিতামাতা তাহাকে একটি সুরূপা সুলক্ষণা কন্যা দেখিয়া বিবাহ করাইয়াছিলেন। বিবাহের কিছুকাল পরেই তাহার মাতা পরলোক গমন করেন। স্ত্রীর নাম হিরণময়ী। হিরণময়ীর বয়স এখন ২০।২১ বৎসর। হিরণময়ী সুন্দরী, বেশ শিক্ষিতা এবং বুদ্ধিমতী। কিন্তু দেখিলেই মনে হয় একখানা কালো মেঘের ছায়া যেন অনুক্ষণ তাহার বদন-কমলকে আচ্ছাদিত করিয়া আছে। হাসি বলিয়া যে সুমধুর গুণ একটি এ পৃথিবীতে আছে, তাহা যেন বহুদিন হইল তাহার বদন-কমল হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

নরেন্দ্রনারায়ণের পিতা অতি চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন। তিনি বহু টাকা ও যথেষ্ট আয়সম্পন্ন জমিদারি রাখিয়া পরলোক গমন করেন। নরেন্দ্র-নারায়ণ তাহার পিতার শত যত্ন সত্ত্বেও যৌবন প্রারম্ভেই চরিত্র হারাইয়া ফেলে। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার চরিত্রদোষও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্ত্রী হিরণময়ী যখন তাহার ভরা-যৌবন নিয়া স্বামীর নিকট আসিয়া

দাঁড়াইল, তখন তাহার স্বামী তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। স্ত্রী হিরণময়ী স্বামীর অবহেলা নিয়াই স্বামীর বাড়ীতে দিন কাটাইতে লাগিল।

রায় চৌধুরী বংশের বিবাহ-প্রথা,—পুত্র বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে স্বামী গৃহে নিয়া আসিলে, স্ত্রীর সহিত পিত্রালয়ের সম্পূর্ণ সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। এমন কি, পিতার বাড়ীর কেহ কন্তার সহিত দেখা করিতে আসিলে, অনেক তোষামোদ, অনেক খবরাখবরের পরে কন্যার সহিত দেখা করিতে পারিত। হিরণময়ীর পিতা অতি গরীব ছিলেন, সুন্দরী এবং কুলীন কন্যা বলিয়া নরেন্দ্রনারায়ণের পিতা পুত্রবধূরূপে হিরণময়ীকে নিয়া আসিলেন। সুতরাং বিবাহের পর হইতে নরেন্দ্রনারায়ণের বাড়ীর চতুঃসীমায় বাহির হইবার অধিকার হিরণময়ীর ঘুচিয়া গেল। হিরণময়ীও এই বাড়ীই তাহার একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র মনে করিয়া জীবন কাটাইতে লাগিল।

হিরণময়ী যৌবন প্রাপ্তে স্বামীকে পাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও যখন স্বামীকে ধরিতে পারিল না, তখন সে তাহার শ্বশুরঠাকুরকে বলিয়া তাহার লেখাপড়ার চর্চ্চা করিবার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিল। তাহার শ্বশুরঠাকুর সানন্দচিত্তে তাহা অনুমোদন করিয়া কলিকাতা হইতে একজন শিক্ষয়িত্রী আনিয়া হিরণময়ীর শিক্ষার ভার তাহার স্কন্ধে অর্পণ করিলেন। হিরণময়ী তখন নিজ মনে শিক্ষয়িত্রীর নিকট নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যেন নরেন্দ্রনারায়ণ ও তাহার স্ত্রী সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িতে লাগিল। নরেন্দ্র-নারায়ণ সর্ব্বদাই নানা ইয়ার পরিবেষ্টিত হইয়া দিন কাটায়। এমন কি, তাহার আহারও মাঝে মাঝে বাহির বাড়ীতে সম্পন্ন হইতে লাগিল। সুরাদেবীর সে একজন প্রধান উপাসক। আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নরেন্দ্রনারায়ণের অধীনেই পিতার আমল হইতে চাকরি করিতেছেন। নিশিকান্ত তাহার একজন প্রধান ইয়ার।

ঐ দেশের প্রবাদ, নিকটবর্ত্তী দুই চারখানা গ্রামের অনেক ললনা নরেন্দ্রনারায়ণের চক্রান্তে পড়িয়া অমূল্য সতীত্বরত্ন জলাঞ্জলি দিয়াছে। নরেন্দ্রনারায়ণ জিদ করিয়া বলে, টাকাতে কি না হয়,—এমন স্ত্রীলোক সংসারে নাই যাহাকে টাকা ব্যয় করিলে পাওয়া যায় না। নিশিকান্ত তাহার দুষ্ক্রিয়ার নিত্য-সহচর।

পিতার মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনারায়ণের উচ্ছৃঙ্খলতার আর মাত্রা রহিল না। সে এখন নিজে জমিদার, বহুধনের অধিকারী। যখন ইচ্ছা হয় ঢাকায় চলিয়া যায়, যখন ইচ্ছা হয় কলিকাতায় চলিয়া যায়। সে সব জায়গায় যাইয়া মদ ও মেয়েলোকের পাছে বহু টাকা অবাধে ব্যয় করিতে থাকে। তাহা কিছু এক ঘেয়ে হইলে আবার বাড়ীতে চলিয়া আসে। সেখানে আসিয়া আবার উচ্ছৃঙ্খলতায় গা ঢালিয়া দেয়। ভুলক্রমেও একবার স্ত্রীর সহিত দেখা করে না। তাহার যে স্ত্রী বর্ত্তমান আছে, তাহার আচরণ দেখিলে তাহা কল্পনাও করা যায় না। শ্বশুরঠাকুরের মৃত্যুর পর হিরণময়ী আর একবার নূতন করিয়া চেষ্টা করিল, স্বামীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে কিনা, কিন্তু যে স্বামীর সহিত আদৌ দেখাই হয় না, তাহার আবার স্বভাবের পরিবর্ত্তন সে কি করিয়া ঘটাইবে?

নরেন্দ্রনারায়ণের পিতার মৃত্যুর কতকদিন পরে, তাহার পিতার আমলের বহুদিনের দেওয়ান হরকুমার গুপ্ত নরেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রীর প্রতি অবহেলা দেখিয়া একদিন হিরণময়ীকে বলিলেন,—মা লক্ষ্মী আমার, তোমার মুখের দিকে আর চাইতে পারি না। আমারই দোষ মা! আমার জন্যই তুমি মা এত কষ্ট পাচ্ছ। আমিই তোমাকে পছন্দ করে নিয়ে এসেছিলাম। নরেন যে এত অধঃপতনে যাবে, এ যে স্বপ্নের অগোচর। তোমার জীবন যে এভাবে কাটাতে হবে, একথা স্মরণ হলেও প্রাণ অস্থির হয়ে উঠে। আমার মনে হয় মা, তোমার এই জমিদার ঘরে বিয়ে না

হয়ে ; যদি সামান্য গরীবের ঘরেও বিয়ে হতো, তাও বুঝি সেখানে স্বামী সোহাগে সোহাগিনী হতে পারতে। নরেনের যে কি হলে মতিগতি ফিরবে তাও বুঝি না। সে এক একবার এক একখানে যায়, হাজার হাজার টাকা জলের মত ব্যয় করে আসে। এমন অপব্যয় করলে কুবেরের ধনও ফুরিয়ে যায়। তার জন্য মনে কোনও হায় আপশোষ হয় না। মা, মনে হয় যার জিনিষ সে যদি রক্ষা না করে, তবে সেই তার ফল ভোগ করবে। কিন্তু মা তোমার মত সতীলক্ষ্মীর অবমাননা যে সে করছে, এই জন্য মনে যে কতদূর কষ্ট হয়, তা আর বলতে পারি না।

হিরণময়ী তাহা শুনিয়া বলিল, দেওয়ানজি মশায়, আপনি সেজন্য দুঃখিত হবেন না। আমরা স্ত্রীলোক, আমরা পুরুষের খেলার পুতুল মাত্র। পুরুষেরা আমাদের যে ভাবে রাখবে, সেই ভাবকেই আমরা নতশিরে ধারণ করব আশীর্ব্বাদ করুন ; দেওয়ানজি মশায়, এ অবস্থাতেই যেন জীবন কাটাতে পারি, সিঁথির সিন্দুর বজায় রেখে যেন ভবধাম ছেড়ে যেতে পারি।

দেওয়ানজি। মা, তুমি নীরবে অত সহ্য কর বলেই নরেন আরও দিন দিন বেড়ে চলছে। তোমার স্থান তুমি দখল করে লও, তোমাকে তোমার আসনে দেখে যেন এ বৃদ্ধের চোখ দু'টী জুড়াতে পারে।

হিরণময়ী। দেওয়ানজি মশায়, যদি ভগবান দিন দেন, আমার আসন আপনাআপনিই দখলে আসবে। চেষ্টা করে আর লাভ কি ? যখন তিনি নিজকে নিজে চিনতে পারবেন, তখন দেখবেন তিনি আপনিই এসে আমাকে ধরা দিবেন।

এই প্রকারে সেই বিশাল জমিদার-ভবনে হিরণময়ীর জীবন যাইতে লাগিল। ইহার কতক দিবস পরেই নিশিকান্ত ভুবনমোহিনীকে বিবাহ করিয়া নিয়া আসিল। নিশিকান্ত যে এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, তাহা নরেন্দ্রনারায়ণ অপরাপর ইয়ার-বন্ধুগণের মুখে

শুনিল। নিশিকান্ত বিবাহের পর ঠিক করিল, সে আর কুসংসর্গে মিশিবে না; এমন কি, নরেন্দ্রনারায়ণের সংসর্গ পর্য্যন্ত তাহার ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা মনে করিয়া নিশিকান্ত বিবাহের পর আর নরেন্দ্রনারায়ণের সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিল না।

ইয়ার-বন্ধুগণের মুখে নিশিকান্তের স্ত্রীর সৌন্দর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়া তাহার মনে কুবাসনা জাগরিত হইল। যেমন করিয়া যতদিনে হউক এ সুন্দরীকে হাত করিতেই হইবে। নিশিকান্ত যতই তাহা হইতে সরিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবার জন্য নরেন্দ্রনারায়ণের ততই প্রবল আগ্রহ হইতে লাগিল। এই প্রকারে নিশিকান্তের বিবাহের পর ছয় মাস কাল চলিয়া গেল। অবশেষে নিশিকান্তের সঙ্গ লাভ করিবার জন্য নরেন্দ্রনারায়ণ তাহার এক ইয়ারকে নিশিকান্তের নিকট পাঠাইয়া দিল। নিশিকান্ত প্রবল বাসনা সত্ত্বেও বাসনাকে দমন করিল, সে নরেন্দ্রনারায়ণের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া জানাইল, তাহার শরীর অসুখ, অসুখ সারিলে সে নরেন্দ্রনারায়ণের সহিত দেখা করিবে। নরেন্দ্রনারায়ণ আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিল, দেখিল, নিশিকান্ত আসিল না। তখন তাহার মনে প্রথমে ভয়ানক রাগ হইল, কি তাহারই একজন আমলার পুত্র তাহার আহ্বান উপেক্ষা করিবে? বলিতে গেলে তাহার অনুগ্রহেই পিতাপুত্র গোষ্ঠী গোত্র নিয়া লালিত-পালিত হইতেছে। কিন্তু আবার চিন্তা করিয়া দেখিল, রাগ করিলে তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইবে না, যেমন করিয়া হউক নিশিকান্তকে বাকে আনিতেই হইবে। সুতরাং নরেন্দ্রনারায়ণ মনে মনে তাহার কার্য্য সিদ্ধি করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন, নিশি-কান্তের সহিত অতি আবশ্যকীয় কাজ আছে, তিনি যেন নিশিকান্তকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন।

নিশিকান্তের স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও মনে মনে বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। ক্রমেই তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন, পুত্র-বধূ ভুবনমোহিনী শুধু সুরূপা নহে, অতি গুণবতীও বটে। ভুবন-মোহিনীর প্রতি তাহার প্রগাঢ় একটা আন্তরিক ভালবাসাও হইয়াছিল, নিশিকান্ত হেন উচ্ছৃঙ্খল যুবককেও সে সংযত করিয়াছে। তিনি দেখিতেন, নিশিকান্ত সারাদিন আর বাড়ী হইতে বিনা প্রয়োজনে বাহির হয় না। তাহাকে যখন যাহা করিতে বলা যায়, সে হাসিমুখে অম্লানবদনে তাহা করে। নরেন্দ্রনারায়ণের চতুঃসীমাও সে মাড়ায় না। আজ নরেন্দ্র-নারায়ণ নিশিকান্তকে তলব করায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি জানিতেন, নরেন্দ্রনারায়ণের সংসর্গে আসিলে, নিশিকান্ত আবার পূর্ব্ব স্বভাব প্রাপ্ত হইবে। তিনি জানিতেন একবার যে স্বভাব হারাইয়া ফেলে, সে আবার প্রলোভনে পড়িলে পূর্ব্ব স্বভাব প্রাপ্ত হইবে। তিনি জানিতেন একবার স্বভাব হারাইয়া ফেলিলে তাহার চরিত্রবল কোনও দিনই থাকে না; তাই তিনি নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট তাহার সহিত নিশিকান্তের দেখা করিবার বিরুদ্ধে নানা ওজর আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনারায়ণ বদ্ধ-পরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার নিশিকান্তকে চাই-ই। সে এখন নিজে প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার, তাহারই সামান্য কর্ম্মচারির পুত্র তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া দূরে সরিয়া থাকিবে? সে কি এমনই হেয়? সে কি এমনই ঘৃণ্য? এ বেয়াদবি অমার্জ্জনীয়, তাহার নিশিকান্তকে চাই-ই। তাই নরেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দৃঢ়স্বরে বলিল, নিশিকান্তকে যেন আজ রাত্রিতেই আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, তার সাথে আমার বিশেষ কাজ আছে। তখন অগত্যা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চাকরির মমতায় নিশিকান্তকে নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিশিকান্তের নিকট আসিয়া নরেন্দ্রনারায়ণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, যখন এমন ভাবে সে বল্‌ছে, তোমার একবার সেখানে যাওয়া উচিত। কিন্তু সেখানে বেশীক্ষণ থেকো না, সকালেই বাড়ী ফিরে এসো।

নিশিকান্তও দেখিল, নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট তাঁহার না যাইয়া আর নিস্তার নাই। সে একটু অনিচ্ছাসত্বে নরেন্দ্রনারায়ণের সহিত দেখা করিতে রওনা হইল।

নরেন্দ্রনারায়ণ বুঝিতে পারিল, নিশিকান্ত আজ আসিবেই আসিবে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চলিয়া যাইবার পর নরেন্দ্রনারায়ণ তাহার অপর কয়েক ইয়ার-বন্ধুকে বলিল, আজ রাত্রির জন্য একটু বিশেষ আমোদের বন্দোবস্ত কর, অনেক দিন পরে নিশি আস্‌ছে।

নিশিকান্ত সন্ধ্যার পর নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট যাইয়া দেখে, সে ইয়ার পরিবেষ্টিত হইয়া মদ্যপানে নিযুক্ত। নিশিকান্ত যাওয়ামাত্রই নরেন্দ্র-নারায়ণ উঠিয়া নিশিকান্তের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—এস ভাই, এসেচ, এতদিন বুঝি সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে তাতেই মজে ছিলে? বন্ধু বান্ধবদের কথা আর মনেও ছিল না? তুমি আমাদের ভুলে আছ বলে, আমরা ভাই তোমাকে ভুলি নাই। ইহা বলিয়াই নরেন্দ্রনারায়ণ নিশিকান্তকে গলাগলি ধরিয়া আনিয়া বৈঠকখানায় বসাইল।

নরেন্দ্রনারায়ণেব মুখ হইতে তীব্র মদের গন্ধ বাহির হইতেছিল। নিশিকান্ত ঘোরতর মদ্যপায়ী আজ কয়েক মাস হইল বিবাহের পর হইতে ভুবনমোহিনীর সংস্রবে আসিয়া সে সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছিল। নরেন্দ্রনারায়ণের মুখে সুরার গন্ধ পাইয়া সুরাপানের প্রবৃত্তি তাহার মনে জাগরিত হইল, কিন্তু ভুবনমোহিনীর কথা স্মরণ করিয়া সে সেই প্রবৃত্তিকে

বহু কষ্টে দমন করিয়া ফেলিল। সে ঘরের ভিতরে যাইয়া নরেন্দ্রনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিল, কর্ত্তা, আমাকে ডেকেছেন কেন?

আমাদের দেশের জমিদারবর্গের আর কোনও গুণ থাকুক বা না থাকুক, গান বাজনার চর্চ্চাটা অনেকেই করিয়া থাকে; আমাদের নরেন্দ্র-নারায়ণেরও এ বিদ্যাতে বেশ রীতিমত দখল ছিল। নরেন্দ্রনারায়ণ নিশিকান্তের প্রশ্ন শুনিয়া যেন একটু চমকিয়া উঠিল। সুরাদেবীর প্রভাবে সে তখন আর এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিল। সে তখন নিশিকান্তের চিবুক ধরিয়া গাহিতে লাগিল,—

এই ধরা নে এই চূড়া নে
জন্মের মত বিদায় দে।
সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছি,
তোমাদের সব ভুলে গেছি।

ইহা বলিয়াই নরেন্দ্রনারায়ণ বিকট হাস্য করিতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইয়ার বন্ধুগণও হাস্য করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনারায়ণ তখন নিশি-কান্তকে বলিল, "নে ভাই এখন নেকামি রেখে দে, গলার ভিতর এক গ্লাস ঢেলে দে।" ইহা বলামাত্রই নরেন্দ্রনারায়ণের ইঙ্গিতে অপর এক বন্ধু নিশিকান্তের হাতে এক গ্লাস মদ দিল, সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা গলায় ঢালিয়া দিল। তাহার পর বোতলের পর বোতল চলিতে লাগিল। নিশিকান্তের সে রাত্রিতে আর বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া হইল না। বিবাহের পরে এই নিশিকান্তের আজ প্রথম প্রবাস বাস।

(৬)

পৃথিবীর মধ্যে বহু দেশ আছে, ভারতবর্ষের মত সুরম্য অথচ এমন হতভাগ্য দেশ আর নাই। এদেশে আছে সবই, অথচ নাই কিছুই। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত স্বভাবের সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, এমন সুরম্য স্থান পৃথিবীতে আর নাই। পৃথিবীর যাবতীয় দেশের স্বভাবের সৌন্দর্য্য এই দেশে সমবিকাশ হইয়াছে। সব দ্রব্যই অনায়াসলভ্য। মাতা বসুন্ধরা অকাতরে এদেশের মানবদিগের জন্য নানারূপ খাদ্য উৎপাদন করিতেছেন, কিন্তু এদেশের মানবদিগের অপদার্থতা হেতু তাহা তাহারা ভোগ করিতে পারিতেছে না, বারমাসই এক, প্রায় অনাহারে ক্লিষ্ট হইয়া জীবন কর্ত্তন করে, দুর্ভিক্ষ তাহাদের নিত্য-সহচর। এহেন হতভাগ্য দেশে আমাদের কেদারনাথ দরিদ্র পিতা-মাতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিবে তাহার আর বিচিত্রতা কি? আমাদের কেদারনাথ গাঙ্গোপাধ্যায় পিতৃহীন যুবক, বয়স ১৯।২০ বৎসর। সংসারে মাতা এবং এক অবিবাহিতা ভগ্নী ভিন্ন তৃতীয় ব্যক্তি আর কেহ ছিল না। কেদারনাথের যখন ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স তখন কেদারনাথ পিতৃহীন হয়। কেদারনাথের পিতা সামান্য বেতনে চাকরি করিতেন, সামান্য জায়গা জমি ছিল, তাহার উপস্বত্বে ও চাকরির বেতন দিয়া কোনও মতে কেদারনাথের পিতা সংসার খরচ নির্ব্বাহ করিতেন। এমত অবস্থায় কেদারনাথের পিতার মৃত্যুর পর কেদারনাথের মাতা পুত্রকন্যা নিয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কেদারনাথের পিতা

কোনও সহরে চাকরি করিতেন, কেদারনাথ এণ্ট্রেন্স স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে তখন পড়িত, মেধাবী ছাত্র বলিয়া তাহার বেশ নাম ছিল। পিতার মৃত্যুর পর তাহার লেখাপড়া চালান দুষ্কর হইয়া পড়িল। তখন সে আর তাহার মাতা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল, সে সহরে কোনও ভদ্রলোকের বাসায় রন্ধন করিয়া পড়া চালাইবে, তাহার মাতা ভগ্নীকে নিয়া ভদ্রাসন বাটিতে চলিয়া যাইবে। কেদারনাথের দারিদ্র্যের কথা শুনিয়া, আর তাহার পড়িবার অন্য কোনও উপায় নাই জানিয়া তাহার স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক চিন্তাহরণবাবু কেদারকে তাহার বাসায় থাকিয়া পড়িবার জন্য অনুরোধ করিলেন। চিন্তাহরণ বাবুও ব্রাহ্মণ, তাহার মাসিক বেতন ৫০৲ মুদ্রা, ইহার উপর তিনি প্রাতে ও বৈকালে টিউসনি করিতেন। তাহাতে তিনি আরও ৫০৲ টাকা মাহিয়ানা পান। তাহার পরিবারবর্গ বহু, তাহার উপরই তাহাদের যাবতীয় প্রকারের ব্যয়ের ভার নির্ভর করে। তিনি এই দুর্দ্দিনে ঐ একশত টাকা দিয়া তাহার সমস্ত খরচ সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তিনি অর্থাভাবে আর পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতে পারেন না, তিনি নিজেই তাহার আহারাদি রন্ধন করিয়া নেন। বাসায় মাত্র একটি চাকর আছে। তাই তিনি মনে করিলেন, যদি কেদার তাহার বাসায় থাকিয়া রাত্রিতে রন্ধন করে তবে তিনি আর একটি টিউসনি বাড়াইয়া নিতে পারেন। তাহার টিউসনিতে বেশ নাম আছে। তিনি গ্রাজুয়েট। কেদারনাথ সানন্দচিত্তে চিন্তাহরণ বাবুর প্রস্তাব গ্রহণ করিল। কেদারনাথ সেই হইতে চিন্তাহরণ বাবুর বাসায় থাকিতে লাগিল, এবং কিছুদিন পর হইতে দুই বেলাই রন্ধন করিয়া পড়িতে লাগিল। সামান্য কিছু জায়গা জমি ছিল, তাহার উপস্বত্ব দিয়া কায়ক্লেশে কেদারনাথের ক্ষুদ্র সংসার চলিতে লাগিল।

কেদারনাথের পিতার মৃত্যুর পর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল।

কেদারনাথের ভগ্নী তখন চতুর্দ্দশ বর্ষে উপনীত হইল। কেদারনাথ রূপবান যুবক, কেদারনাথের ভগিনী মালতী রূপবতী বালিকা।

কেদারনাথ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশ মুদ্রা বৃত্তি পাইল, এদিকে তাহার ভগ্নীর হিন্দু-সমাজের বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হইয়া যায় বলিয়া, কেদারনাথের মাতা কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। গ্রামের নানা লোকের নানা প্রকার উক্তি শুনিয়া কেদারনাথের মাতা যেমনি করিয়া হউক কন্যাকে অন্যের ঘরে পার করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন।

কেদারনাথ মাতাকে অনেকবার বলিল, মা, আরও কয়েকটা দিন যাক্ না, আমি উপার্জ্জন করে নি, মালতীর ভাল ঘরে বিয়ে দেবো।

মাতা বলিলেন, বাবা, তুই উপার্জ্জন কর্‌বি কবে? অত দিন কি মালতীকে আর রাখতে পারি? তা হলে কি আর জাত থাকে? এ বছরের মধ্যে একে পার কর্‌তেই হবে।

কেদার বলিল, তা হলে দেখি মালতীর ভাল সম্বন্ধ পাই কি না। কেদার বহু অনুসন্ধান করিয়া এক পাত্র ঠিক করিল। পাত্রটি বি, এ, পড়ে, ঘরের অবস্থাও মন্দ নয়, তবে পাত্রের পিতা নগদ এক হাজার টাকা চায়। কেদারনাথ এই সম্বন্ধই করিবে বলিয়া স্থির করিল। কিন্তু তাহার মাতা বলিলেন, এত টাকা দিতে হলে ত যা কিছু সম্পত্তি আছে তা সব বিক্রি করে দিতে হয়, শেষকালে উপায় কি হবে?

কেদার বলিল, উপায় যা হবার হবে, সে কথা এখন আর চিন্তা করা যায় না, যখন মালতীর বিয়ে দিতে হবেই এখন, এমন ছেলে আর ঘর পাওয়া যাবে না, মালতীর এ সম্বন্ধ করতেই হবে।

বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল তাহা সব বিক্রি করিয়া মালতীর বিবাহ দেওয়া হইল। কেদারনাথের থাকিবার মধ্যে শুধু তাহার বাস্ত ভিটা খানা

রহিল। কেদারনাথ তখন দেখিতে পারিল, তাহার আর পড়া চালান অসম্ভব। শুধু দশ মুদ্রা মাসিক সম্বল, তাহা হইতে নিজের পড়ার খরচ চালাইয়া মাতার ভরণ পোষণ কি প্রকারে সম্ভবে? সুতরাং বাধ্য হইয়া কেদারনাথ কার্য্যের অনুসন্ধানে বাহির হইল।

কেদারনাথ কার্য্যের অনুসন্ধানে কলিকাতায় তাহার জনৈক আত্মীয়ের বাসায় আসিয়া উঠিল। সে ঐ বাসায় পাঁচ ছয় মাস থাকিয়া তাহার এক আত্মীয়ের সাহায্যে ই, আই, রেলওয়ে আফিসে বেতন-ভোগী প্রবেসনার কাজে ভর্ত্তি হইল। তাহাতে সে মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া মাহিনা পাইতে লাগিল। এই চাকরি প্রাপ্তির পূর্ব্বে যে কয় মাস সে তাহার আত্মীয়ের বাসায় ছিল, সেই কয়মাস সেই আত্মীয়ের দুইটী পুত্রকে সে পড়াইত, তিনি ইচ্ছা করিয়াই কেদারকে তাহার বাসায় রাখিয়াছিলেন। চাকরি প্রাপ্তির পর সে রামকান্ত মিস্ত্রির লেনে এক মেসে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। কেদারনাথের অতি প্রত্যুষে আফিসে যাইতে হয়, দশটা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হয়, আবার ২টার সময় আফিসে যাইতে হয়, বেলা ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হয়। কেদারনাথ যে প্রকোষ্ঠে বাস করে, সেই প্রকোষ্ঠখানা দালানের এক কোণায় অবস্থিত। কেদার থাকিবার পূর্ব্বে এই প্রকোষ্ঠে কেহ কোনও দিন বাস করে নাই, এই প্রকোষ্ঠখানা দিনের বেলাও প্রায় একপ্রকার অন্ধকারাবস্থায় থাকে, ইহাতে সূর্য্য-রশ্মি কোনও দিনও প্রবেশ করে না। এই মেসখানায় যাহারা বাস করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কলেজের ছাত্র, দুই জন আফিসের কর্ম্মচারীও বাস করেন। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন কাজ করেন। ইহাদের মধ্যেই কেদারের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় অরুণ বাবু আছেন, তাঁহার চেষ্টাতেই কেদার রেলওয়ে আফিসে চাকরি পাইয়াছে। অরুণ বাবু ঐ আফিসে মাসিক

দেড়শত টাকা মাহিয়ানায় চাকরি করিতেন। কেদার এই মেসে থাকিবার প্রস্তাব করিলে তাহার প্রস্তাবেই এই স্থানে থাকিবার জায়গা পাইয়াছে। এই প্রকোষ্ঠটি বাসের অনুপযুক্ত বলিয়া এতদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল; সেই কারণে এই প্রকোষ্ঠের বাবদ কেদারের নিকট হইতে কেহই কোনও ভাড়ার দাবী করিল না। কেদারও তাহাতে নিতান্ত অনুগৃহীত হইয়াছে জ্ঞান করিয়া, মেসের অন্যান্য ব্যক্তিগণের নিকট সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিত না। কেদারকে মেসের খাওয়া খরচ বাবদ দশ টাকা, ঠাকুর চাকরের মাহিয়ানা বাবদ দুই টাকা, সর্ব্বসাকল্যে দ্বাদশ মুদ্রা দিতে হইত। ইহা ছাড়া কেদার নিজের হাত খরচ বাবদ তিন টাকা রাখিয়া বাকি দশ টাকা মাতাকে মাস মাস পাঠাইয়া দিতে লাগিল। এই প্রকারে কেদারনাথের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

মানব-চরিত্র বোঝা বড় দায়। সংসারে কেহ যেন কাহাকেও নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় না। এক জন নিজের মনে দিন চালাইয়া যাইতেছে, সে সংসারের অপরের কোনও বিষয়ে ধার ধারে না, শুধু নিজের চিন্তাতেই জীবন কাটাইতেছে ; কিন্তু সে জীবনও যেন অপরের চক্ষে সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠে। লোকে যেন তাহার মধ্যে বিশেষত্ব দেখে। তাহার মধ্যে বিশেষত্ব বাহির করিয়া সেই বিশেষত্বের সমালোচনা করিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তোলে। যদি একজন অতি বাক্যপ্রিয় হয় তবে তাহাকে লোকে বলিবে বাচাল, যদি সে নিরিবিলি থাকিতে ভাল বাসে, তবে লোকে হয় বলিবে সে দাম্ভিক, না হয় বলিবে হাবা। তাহাকে শুধু হাবা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, আবার তাহার হাবাত্ব সকল লোকের সমক্ষে প্রমাণ করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। কোনও অবস্থাতেই লোকালয়ে থাকিতে গেলে শান্তি নাই।

কেদারনাথ লোকের সঙ্গে তেমন মিশিত না, সে বরাবরই নিরিবিলি থাকিতে ভালবাসত, নিজের চিন্তা নিয়াই বিভোর ছিল। তাহার চিন্তা ছিল শুধু তাহার কাজের জন্য ও তাহার মাতাকে যে বাড়ীতে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছে তাহার জন্য। তাহার সর্ব্বদাই মনে হইত, তাহার মাতার একাকিনী থাকিতে না জানি কত কষ্টই হইতেছে। এতদিন ত মালতী ছিল,—শূন্য ঘরে মাতা কেমন করিয়া

আছেন। আবার তখনই তাহার চাকরির কথা মনে পড়িত, যে চাকরিটি সে পাইয়াছে তাহা নেহাত তাহার অদৃষ্ট-জোরে পাইয়াছে, তাহা না পাইলে ত তাহার মাতার অন্নাভাবে মারা পড়িতে হইত, এই চাকরিটুকু যাহাতে বজায় থাকে, তাহার প্রতি যেন কোনও প্রকার শৈথিল্য না ঘটে, সেই দিকে সে সর্ব্বদাই যত্নবান্ থাকিত। চাকরি জীবনে তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, যাহাতে তাহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী-বৃন্দ তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন।

সে তাহার নিজের চিন্তা নিয়া ব্যস্ত থাকিলেও মেসের সব লোক তাহা তাহাকে দিবে কেন? এ যে মানুষের স্বভাবের নিয়ম বিরুদ্ধ! মেসের লোকের সহিত দিনের বেলায় তাহার বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হইত না। সে যখন অতি প্রত্যূষে তাহার কার্য্যস্থলে চলিয়া যাইত, তখন মেসের অন্যান্য লোকের ভাল করিয়া নিদ্রাও ভাঙ্গিত না; আবার সে যখন বাসায় আসিয়া দ্বিপ্রহরে আহার করিত, তখন মেসের অন্যান্য লোক কার্য্যস্থলে চলিয়া যাইত। কেদারনাথের রবিবারও আফিসে থাকিতে হইত, কদাচিৎ দুই একদিন আফিস ছুটি হইত, সে সেই দিন তাহার প্রকোষ্ঠেই দিন অতিবাহিত করিত। তাহার বায়ু আলোকহীন প্রকোষ্ঠে যাইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে কাহারও বাসনা হইত না। কেদারনাথের সহিত মেসের অন্যান্য লোকের দেখা হইত শুধু রাত্রিকালে। রাত্রিকালে মেসের প্রায় সকল লোকই একত্রে আহার করিত। কেদারনাথ দুই বেলা আহার ব্যতীত আর কোনও আহার কিংবা জলযোগ করিত না, কারণ শত পরিশ্রমে শত ক্ষুধা স্বত্বেও তাহার জলযোগ করিবার সঙ্গতি ছিল না। তাহার আফিসের কার্য্যের জন্য তাহার যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত, সেই জন্য 'তাহার যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষুধার

উদ্রেক হইত। তাহার স্বাস্থ্যও খুব ভাল, এই জন্য অন্যে যে পরিমাণ অন্ন উদরসাৎ করিত, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ অন্ন সে উদরসাৎ করিত। রন্ধনাদির ত্রুটির সে ধার ধরিত না, রন্ধনের সমালোচনা তাহার মুখে কেহই কোনও দিন শোনে নাই; অন্ন এবং অন্য কোনও প্রকারের ব্যঞ্জন হইলেই সে যথেষ্ট জ্ঞান করিত, তাহাতেই সে সম্পূর্ণরূপে অতি আনন্দিত চিত্তে উদর পূর্ণ করিত। তাহার এই প্রকার আহার মেসের অন্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, এমন কি, তাহা মেসের ঠাকুর চাকরেরও সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। মেসের দুই এক জন ছাত্র দুই তিন দিন হাসিয়া কেদারকে বলিয়াছে, "কেদার বাবু, আপনার ডবল চার্জ্জ দেওয়া উচিত, কারণ আপনি ডবল ডাল ভাত ধ্বংস করেন, আপনার জন্য সবই ডবল খরচ হয়।" কেদার হাসিয়া বলিত, "মশায়, কি করি বলুন, আমার পেটের গহ্বরটাই বড়, এটা ভরতেই চায় না।" ঠাকুর চাকরও মাঝে মাঝে বলিত, "কেদার বাবু, আপনি যে ভাত ডাল খান, তা দেখলে মনে হয়, আপনি যেন কোনও কালেও কিছু খান নি। দস্তর মত দুটো মুটে মজুরের ডাল ভাত আপনি খান।" কেদার সেই কথার উত্তর হাসিয়া দিত, "কি করব, আমার যে দুটো মুটে মজুরের সমানই খাটতে হয়, দুটো মুটের সমান না খেলে আমি অত খাটতে পারব কেন?"

কেদার এই মেসে আসিবার মাস কয়েক পরে এই মেসের একটি সহবাসী ভূদেব বাবু তাহার বিবাহোপলক্ষে মেসের সকলের আহারের জন্য পঁচিশ মুদ্রা দিল, সেই মুদ্রা দিয়া সেই রাত্রিতেই পোলাও, মাংস ইত্যাদি আহারের বন্দোবস্ত হইল। সকলেই আহার করিতে বসিয়াছেন। ঠাকুর সকলকে পরিবেশন করিতেছে। কেদারের নিকট আসিয়া, অন্যের পাতে যে পরিমাণ পোলাও দেওয়া হইয়াছে, তাহার

চতুর্গুণ পরিমাণ পোলাও কেদারের পাতে ঢালিয়া দিল। কেদার অমনি বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর, করলে কি, এতগুলি পোলাও আমাকে একবারে দিলে কেন? যদি আমি না খেতে পারি তবে যে জিনিষগুলা নষ্ট হবে।"

ঠাকুরটি ছিল বড়ই মুখর; বিশেষতঃ সে কেদারকে কোনও দিনই তেমন বাবুর মধ্যেই গণ্য করিত না; সে অমনি বলিয়া উঠিল, "নিন মশায়, যা দিয়েছি তাত আপনার দেখতে দেখতে উড়ে যাবে, আপনি ত আরও এর ডবল খাবেন। ভাতই যা খান, আজ ত পোলাওই পেয়েছেন।"

কেদার ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। ঠাকুরের শ্লেষ বাক্যে তাহার মর্ম্মে বড়ই আঘাত লাগিল, তবুও সে কিছু না বলিয়া মাথা হেট করিয়া আহারের দিকে মনোনিবেশ করিল। সে শিখিয়াছে, পৃথিবীতে যাহার অর্থ নাই, সর্ব্বদাই তাহার যার-তার কাছে গ্লানি সহ্য করিতে হইবে। ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনিয়া কেদারের আত্মীয় অরুণ বাবু তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি কেদারের স্বভাবের গুণে তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন, তিনি ঠাকুরের এ বেয়াদবি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ঠাকুর, তোমার মুখ যে বড় বেড়ে উঠেছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। যত বড় মুখ না তত বড় কথা, তুমি কেন কেদার বাবুকে এ কথাগুলি বল্‌লে? তোমার বাপেরটা সে খায়? সে তার নিজেরটাই খায়; ফের যদি ঐ রকম বেয়াদবির কথা শুনি, তবে তোমায় ঠিক করে দিবো।"

এখনকার দিনে ঠাকুর চাকরদের বেশী কিছু ভর্ৎসনা করা যায় না। বাবুদের উপরওয়ালা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলে, তাহা অম্লানবদনে তাহারা হজম করিয়া ফেলে, কারণ বাবুদের চাকরিগত প্রাণ—অথচ

চাকরি পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু ঠাকুর চাকর জানে তাহারা গতর খাটাইতে পারিলে তাহাদের পেটের সংস্থান হইবেই। সুতরাং তাহারা এখন ভর্ৎসনা সহিবে কেন?

অরুণবাবুর তিরস্কার শুনিয়া ঠাকুর তাহার প্রতিবাদ করিতে যাইবে, এমন সময় সুধীরবাবু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "অরুণবাবু, আপনি কেন যে ঠাকুরের উপর এত চটলেন, আমি ত বুঝলাম না। ঠাকুর অন্যায় কথাটা বলেছে কি? কেদারবাবু যা ভাত খান, আমরা দশজনে খেতে পারি না; তা দেখে আমার ত আতঙ্কই লেগে যায়। আমি ত জীবনে—কোনও ভদ্রলোক থাক্, ছোট লোককেও এত খেতে দেখি নাই। কেদারবাবুর খাওয়া দেখলে মনে হয়, তিনি যেন জীবনে কোনও দিন খাননি, আর যে খেতে পাবেন, তার ভরসাও রাখেন না।"

সুধীর এম, এ পড়ে, তাহার পিতা ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। অরুণবাবু সুধীরের কথা শুনিয়া বলিলেন, "না, ঠাকুরের যে কোনও দোষ হয় নাই, তা এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, আমার এবং কেদারেরই অন্যায় হয়েছে, ঠাকুরের কাছে আমাদেরই মাপ চাইতে হবে। আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মস্ত উপাধিধারী, আবার মাষ্টার অব আর্টস্ হতে চলেছেন, আপনিও যখন ভদ্রলোকের সম্মান বোঝেন না, তখন ঠাকুর আর বুঝবে কত? সুধীর বাবু, কথাটা বলবার আগে একবার চিন্তাও করলেন না, কাকে কি কথাটা বল্‌ছেন? যাকে আপনি এ কথাটা বলেছেন, সে আপনার থেকে কোনও অংশেই হেয় নয়। হেয় শুধু এক অর্থে! আপনাকে আমি চিনি, আপনি কোনও মতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে ম্যাট্রিক, আই এ, বি, এ পাশ করেছেন, গেজেটে আপনার নাম বের করতেও ঘণ্টা খানেক লেগেছিল, সম্ভবতঃ আপনাকে পড়াবার জন্যও বাসায় মাষ্টার ছিল গণ্ডায় গণ্ডায়, আর যাকে আপনি অত বড়

অসম্মান সূচক কথাগুলি বল্লেন, সে পরের বাসায় থেকে দুবেলা পাক করে পড়ে ম্যাট্রিকে দশ টাকা বৃত্তি পেয়েছিল; অর্থাভাবে আর সে পড়তে পারে নাই, পড়তে পারলে আপনার চেয়ে অনেক বড় বিদ্বান হতে পারত। আপনি এখানে আছেন, পিতা মাসে মাসে খরচ দেন, ভোরে উঠে চা খান, মিঠাই খান, দুপুরবেলা ভাত খান, বিকালে আবার পেট ভরে মেঠাই খান, রাত্রিতে আবার ভাত খান. জলখাবার যা খান তাতে ভাত একরকম না খেলেই হয়, ভাত পাতে বসেন শুধু ভাতের সম্মান রক্ষার জন্য। আর কেদার পঁচিশ টাকা মাইনে পেয়ে, তা দিয়ে মাতাকে ভরণ পোষণ করে, নিজের খরচ চালায়, অথচ তার সম্বল ঐ পঁচিশ টাকা মাত্র। আপনি সম্ভব পঁচিশ টাকা জল খাবারই মাসে খান। সুধীরবাবু, বল্লেই হয় না, হিসাব করে কথাটা বল্‌তে হয়।"

অরুণবাবুর কথায় সুধীরের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত পড়িল। কেদারের সহিত তাহার তুলনা করিয়া অরুণবাবু তাহাকে অত রূঢ় কথা বলিবার কে? সুধীরচন্দ্র হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিল, "খুব হিসাব করে দেখেছি. আপনার কাছে আর হিসাব শিখ্‌তে যাব না। আপনি ভদ্রলোকের জাতই নন্, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বল্‌তে মুখ সামলে কথা বলবেন। আমাকে আর বাসার ঠাকুর পাননি যে যা তা বলে সেরে যাবেন।" অরুণবাবু সুধীরচন্দ্রের কথায় উত্তর দিতে যাইতেছেন, তখন শ্রীশবাবু,—তিনিও আফিসে চাকরি করেন, বলিয়া উঠিলেন, "অরুণ বাবু ত ঠিক কথাই বলেছিলেন। সুধীরবাবু, এ আপনারই দোষ, আপনারই অন্যায় হয়েছে, আপনি এখন চুপ করুন।"

ভূদেবচন্দ্র বি, এ পড়ে। সে বলিয়া উঠিল, "কেন, সুধীর অন্যায় বলেছে কি. অরুণবাবু সুধীরকে এতগুলি কথা বলবার কে? অরুণ বাবুরই অন্যায় হয়েছে।"

নবীনচন্দ্র এম, এ পড়ে। সে বলিয়া উঠিল, "সুধীর যা বলেছে আজ পর্য্যন্ত কোনও ভদ্রলোকের ছেলের মুখে এত বড় অসভ্যতার কথা কোনওদিনই শুনি নাই। সুধীর, তুমিই ভদ্রসমাজে বসবার উপযুক্ত নও, তুমি কেদারবাবুর কাছে ক্ষমা না চাইলে তোমার সঙ্গে আমি একত্রে আহারই করবনা। তোমার সঙ্গে একত্র খেতে আমি অপমান জ্ঞান করি। ডেপুটির ছেলে হয়ে বুঝি আর অহঙ্কারে বাঁচ না?"

অরুণ বাবুর মুখে কেদারের কথা শুনিয়া নবীনচন্দ্রের হৃদয় কেদারের প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া গিয়াছিল, তাই সুধীরচন্দ্রের কথাগুলি তাহার প্রাণে বড় বাজিয়াছিল। নবীনচন্দ্রের কথা শুনিয়া ভূদেবচন্দ্র বলিয়া উঠিল,"যা'না তুমি উঠে, তোমার সঙ্গে খেতে চায় কে? কি ভদ্রলোক রে আমার!

অতুলবাবু বি, এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতেন, তিনি বলিলেন, "নবীনবাবু, আপনি বড় বাড়াবাড়ি করে ফেল্লেন, আপনার এতটা বলা ভাল হয়নি। সুধীর এমন অন্যায় কথাই বা কি বলেছিল যাতে আপনি তাকে বাপ তুলে গালি দিলেন।

নবীনচন্দ্র বলিল,"যারা এটা বোঝে না, কেদার বাবুর প্রতি কি অন্যায় ব্যভার করা হয়েছে, আমি তাদের সঙ্গে বাস্তবিকই একত্রে খেতে বস্‌তে ঘৃণা বোধ করি। আপনারা খান, আমি চল্লাম।" ইহা বলিয়াই নবীনচন্দ্র আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শচীন্দ্রনাথ বি, এল পড়ে। সে বলিল, "সুধীর যা বলেছে, তাকে তার সাত ভাগের এক ভাগও বলা হয় নি। কেদার বাবুর মত সচ্চরিত্র, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ যুবক আমাদের মধ্যে কে? তার চরিত্রের কাছে সকলের মাথা হেট করে থাকা উচিত, না উল্টো আবার তাকে অপমান করা! এখানে কেউ আছি বাপের খরচে, কেউ আছি শ্বশুরের খরচে,—যারা খরচ দেয় তারা বোঝে তা যোগাতে তাদের কত বেগ পেতে হয়; আর আমরা

আছি এখানে এসে লম্বা লম্বা কথা বলি। সুধীর বাবুর কেদার বাবুর কাছে অবশ্য ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যায় করেছেন, ক্ষমা চাইবেন না কেন?"

অতুল বাবু শ্বশুরের খরচে মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। অতুল বাবুর শ্বশুর সামান্য কেরানিগিরি কাজ করিতেন। তিনি বহুকষ্টে জামাতাকে কন্যা বিবাহের সময়কার অঙ্গীকার মত মাসিক ৪৫৲ মুদ্রা করিয়া পাঠাইতেন, ইহা মেসের সকল ছেলেরাই জানিত। শচীন্দ্রনাথের কথায় অতুল বাবু মনে করিলেন, তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া শচীন্দ্রনাথ ঐ কথা বলিয়াছে; তাই তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "শচীন্দ্র বাবু, ভদ্রলোক হলে ত ভদ্রলোকের সম্মান বুঝবেন? শ্বশুরের খরচে পড়ি বলে আপনার সম্মান আমার চেয়ে বেশী নয়। আর লম্বা লম্বা কথা কি, সত্য কথা বলব, তাতে ভয় কি?"

তৎপরে সেই মেসের লোকদের মধ্যে দুই দল হইয়া পড়িল,—তুমুল ঝগড়া বাঁধিয়া গেল। সকলেই খাওয়া পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিল। যাহারা উপরে থাকিত, তাহারা উপরের বারান্দায় আসিয়া তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিয়া দিল; আর যাহারা নীচে থাকিত, তাহারা পাকের ঘরে দাঁড়াইয়াই কলহ করিতে লাগিল। বহু রাত্রি পর্য্যন্ত সেই কলহ ও তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। খাওয়ার মনে খাওয়া পড়িয়া রহিল। সে রাত্রিতে আর কাহারও খাওয়া হইল না। কেদার এই সব কাণ্ড কারখানা দেখিয়া সেই কলহে কিংবা তর্ক-বিতর্কে যোগদান না করিয়া নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া তাহার শয্যাতে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

(৫)

রাত্রিতে কেদারের ভাল ঘুম হইল না। থাকিয়া থাকিয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল, কি কাণ্ডটাই হইয়া গেল। তাহাকে নিয়া আজ এত বড় একটা ঘটনা হইয়া গেল, তাহাকেই উপলক্ষ করিয়া মেসের আজ কাহারও খাওয়া হইল না। ঠাকুরের কার্য্যে তাহার প্রতিবাদ না করাই বুঝি ভাল ছিল। আবার তাহার মনে হইল, তাহার নিশ্চয়ই কোনও অন্যায় ব্যবহার হয় নাই ; মেসের অন্য লোকের তাহার আহার নিয়া বিদ্রূপ করিবার অধিকার কি ? আবার তখনই তাহার মনে হইল, এ পৃথিবীতে যাহার অর্থ নাই, বিদ্রূপ, গ্লানি ত তাহার নিত্য সহচর। কেদার সব সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু ক্ষুধাটা তেমন বরদাস্ত করিতে পারিত না। বাল্যকাল হইতেই তাহার স্বাস্থ্য ভাল, তেমন কোনও ব্যধি তাহার কোনও দিন হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়ে না। সে বাল্যকাল হইতেই দুই বেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইলেই পরিতৃপ্ত। এখানে আসা অবধি চাকরিতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে রাত্রিতে কিছু না খাওয়ায় সে ক্ষুধায় বড়ই পীড়িত হইয়া পড়িল। আবার তাহার মনে হইতে লাগিল, রাত্রিতে যেমন তেমন করিয়া কাটিল, দিনের বেলায় সে অপরকে মুখ কি করিয়া দেখাইবে !

পরদিন ভোরেও এই কলহের বিরাম হইল না, উপরের বারান্দায় মেসের বাসিন্দাবর্গ আবার একত্রিত হইয়া তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিয়া দিল।

কেদার অতি প্রত্যুষেই তাহার আফিস অভিমুখে চলিয়া গেল, এই কলহের কোনও খবরও রাখিল না। আজ যেন সে আর হাটিতে পারিতেছে না, শরীর বড়ই দুর্ব্বল লাগিতেছে। আজ আফিসে রওনা হইবার সময় সে কিছু পয়সা সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিয়াছিল। কেদার প্রায় বৎসরকাল যাবৎ কলিকাতায় আসিয়াছে, এ পর্য্যন্ত একদিনও সে শুধু দুবেলা ভাত ছাড়া অন্য কোনও প্রকারের খাবার খায় নাই। যখন সে দেখিল, পা আর চলে না, তখন সে এক খাবারের দোকানে ঢুকিয়া দুই আনার খাবার কিনিয়া খাইল। তৎপরে প্রায় এক ঘটি জল উদরসাৎ করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, দোকানিও যেন তাহাকে অত জল খাইতে দেখিয়া তাহার প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার খাওয়াটাই কিছু অস্বাভাবিক, তাহার খাওয়াটা কিছু কমাইতেই হইবে। কি করিবে গরীবের যে ক্ষুধাই বেশী, উদর ত কোনও প্রকারে পূরণ করা চাই।

কেদারের স্বভাবের গুণে তাহার আফিসের সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। কেদারনাথের উপরওয়ালা রমেশ বাবু মাসিক দুই শত টাকা বেতনে চাকরি করিতেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, তিনিও পূর্ব্ববঙ্গবাসী; বয়স অনুমান পঞ্চাশ হইবে। তাহার সংসারে মাত্র তিনি, তাহার স্ত্রী, আর একটী মাত্র কন্যা, নাম অনিতা। তিনি কেদারের স্বভাবের গুণে যেন তাহার প্রতি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি রোজ ভোরে আফিসে আসিতেন না, বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ থাকিলে ভোরে আফিসে আসিতেন। আজ বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ আছে, তাই আজ ভোরেই তিনি আফিসে আসিয়াছেন। আসিয়া দেখেন, কেদার তাহার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। কেদারের কার্য্যে কোনও দিনও কোনও প্রকার শিথিলতা দেখেন নাই। কেদার কিছুক্ষণ কাজ করিয়া

মুখ তুলিয়া চাহিতেই রমেশ বাবুর দৃষ্টি কেদারের মুখের উপর পতিত হইল। রমেশ বাবু অমনি বলিয়া উঠিলেন, "একি কেদার, তোমার চেহারা আজ এমন হয়েছে কেন? তোমার মুখখানা যে একেবারে শুকিয়ে গেছে। তোমার কি কোনও অসুখ করেছে?"

কেদার তাহার কার্য্যে আবার মন নিবিষ্ট করিয়া বলিল, "না আমার কোনও অসুখ করে নাই।" ইহা বলিয়াই কেদার তাহার কাজ করিতে লাগিল। রমেশ বাবু কেদারের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কেদারের কর্ত্তব্যজ্ঞান দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিলেন। কেদার পরম সুন্দর দিব্যকান্তি যুবক। গত রাত্রির অনাহারে ও প্রায় এক রকম অনিদ্রায় তাহার চেহারার ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাহার বদন-কমলে যেন এক বিষাদের কালিমা আসিয়া পড়িয়াছে! প্রকৃত পক্ষেই কেদার ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের মনে কাজ করিয়া যাইতেছিল। কেদারের কর্ত্তব্যজ্ঞান দেখিয়া রমেশ বাবু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নির্নিমেষ নয়নে কেদারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কেদার আজ একাগ্রচিত্তে বহুক্ষণ কাজ করিতে পারিতেছিল না। কিছুক্ষণ কাজ করিবার পর হাতের কাজটুকু শেষ করিয়া একটু বিশ্রাম করিবার জন্য সে হাতের কলম রাখিয়া আবার মুখ তুলিল। রমেশ বাবু কেদারের বিষাদক্লিষ্ট বদন দেখিয়া আবার বলিলেন, "না কেদার, লুকালে কি হবে, তোমার নিশ্চয়ই কোনও অসুখ করেছে। তোমার চেহারাটা বড়ই খারাপ হয়েছে; আজ ছমাসের মধ্যে এমন চেহারা তোমার কোনও দিনই দেখিনি। তুমি বাসায় যাও, আমি ছুটি দিলাম, আজ আর তোমার এখন কোনও কাজ করতে হবে না।"

কেদার হাসিয়া বলিল, "না, আমার বাস্তবিকই কোনও অসুখ করেনি, কাল একটু ভাল ঘুম হয়েছিল না কিনা, তাই সম্ভবতঃ চেহারাটা একটু

খারাপ দেখাচ্ছে। ও কিছু না। এখন বাসায় যেতে পারব না, এখনও হাতে ঢের কাজ বাকী আছে। কাজটা সেরেই যাব।"

রমেশ বাবু বলিলেন, কেন ভাল ঘুম হয়নি ?

গত কল্যের রাত্রির ঘটনা মনে পড়ায় কেদার মাথা হেট করিয়া রহিল, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যেন সে লজ্জায় মরিয়া গেল। সে কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকিয়া রমেশ বাবুর প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া আবার কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। রমেশ বাবুও যেন কেদারের বিষাদক্লিষ্ট বদন দেখিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না। তাহার মনে হইতে লাগিল, নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা কেদার তাহার নিকট বলিতে শঙ্কা বোধ করিতেছে। তাহার শঙ্কা দূর করিবার জন্য তিনি আবার বলিলেন, "দেখ কেদার, তোমাকে আমি পুত্রের মত গণ্য করি, তোমার চেয়ে আমি বয়সে অনেক বড় ; আমি সংসারের অনেক দেখেছি, বল ত বাবা কি হয়েছে ? আমার কাছে কিছু লজ্জা বোধ করো না।"

রমেশ বাবুর এবম্প্রকার সহানুভূতির কথা শুনিয়া কেদারের চক্ষে জল আসিল। পিতার মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এমন প্রাণস্পর্শী কথা সে কোনও দিনই শোনে নাই। সে দেখিল, রমেশ বাবু হইতে গত রাত্রির ঘটনা আর কিছুই গোপন করা চলে না। সে গত রাত্রির ঘটনা রমেশ বাবুর নিকট বিবৃত করিল।

রমেশ বাবু তাহা শুনিয়া বলিলেন, "তাই বল। কাল সেই দুপুরে খেয়েছ, আজ এখন পর্য্যন্ত কিছুই খাও নাই, তার উপর আবার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, তুমি কচি ছেলে, তোমার এত সইবে কেন ? তোমার চেহারা ত খারাপ হবেই। বাস্, খুব হয়েছ, চল এখন উঠি। আমার সঙ্গে আমার বাসায় চল, সেখানে এবেলা খাবে।

কেদার রমেশ বাবুর কথায় যেন বড়ই বিস্মিত হইল। সে বুঝিল না, সে রমেশ বাবুর বাসায় কেন খাইতে যাইবে। সে রমেশ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ বাবু আবার কেদারকে বলিলেন, নেও, এখন বাণ্ডেলগুলা বেঁধে ফেল, বেলাও প্রায় দশটা বেজেছে। ছেলে মানুষ, না খেয়ে আর কত খাটবে?"

কেদার তাহার কার্য্য করিতে করিতে বলিল, "না, আমার তেমন কষ্ট হচ্ছে না. হাতে আর একটু কাজ আছে, সেটা সেরেনি, বাসায় যেয়েই খাব এখন।" রমেশ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ক্ষেপারে আমার, তুমিত মেস কোনওদিন থাকনি; মেসের ভাব গতিক জান না। আজ আর কি তোমাদের মেসে কারোও খাওয়া হবে মনে করেছ? এখন পর্য্যন্ত জান্‌বে কাল রাত্রিকার জেরই চল্‌ছে। আজ ভোরে মীমাংসা হবে তোমাদের মেসের কে কে এ বাসায় থাকবে, কে কে অন্য বাসায় যাবে। আবার ঠিক হবে, ঠাকুরকে রাখা হবে, না তাড়িয়ে দেওয়া হবে, তা মীমাংসা হতেই আজ দুপুর পার হয়ে যাবে। আজ এ বেলা আর তোমাদের বাসায় উনুন জ্বালা হবে না নিশ্চয়। এ বেলা আমার ওখানে চল, আমার ওখানেই খাবে, বিকেল বেলা না হয় মেসেই খেও। নেও এখন উঠ, আর দেরী কোরো না, বেলাও কম হয় নাই। যে কাজ আছে না হয় বিকেলে সেরে ফেলো।"

কেদার দেখিল, রমেশ বাবুর নিমন্ত্রণ সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না, তাহা হইলে রমেশ বাবুর প্রাণে আঘাত লাগিবে। অথচ সে ত এখন যাইতে পারে না, তাহার হাতে যে ঢের কাজ বাকী আছে। কেদার এসব বিবেচনা করিয়া অতি বিনম্র ভাবে বলিল, "আচ্ছা আমি আপনার বাসায়ই এবেলা খাব। আপনি বাসায় যান, আপনার বাসার ঠিকানাটা আমায় দিয়ে যান, আমি হাতের কাজ সেরে যাব এখন।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "না, না, এক সঙ্গেই যাই। যে কাজটুকু আছে তা বিকেলে করলেই হবে।"

কেদার বলিল, "না, তাত হবার জো নাই, আপনি না কাল বলেছিলেন, এ কাজগুলি অতি জরুরি, আজই দুপুরের মেলে রওনা করতে হবে।" ইহা বলিয়াই কেদার আবার কাজে মনোনিবেশ করিল।

কেদারের কথা শুনিয়া রমেশ বাবু বিস্মিত হইয়া কেদারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তিনি যেন দেখিতে পাইলেন, কর্ত্তব্যের আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি। কেদার যাহা বলিয়াছে তাহা প্রকৃত, তিনি কাল কেদারকে একথাই বলিয়াছিলেন। তিনি বিহ্বল নেত্রে কেদারের প্রতি বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তিনি দেখিলেন, কেদার কাজ শেষ না করিয়া যাইবে না। তখন রমেশ বাবু বলিলেন, "আচ্ছা এক কাজ কর, ফাইলটা আমায় দেও, আমি পড়ে যাই, তুমি লিখে যাও, তা হলে তাড়াতাড়ি কাজ হবে।

রমেশ বাবু ইহা বলিয়া ফাইলটা নিজের হাতে তুলিয়া নিলেন, তিনি তাহা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন, কেদার লিখিতে লাগিল। এই প্রকারে আরও আধ ঘণ্টা খানেক কাজ করিবার পর কেদারের কাজ শেষ হইল। কাজ শেষ হইলে উভয়েই রমেশ বাবুর বাসার দিকে রওনা হইল।

রমেশ বাবুর বাসা ফুরিয়া পুকুর ষ্ট্রীটে। তাহারা হেরিসনরোডে আসিয়া ট্রামে চড়িল, কলেজ স্কোয়ারে আসিয়া শ্যামবাজারের ট্রামে উঠিল। রমেশ বাবুই উভয়ের ভাড়া দিলেন। ট্রামে উঠিয়া রমেশ বাবু কেদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বাড়ীতে পূর্ব্ববঙ্গে, তাত কথাতেই টের পাচ্ছি, কোন্ জায়গায় তোমাদের বাড়ী ?"

কেদার বলিল, "ঢাকার জেলায়ে, বিক্রমপুরে।"

কোন্ গ্রাম ?

কৈলাশপুর।

তোমরা নৈকুষ্য না ভঙ্গ ?

আমরা ভঙ্গ।

আমরাও ভঙ্গ। তোমার বাড়ীতে কে কে আছে ? তোমার বাবা আছেন ?

বাড়ীতে শুধু আমার মা আছেন। বাবা যখন মারা যান তখন আমার বয়স ১২।১৩ বৎসর।

তোমরা কয় ভাই কয় বোন ?

আমার আর ভাই নাই, এক বোন ছিল তার বিয়ে দিয়েছি।

তোমার এখন সংসার চলে কি করে ?

আমি আমার মাইনে থেকে মাস মাস দশ টাকা ক'রে মাকে পাঠাই, তাতেই এক রকম চলে যাচ্ছে।

দশ টাকা ক'রে তুমি মাস মাস দেও, বল কি ? তুমি ত পাও মোটে পঁচিশ টাকা, তা থেকে দশ টাকা কেমন করে মাস মাস দেও ?

কেদারের সরল মন, সে সরল ভাবেই উত্তর করিল,—কেন, মাকে দিয়েও ত আমার পনর টাকা থাকে।

এই পনর টাকাতেই তোমার কুলায় ? মেসে দেও কত ?

মেসে বার টাকা দেই, আর হাত খরচের বাবদ তিন টাকা রেখে দেই।

কাপড় চোপড় কিন কি দিয়ে ? জল টল খাও না ?

কাপড় চোপড় ত রোজ কিন্‌তে হয় না, কলকাতায় এসে আমি একখানা কাপড় কিনেছি। আমার জল খাওয়ার দরকার পড়ে না, আর পড়লেই বা তা পাব কোথায় ?

রমেশ বাবুও সরল ভাবে কেদারকে প্রশ্ন করিতে ছিলেন, কেদারও সরল ভাবেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল। কেদারের কথা শুনিয়া রমেশ বাবুর কেদারের প্রতি স্নেহ ও সম্ভ্রম বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

রমেশ বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার বোনের বিয়ে কেমন ঘরে হয়েছে? তাদের অবস্থা কেমন ?.

"তাদের অবস্থা ভালই।" তৎপরে কেদার হাসিয়া আবার বলিল — বোনের বিয়ে দিতেই আমার বাবা যে সম্পত্তিটুকু রেখে গিয়েছিলেন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন থাকবার মধ্যে আমার বাস্তুভিটাটুকু মাত্র আছে।

তুমিত ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিলে? টাকার অভাবেই বুঝি পড়া ছেড়ে দিয়েছিলে?

হ্যাঁ, আমি ম্যাট্রিকে দশ টাকা বৃত্তিও পেয়েছিলাম। কিন্তু দশ টাকা দিয়ে ত আর আমার পড়া, মার খরচ জুটো চলত না, তাই বাধ্য হয়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছি।

আচ্ছা, আবার এখন খরচ যোগাড় করে দিলে তুমি পড়বে?

আমার পড়া আর হ'তে পারে না। নিজের পড়ার খরচ চেষ্টা করলে এক রকম জুটিয়ে নিতে পার্‌তাম, কিন্তু মার খরচ চালাতে পারতাম না। নিজের পড়ার জন্য অন্যের সাহায্য নিতে পারতাম, যেমন সাহায্য নিতাম, তেমন তার প্রতিদানও দিতে পারতাম; অর্থাৎ ধরুন, কোনও বাসায় থেকে যদি কারো ছেলে পড়িয়ে খাওয়ার যোগাড়টা হত, কিন্তু মার খাওয়া ত চালাতে পারতাম না। মার ত আর দশ টাকার কম হয় না, আমার সম্বল ত মোটেই দশ টাকা ছিল, মাকে দশ টাকা দিলে আমার মাইনে, অন্যান্য খরচ চালাতাম কি দিয়ে?

রমেশ বাবুর কর্ণে কেদারের কথায় অমৃত বর্ষণ করিল। কি আত্ম-সম্মান জ্ঞান? সে এক বিন্দুও কাহারও নিকট সাহায্য চাহে না যার

প্রতিদান সে না দিতে পারে! এক কপর্দ্দকের জন্যও সে অপরের নিকট ঋণী থাকিতে চাহে না! তাহার বুদ্ধি আছে, সামর্থ্য আছে, সে তাহার উপর নির্ভর করিয়াই নিজের জীবন কর্ত্তন করিতে চাহে! কি আত্ম-নির্ভরতা, একেই বলে মনুষ্যত্ব: তিনি মুগ্ধ নেত্রে কেদারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি রাস্তার ডানপার্শ্বে চাহিয়া দেখেন, ট্রাম তাহার বাসার কাছে আসিয়াছে। তিনি কেদারকে বলিলেন,—চল বাবা, এখন নামা যাক্।

ট্রাম ফুরিয়া পুকুর ষ্ট্রীটের মোড়ে আসলে রমেশ বাবু ও কেদার ট্রাম হইতে নামিল। রমেশ বাবুর বাড়ী ফুরিয়া পুকুর ষ্ট্রীটের একটু ভিতরে। হাটিতে হাটিতে রমেশ বাবু কেদারকে বলিলেন, আমার বাসায় আর কেউ নাই, শুধু আছে আমার মেয়ে অনিতা আর তার মা। অনিতাই আমার ছেলে—অনিতাই আমার মেয়ে। অনিতার মাকে দেখে কিন্তু তুমি লজ্জা বোধ করো না। আমরা বুড়ো মানুষ, আমাদের কাছে তোমার লজ্জা কি? বুঝলে কেদার?

রমেশ বাবুর ব্যবহারে ও বাক্যে কেদারও যেন মোহিত হইয়া গিয়াছিল। রমেশ বাবুর কথায় কেদার হঠাৎ বলিয়া ফেলিল,—আপনার বাড়ীতে আমার আবার লজ্জা কি, আপনার বাড়ী ত আমার বাড়ী।

রমেশ বাবু কেদারের হাত ধরিয়া বলিলেন,—কি বল্লে কেদার, আমার বাড়ী তোমার বাড়ী? হ্যাঁ, তাই বটে, একথা যেন মনে থাকে, আমি তাই চাই। একথা কিন্তু কোনো দিনও ভুলো না।

কেদার রমেশ বাবুর কথায় যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল। হঠাৎ বড় বেশী বলিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল, এতটা বলা বুঝি তাহার ভাল হয় নাই। সে নিঃশব্দে রমেশ বাবুর অনুসরণ করিতে লাগিল। বাড়ীতে

আসিয়া রমেশ বাবু বাড়ীর দরজায় ঘা দিয়া ডাকিলেন,—অনিতা, মালক্ষ্মী, দরজাটা খুলে দেও মা।

উপর হইতে শব্দ হইল,—যাচ্ছি।

দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। কেদার দেখিল, একটি শ্যাম বর্ণের বালিকা, বয়স ১১।১২ হইবে, আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। চুলটা বেশ কোঁকরান, সদ্যস্নাত হইয়া বালিকা আসিয়াছে। বহুক্ষণ বৃষ্টি হইয়া গেলে ধরণীকে যেমন সুন্দর, কোমল, স্নিগ্ধ দেখায়, বালিকাও সদ্যস্নাত হইয়া মাথার চুল পাইট করিয়া আসায় তাঁহাকে তেমনই স্নিগ্ধ, কোমল, সুন্দর দেখাইতেছিল। বালিকার মুখখানা টলটলে, হাসিভরা, আকৃতিতে এমনই একটা কমনীয় ভাব, যেন দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। অথচ একটু ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে দেখা যাইবে, তাহার সৌন্দর্য্যে অনেক ক্রুটি আছে।

অনিতা রমেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—এ কে বাবা?

রমেশ বাবু হাসিয়া বলিলেন,—এ কে চিনস্ না? ও যে তোর দাদা।

অনিতা অমনি কেদারের হাত ধরিয়া বলিল, ও, দাদা। তা এতদিন দাদা তুমি কোথায় ছিলে?

অনিতা এমনি ভাবে কেদারকে প্রশ্নটি করিল যেন কেদার তাহার কত কালের পরিচিত, কেদারের পরিচয় সম্বন্ধে তাহার পিতাকে তাহার প্রশ্ন করাই যেন অন্যায় হইয়াছে। অনিতার প্রশ্ন শুনিয়া কেদার প্রথমতঃ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। জীবনে সে খুব কম লোকের সাথেই মিলামিশা করিয়াছে; অন্যের সাথে আলাপ করিতে হইলে তাহার মুখ প্রায় সহজে খুলিত না। নিতান্ত অপরিচিত একটি বালিকার এমন সাদর আহ্বানে সে একেবারে যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। কেদারের অবস্থা রমেশ

বাবু উপলব্ধি করিতে পারিলেন, তিনি তাহা বুঝিয়া বলিলেন,—অনু, তোমার দাদাকে উপরে নিয়ে চল।

অনিতা কেদারের হাত ধরিয়াই আছে; সে বলিল,—চল দাদা উপরে, মা উপরে আছেন।

"মা, দাদা এসেছে, মা, দাদা এসেছে", ইহা বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে অনিতা কেদারকে সিড়ি বাহিয়া উপরে নিয়া গেল।

রমেশ বাবু অনিতার কার্য্যকলাপ দেখিয়া প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অনি, দাদাকে পেয়ে বুঝি তোর খুব ফুর্ত্তি হয়েছে?

অনিতা বলিয়া ফেলিল,—"হবে না? দাদাকে পেলে কার না ফুর্ত্তি হয়?" এই কথাগুলি বলিয়াই সে কেদারের দিকে চাহিয়া বলিল,—কেমন দাদা, আমাকে পেয়ে তোমার খুব ভাল লাগছে না?

অনিতা একথা গুলি এমনভাবে বলিল যেন কেদার এই বাড়ীরই ছেলে, বহুদিন পরে আবার এ বাড়ীতে আসিয়াছে। এই কয়েক মুহূর্ত্ত অনিতার সংসর্গে থাকিয়া কেদারের লজ্জাতুর ভাবটা তিরোহিত হইয়া গেল; সে এবার অনিতার প্রশ্নের উত্তর নিসঃঙ্কোচে দিতে পারিল,—হ্যাঁ দিদি, ভাল লাগ্‌ছে বই কি? তোমাকে পেলে কার না ভাল লাগে?

অনিতার ডাক শুনিয়া অনিতার মাতা বুঝিতে পারিলেন না, কে আসিয়াছে, তিনি হাতের কাজ রাখিয়া উঠিয়া সিড়ির নিকট আসিলেন। রমেশ বাবু আগে উঠিতেছেন, পশ্চাতে অনিতা কেদারের হাত ধরিয়া উপরে উঠিতেছে। রমেশ বাবু উঠিলেই তাহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে এসেছে, অনিতা না কি বল্‌ছিল?

রমেশ বাবু বলিলেন,—হ্যাঁ, অনিতা ঠিকই বল্‌ছিল, তোমার একটী ছেলে এসেছে।

ঠিক সেই সময়ে অনিতা কেদারকে ধরিয়া তাহার মাতার কাছে নিয়া আসিল। অনিতা কেদারকে দেখাইয়া বলিল,—মা, এ কে জান? এ আমার দাদা।

কেদার রমেশ বাবুর স্ত্রীর পদধূলি গ্রহণ করিল। রমেশ বাবুর স্ত্রী কেদারকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—বাবা, দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক।

রমেশ বাবু বলিলেন,—আশীর্ব্বাদের পালাটা পরে হবে এখন, আগে শীগ্‌গির আমাদের খাওয়ার আয়োজন কর। তোমার ছেলের আমার দুজনেরই বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে!

রমেশ বাবুর স্ত্রী কেদারের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—তাই ত, বাবার মুখখানা ত শুকিয়েই গিয়েছে। তোমরা স্নান করে এস, আমি ভাত বাড়্‌তে ঠাকুরকে বল্‌ছি।

রমেশ বাবু বলিলেন,—"অনি, তোর দাদার জন্য আমার একখানা পরিষ্কার কাপড় নিয়ে আয়, তৈল আর গামছা নিয়ে আয়।" তৎপরে কেদারের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—জামা জুতা খুলে ফেল, খাবার ত তৈরী।

রমেশ বাবুর সহিত কেদারের কার্য্যের প্রয়োজনবশতঃ যাহা কিছু আলাপ ছিল। এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে সে তাহার সহিত কোনও দিনও আলাপ করে নাই। আজ প্রাতঃকাল হইতে এপর্য্যন্ত তাহার সহিত আলাপ করিয়াও তাহার ব্যবহারে কেদারের মনে হইতেছিল, যদি পৃথিবীর মধ্যে তাহার আপনার জন কেহ থাকে, তবে ইনিও একজন। রমেশ বাবুর বাসায় আসিয়া তাহার স্ত্রীও কন্যার ব্যবহারে তাহার সংস্কোচের ভাব কিছুই রহিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাঁহারা যেন তাহার কতকালের পরিচিত।

কেদার ও রমেশ বাবু স্নান করিয়া আসিলে তাহারা আহার করিতে বসিল। অনিতা কেদারের সহিত একত্র আহার করিতে বসিল, তাহাতে অনিতার আনন্দ যেন ধরে না। ঠাকুর পরিবেশন করিতে লাগিল। রমেশ বাবুর স্ত্রী ঠাকুরকে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন ও তাহাদের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন।

কেদারকে যাহা দেওয়া হইতেছিল, সে তাহার অর্দ্ধেকও যেন আজ খাইতেছিল না। রমেশ বাবুর স্ত্রী তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন,—কই বাবা, তুমি ত কিছুই খেলে না? লজ্জায় তুমি খাচ্ছ না? মা বাপের কাছে কি ছেলে লজ্জা করে? না বাবা, পাতে কিছু রেখে যেতে পারবে না।

কেদার বলিল,—মা, খাবার বেলায় আমার কোনও দিনই লজ্জা নাই, পেটুক বলেই আমার ছেলেবেলা থেকে নাম। আজ যা খেয়েছি, এই এক বছরে কলকাতায় এসে এর অর্দ্ধেকও সম্ভবতঃ কোনও দিন খাই নাই।

রমেশ বাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন,—না, তা হচ্ছে না, আরও কিছু খাও, দৈ দিয়ে মিষ্টি দিয়ে না হয় আরও কিছু খাও,—গরমের দিন, বেশ ভাল লাগবে এখন। তোমার নিশ্চয়ই পেট ভরেনি। এই খাওয়াতেই যদি তুমি পেটুক হয়ে থাক, তবে বুঝতে হবে তোমাদের দেশে কেউ খেতে পারে না।

ইহা বলিয়া তিনি কেদারের পাতে আরও কিছু দৈ আর রসগোল্লা দিলেন। কেদার যে না খাইতে পারিত তাহা নহে, তবে কেদার আজ ইচ্ছা করিয়াই কিছু কম খাইতেছিল। রমেশ বাবুর স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে সে বাধ্য হইয়া আরও কিছু খাইল।

বেশ পরিতোষ রকমে ভোজন হইলে কেদার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া

রমেশ বাবুর নিকট যাইয়া বলিল,--তা হলে আমি এখন যাই, আফিসে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে, প্রায় দুটো বাজে, যেতে যেতেই দুটো বাজ্‌বে।

রমেশ বাবু বলিলেন,—"আচ্ছা তুমি যাও, আমি একটু পরেই আস্‌ছি।" কেদার ভিন্ন ঘরে বসিয়া তাহার জুতা পায়ে দিতেছে, রমেশ বাবুর স্ত্রী কেদারের নিকট আসিয়া বলিলেন,—ব্রাহ্মণ ভোজন্ করালে তার দক্ষিণা দিতে হয়, তা না দিলে ব্রাহ্মণ ভোজন করার পুণ্য হয় না। তাই বাবা এই টাকাটি তুমি গ্রহণ কর, এই থেকে তোমার ট্রামভাড়া হবে, বিকেলের জল খাওয়াও হবে।

আহারের পর কেদার অন্য এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, রমেশ বাবু তাহার স্ত্রীর নিকট কেদারের সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিলেন। কেদারের চরিত্রমাহাত্ম্য শুনিয়া রমেশ বাবুর স্ত্রীর মন কেদারের প্রতি স্নেহে ভরিয়া উঠিল। কেদার রমেশ বাবুর স্ত্রীর কথা শুনিয়া মনে করিল,এই টাকাটি তাহার গ্রহণ করা উচিত। পুত্রজ্ঞানে তিনি এই টাকাটি দিয়াছেন, ইহা না নেওয়া তাহার পক্ষে অন্যায় হইবে, তাহাতে রমেশ বাবুর স্ত্রীর মনে ব্যথা লাগিবে। সে হাত পাতিয়া টাকাটি গ্রহণ করিল।

যাওয়ার সময় কেদার অনিতাকে ডাক দিয়া বলিল,--অনু দিদি, আমি এখন চল্লাম।

অনিতা ছুটিয়া আসিয়া কেদারের হাত ধরিয়া বলিল,—দাদা, আবার তুমি কবে আস্‌বে? কালই কিন্তু এসো, কেমন?

কেদার বলিল,-- আচ্ছা দিদি কালই আসব।

অনিতা বলিল,—হ্যাঁ, আস্‌তে ভুল না কিন্তু, না এলে কিন্তু আমি রাগ কর্‌ব।

হাসিতে হাসিতে কেদার রমেশ বাবুর বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আফিসের জন্য ট্রাম ধরিতে রওনা হইয়া গেল।

আফিসে যাইয়া কেদার তাহার কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। কেদার আসিবার কিছুকাল পরে রমেশ বাবু আসিয়া তাহার কার্য্যে যোগদান করিলেন। কেদারের কাজ হইয়া গেলে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সে তাহার মেসে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বাসায় যাইয়া দেখে, অরুণ বাবু তাহার নিজের ও তাহার জিনিষপত্র গুছাইয়া বসিয়া আছেন। অরুণ বাবুকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া কেদার জিজ্ঞাসা করিল, একি কোথায় যাচ্ছেন?

অরুণ বাবু কেদারের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কেদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি ত বাসার গোলমালে আফিসে যেয়েই চলে এসেছি। তোমাকে ত সারাদিন দেখিই নাই।

কেদার বলিল,—ভোরে আফিসে যেয়ে আমাদের রমেশ বাবুর সাথে দেখা হলো। কথায় কথায় আমাদের মেসের গত রাত্রির ঘটনার কথা তার কাছে বলেছিলাম। তিনি আমাকে তার বাসায় ধরে নিয়ে গেলেন, সেখানেই আমি ওবেলা খেয়ে এসেছি। রমেশ বাবু খুব ভাল লোক, কেমন কাকা?

অরুণ বাবু বলিলেন,—আমাদের আফিসে যত লোক আছে রমেশ বাবুর মত লোক একটিও নাই। আমাদের আফিস বলে কেন, রমেশ বাবুর মত লোক এখন জগতে পাওয়াই কঠিন। দেবতুল্য তার চরিত্র। তার ওখানে খেয়ে এসে ভালই করেছ, না হ'লে বাসায় এলে আর খাওয়া হ'ত না। দেখ না কি অবস্থা হয়েছে?

ব্যাপারটা কি হয়েছে আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, আমরা যাব কোথা ?

আর ব্যাপার! এদিকে তুমুলকাণ্ড হয়ে গেছে। তুমি ত ভোর বেলা চলে গেলে। তার কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুর এসে আমায় বল্লে, বাবু আমার মাইনে চুকিয়ে দিন, আমি চল্লেম। এমাসের ম্যানেজারি আমার কাছে কিনা, তাই আমার কাছে এসে মাইনে চেয়েছিল। আমি ঠাকুরকে বল্লাম, যদি তোমার যেতে ইচ্ছা হয় তুমি যেও, কিন্তু আমাদের এ বেলা পাকের কাজ সেরে বিকেলে যেও, তখন তোমার মাইনেও নিয়ে যেও। যেই মুখ থেকে কথা বেরুল অমনিই বাওয়া ত চলে না। ঠাকুর তাতে বল্‌ল, মশায়, এত অপমানের পর আমি আর এবাসায় একদণ্ডও থাকব না। আমার মাইনে চুকিয়ে দিন। আমি বল্লাম, তুমি এখন চলে গেলে আমাদের পাকের কি হবে? ঠাকুর তাতে বল্‌ল, তা আমি কি জানি? আমি তাতে কথা বলতে যাচ্ছি, অমনি সুধীর বাবু ঘর থেকে বের হয়ে বলে উঠলেন, কেন মশায়, ঠাকুর কি আপনাকে আবার পনর দিনের নোটিস দিয়ে যাবে নাকি? তার কাজ করতে ইচ্ছা না থাক্‌লে আপনি জোর করে তাকে কাজ করাবেন? নবীন বাবু তার ঘরে বসেছিলেন, তিনি সুধীর বাবুর এই কথা শুনে লাফ দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে বল্লেন, কোথাকার ছোট লোক হে তুমি, সামান্য একটা পাক করা ঠাকুরের পক্ষ হয়ে এসে ভদ্রলোককে অন্যায় মতে অপমান করলে? তোমার লজ্জা বোধ করে না? অমনি সুধীর বাবু বলে উঠ্‌লেন, খবরদার মুখ সামলে কথা কয়ো, আমাকে আর রাঁধুনি বামন পাও নাই, জুতিয়ে মুখ সমান করে দেবো। যেই সুধীর বাবুর এই কথা বলা, অমনি নবীন বাবু দেখ্‌ না দেখ্‌ তার ঘাড়ে পড়ে এক ঘা। অমনি সুধীর বাবু ধপাৎ করে মেজের উপর পড়ে গেলেন। তার পর হুলুস্থুল! আমরা সকলে

নিলে তাদের সরিয়ে দিলাম। ঠাকুরকে তখনই বিদেয় দিয়েছি। সুধীর বাবুও মেস ছেড়ে চলে গেছেন, আরও কেউ কেউ মেস ছেড়ে যাচ্ছেন। আমারও মনে হয়, আমাদেরও এ মেস ছেড়ে অন্য কোথায়ও যেয়ে থাকা কর্ত্তব্য। তাই আজ দুপুরে পটলডাঙ্গায় একটা মেস ঠিক করে এসেছি। আমার বিশ্বাস, আমার সাথে যেতে তোমার কোনও আপত্তি নাই?

আপত্তি! আপনার সাথে যেতে আপত্তি! কলকাতার সহরে যদি কেউ আমার পরম বন্ধু থাকেন ত সর্ব্বপ্রথম আপনি, তার পরে আজ পেয়েছি রমেশ বাবুকে।

আর সেখানে থাকবার তোমার একটা সুবিধাও করে এসেছি। সেখানকার লোক জনও বেশ ভাল। প্রায় সকলেই কলেজের ছাত্র, দুই একজন অফিসার আছেন। তাদের কাছে তোমার অবস্থা জানিয়ে বলায় তারা তোমার জন্য একখানা সিট অমনি ছেড়ে দিয়েছেন। আমি যে ঘরে থাকব তুমিও সেই ঘরে থাকবে। আগে সেই ঘরে দুজন থাকত, এখন সেই ঘরে তিন খানা তক্তপোষ পেতে নিব। কেমন ভাল হবে না?

অরুণ বাবুর কথা শুনিয়া কেদারের হৃদয় অরুণ বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল, সে বলিল,—আপনি যে আমার কত বড় হিতৈষী বন্ধু তা আর কি বলব। আপনি আমার সম্পর্কে কাকা, পিতৃস্থানীয়, পিতার পরই আপনি আমাকে স্নেহ করেন, এর বেশী আর কি বলব?

অত বল্‌তে হবে না, আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ করেছি। কাল রাত্রিতে এই মেসের কেউ কেউ তোমার সাথে যে ব্যভার করেছে তা মনে পড়লে আমার মনে হয় কি-জান? যারা কাল তোমার সাথে এই ব্যভার করেছিল, তারা নাকি আবার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বড় বড় উপাধিধারী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কি মানুষ তৈরী করে না?

ওগুলো যে পশুর চেয়ে অধম। কাল তাদের কথা শুনে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠেছিল।

না থাক্, সে বিষয়ে আর আলোচনা করে ফল কি? আমরা ত তাদের সংসর্গ ছেড়েই চলেছি।

হ্যাঁ, তাই আর আমার এই মেসে এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছা হয় না। তা হ'লে চল, এখন যাওয়া যাক্। আর ঐ মেসেও সম্ভব আমাদের বেশী দিন থাক্‌তে হবে না। খুকীর বিয়ে হলেই বাসা করব, তখন আমরা বাসায়ই থাকব।

লীলার কি সম্বন্ধ হয়েছে?

না, এখনও হয় নাই। সম্ভব আর চার পাঁচ মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। লীলার বিয়ের জন্যই এতদিন বাসা করতে পারছি না। বিয়ের জন্য দিতে হবে অন্ততঃ পক্ষে হাজার খানেক টাকা। তার উপর দান-সামগ্রী, সর্ব্বসাকল্যে মোট অন্ততঃ পক্ষে তিন হাজার টাকার কমে আর পারব না। আমাদের মত গরীব কেরাণীদের পক্ষে এত টাকা দেওয়াও অসম্ভব, অথচ না দিলেও নয়।

হ্যাঁ, এত টাকা বের করা কি সোজা কথা!

সোজা আর কঠিন বিবেচনা করলে ত চলবে না, যখন মেয়ে বিয়ে দিতে হবেই। আর মেয়ে বিয়ে বলে কেন, দিন দিনই যেমন হচ্ছে, আমাদের মত মধ্যবিৎ অবস্থাপন্ন লোক দিন দিন লোপ পাবে বলে মনে হয়। দেশে যা দেখি, আমাদের আয় বাড়ে না, অথচ খরচ দিন দিন বেড়ে চল্‌ছে।

হ্যাঁ, তাত নিশ্চয়ই। সমস্ত জিনিষই যেমন দিন দিন দুর্ম্মূল্য হয়ে চলেছে তাতে যে কেমন করে আমরা বাঁচ্‌ব বুঝি না। পৃথিবীর সমস্ত দেশের আয় দিন দিন বাড়্‌ছে, তাদের খরচও বাড়্‌ছে। বিলেতের,

আমেরিকার একটি মুটেমজুর রোজ রোজগার করে দশবার টাকা। তবুও তারা বলে তাদের আয় নাই, ছেলেপিলে ভরণ পোষণ করতে পারে না, তাদের রীতিমত খাওয়া চলে না। আর আমাদের ঐ আয় থাকলে ত বেঁচে যাই, তা হলে ত আমরা বড় লোকই মনে করি। তাদের আয়ও বেশী, তাদের খরচও বেশী।

জেনো কেদার, শুধু চাকরি ক'রে আর বড় লোক হতে পারা যায় না, বা দেশ তাতে ধনী হয় না, চাকরি করলে কোনও মতে টিন-টিনে রকম চল্‌তে পারবে।

আর চাকরি না করেই বা কর্‌ব কি? ব্যবসা যে কর্‌ব তার প্রধান অন্তরায়, আমাদের টাকা কই? দ্বিতীয়, ব্যবসা করব কি? ব্যবসা করতে হলেই বিদেশীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। গভর্ণমেণ্ট পেছনে না থাকলে বিদেশীর সঙ্গে প্রতিদন্দিতা অসম্ভব। এরকম ভাবে দেশ চল্‌লে আমাদের মরণই নিশ্চয়। তার মধ্যে আবার আমাদের দেশের লোকও বুঝবে না এই মালতীর বিয়ের সময় মালতীর শ্বশুর আমার উপর কি অত্যাচারটাই কর্‌লে; যা চুক্তি ছিল তাত দিলাম, তার উপর বিয়ের সময় এসে, এটা দাও, ওটা দাও, এমনি করে আরও চার পাঁচ শ' টাকা আমার থেকে আদায় করল। আমি তাকে আমার অবস্থা কত বুঝালেম, কিন্তু তিনি আমার থেকে আদায় করলেনই করলেন। গ্রামের লোকজন বলেছিল, আর কিছু দিও না; আমি দেখলাম, মালতীর ভবিষ্যতে কষ্ট হতে পারে, তাই যা কিছু বাবা রেখে গিয়েছিলেন তা বেঁচে মালতীর শ্বশুরকে দেই। সেই বিয়েতে আমার প্রায় দুহাজার সোয়া দুহাজার লেগেছিল। কিন্তু বরটি পেয়েছি ভাল। সে দিন সুশীল এসেছিল, সে সব কথা শুনে বল্লে, আমি বাবার ব্যভারে লজ্জিত হয়েছি, আমি উপার্জ্জন করেনি, সব সুদে, ফিরিয়ে দিব।

আরে ওসব রেখে দাও, এখনকার দিনে ছেলেরা আর কিছু শিখুক আর না শিখুক লম্বা লম্বা কথা কওয়া শেখে। লম্বা লম্বা বক্তৃতা অনেকেই করে, তা কার্য্যকরী করে কয় জন? চল, এখন তবে নূতন বাসায় যাওয়া যাক্।

এ বাসায় আর আর লোক কয় জন থাকবে?

তুমি, আমি, সুধীর, ভূদেব বাবু ছাড়া আর সকলেই থাকবে। নবীন বাবু, শ্রীশ বাবু, তারা আমাকে এখানে থাকতে অনেক বলেছিলেন, আমার এখানে থাক্‌তে আর ভাল লাগে না। পটলডাঙ্গার মেসে আমাদের একজন অফিসার আছেন, আমারই অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী, বেশ ভাল লোক, বেশ নিরিবিলি গোছের, তার চেষ্টাতেই ঐ সিট টা পেয়েছি। তাই সেখানেই যাওয়া ঠিক করেছি।

তা হ'লে চলুন!

অরুণ বাবু আর কেদার পটলডাঙ্গার মেসে যাইয়া সেই রাত্রি হইতে বাস করিতে লাগিল।

নিশিকান্ত পূর্ব্বের মত আবার উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব প্রাপ্ত হইল—আবার ঘোরতর মদ্যপায়ী হইয়া দাঁড়াইল। সে এখন নরেন্দ্র নারায়ণের নিত্য সহচর। ভুবনমোহিনীর শত অনুরোধ, উপরোধ তাহার নিকট জলের ন্যায় ভাসিয়া গেল। হলধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, নিশিকান্তের ব্যবহারে যেন কোনও মতে জীবন্মৃত হইয়া রহিলেন। এই ভাবে নিশিকান্তের বিবাহের পর বৎসর দুই তিন চলিয়া গেল। এমন অনেক দিন ঘটিতে লাগিল, নিশিকান্ত বাড়ীতেই আসে না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার দিন রাত্রিই মনে হইত, এমন অপদার্থ পুত্রকে আমি বিবাহ করাইলাম কেন? এমন সোণার প্রতিমাকে আমি কেন আনিয়া জলে ভাসাইলাম? এ যে প্রতিমার বোধন না হইতেই বিসর্জ্জন! মার আমার পূর্ণ যৌবন কাল, তাতেই পুত্র আমার তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহে না, আর ত ভবিষ্যতে ফিরিয়াও চাহিবে না? পুত্রের যে রকম স্বভাব, এ স্বভাব যে তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে পরিবর্ত্তন হয়, এমন ত মনে হয় না। আমি বানরের গলায় মুক্তার হার পড়াইয়া দিয়াছি। যে স্ত্রীরত্ন নিশিকান্ত লাভ করিয়াছিল, তাহা সম্ভবতঃ তাহার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে পাইয়াছিল, কিন্তু হতভাগ্য পুত্র তাহার মূল্য বুঝিল না। ভুবনমোহিনীর মত এমন স্ত্রীরত্ন জগতে দুর্লভ। এই দেবীর অপমান! নিশিকান্তের পরিণাম ভীষণ!

ভুবনমোহিনী গর্ভবতী, দিন দিনই তাহার শরীর খারাপ হইয়া আসিতেছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রোগে, জরায় ও মানসিক ক্লেশে জর্জ্জরিত, তাহারও দিন প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। নিশিকান্তের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। সে তাহার আমোদ প্রমোদ নিয়াই মত্ত, মন যাহা চাহে তাহাতেই গা ঢালিয়া দিতেছে। নরেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতায় যায়, নিশিকান্ত তাহার পার্শ্বসহচর, নিশিকান্তকে না হইলে তাহার একদণ্ড চলে না। নরেন্দ্রনারায়ণ সময় সময় মাসাবধি কাল বিদেশে থাকে, নিশিকান্ত তাহার সঙ্গেই থাকে, বাড়ীর লোক জন বাঁচিয়া আছে কিনা তাহাও জানিবার তাহার প্রয়োজন নাই, তাহার মূল্যবান সময় এমন ভাবে অপব্যয় করিতে পারে না।

ক্রমে ভুবনমোহিনীর অন্তঃসত্ত্বার কাল দশ মাসে পরিণত হইল। ওদিকে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরও ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বর হইতে লাগিল। তাহার উপর আবার বৃদ্ধকালের সর্দ্দি, কফ, বাত আসিয়া দেখা দিল। এমন অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইল, বৃদ্ধের কখন কি হয় বলা যায় না। এমন সময় নিশিকান্ত একদিন হঠাৎ বৈকাল বেলা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। সেই দিন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ আজ রাত্রি পার হন কিনা তারও বিশ্বাস নাই। ভুবনমোহিনীর শরীরও আজ খুব খারাপ লাগিতেছে। নিশিকান্তকে এ সময়ে বাড়ীতে দেখিয়া ভুবনমোহিনীর প্রাণে বড়ই আশ্বাস হইল।

ভুবনমোহিনী নিশিকান্তকে বলিল,—যা হোক ভালই হয়েছে, এখন বাড়ীতে এসে ভালই করেছ।

নিশিকান্ত বলিল,—না, এখন আমি থাকতে পারব না, আমাকে এক্ষণি নরেন্দ্র বাবুর সাথে কল্‌কাতায় যেতে হবে।

তা হ'লে এখন বাড়ীতে এলে কেন? বাড়ীতে একথা বলবার জন্যনা

এলেই হতো? এতদিন পরে বাড়ীতে এসেছ কি শুধু এ কথা দুটি বলবার জন্য?

নিশিকান্ত বিনা মতলবে বাড়ীতে আসে নাই, সে আজ পনর দিন পরে বাড়ীতে আসিয়াছে। সে নরেন্দ্রনারায়ণের কোনও কার্য্যে ঢাকায় যাইবে, সেই কার্য্যে তাহারও কিছু টাকার প্রয়োজন, সেই টাকা সংগ্রহ করিতেই সে বাড়ীতে আসিয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার সংসারের যাবতীয় ভার ভুবনমোহিনীর উপর সঁপিয়া দিয়াছিলেন, টাকা পয়সা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই ভুবনমোহিনীর জিম্মায় রাখিয়া দিয়াছেন, তাহার এখন টাকা দিয়া প্রয়োজন কি? তিনি ত এপারের খেলা শেষ করিয়াছেন, তাই তিনি ভুবনমোহিনীকে তাহার কোষাধ্যক্ষ করিয়া আর্থিক সম্বন্ধে নিশ্চিন্তমনে দিন কাটাইতেছিলেন। নিশিকান্ত সময় সময় ভুবনমোহিনীকে তোষামোদ করিয়া, সময় সময় তাহাকে ভয় দেখাইয়া, তাহা হইতে টাকা আদায় করিয়া নিয়া যাইত। কি করিবে, সে যে নারী। আমাদের দেশের নারী যে স্বামীর বিরুদ্ধে তেমন ভাবে দণ্ডায়মানই হইতে পারে না, দুই একবার প্রতিবাদ করিতে পারে মাত্র। ভুবনমোহিনী তাহার যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিশিকান্তকে টাকা দিত। নিশিকান্ত সেই টাকা যথেচ্ছা প্রকারে অপব্যয় করিত। নিশিকান্ত ভুবনমোহিনীর কথা শুনিয়া হাসিয়া কহিল,—বাড়ীতে এলে ত আর দোষ নাই. দেখে গেলাম তোমরা কেমন আছ?

ভুবনমোহিনী নিশিকান্তের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল। স্ত্রী দশ মাস অন্তঃসত্বা, পিতা একপ্রকার মৃত্যুশয্যায়, ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি আর নাই, সে আজ পনর দিবস পরে তাহাদিগকে শুধু ক্ষণেকের জন্য দেখিতে আসিয়াছে! পিতা স্ত্রীর এই অবস্থা দেখিয়াও সে মাসেক কালের জন্য

আমোদপ্রমোদ করিতে বিদেশে চলিল! পিতা স্ত্রীর উপর কি তাহার একটুও কর্ত্তব্য নাই? শুধু এই কথা বলিবার জন্যই কি সে বাড়ীতে আসিয়াছে, না আরও কিছু মতলব আছে?

ভুবনমোহিনী নিশিকান্তের কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তৎপরে বলিল,—কেমন দেখ্‌লে? বাড়ীর সব কুশল?

নিশিকান্ত ক্রোধান্বিত স্বরে বলিল,—আমার সঙ্গে তুমি ঠাট্টা আরম্ভ কর্‌লে দেখ্‌ছি। আমি কি তোমার বিদ্রূপ শুন্‌তে বাড়ীতে এসেছি?

না, তোমায় বিদ্রূপ করব কেন? পিতার অন্তিমকাল উপস্থিত, স্ত্রী তোমার দশ মাস অন্তঃসত্ত্বা, বাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তি আর নাই, এরূপ অবস্থায় তুমি দু মিনিটের জন্য বাড়ীতে এসেছ! আমাদের এ অবস্থায় ফেলে তোমার কি বিদেশে যাওয়া উচিত? আমার মাথা খাও, এখন বাড়ী থেকে যেয়ো না।

আমি কি বলেছি যে আমি চিরকালের জন্য বাড়ী থেকে যাবো? এই জন্যই ত বাড়ীতে আসি না। আসলেই কেবল ভ্যান্ ভ্যান্।

একয়টা দিন তোমার বাড়ীতে থাকতেই হবে। বাবার জ্বর খুব বেড়েছে, আজ তার অবস্থা খুব খারাপ, হয়ত আজই চলে যেতে পারেন। আমার শরীরও খারাপ, আমাকে গালি দেও আর মার, তোমাকে আজ যেতে দিব না। মাথা খাও, এ কয়টা দিন বাড়ীতে থেকে যাও।

পিতার অন্তিমকাল প্রায় উপস্থিত শুনিয়া নিশিকান্তের সাময়িক একটা মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—বাবা এখন আছেন কেমন?

আর আছেন, তিনি চলেছেন। তুমি যেয়ে একবার তাঁকে দেখে এস।

আমি আর দেখব কি? না, তাহলে আর এখন যাব না। আচ্ছা, তুমি আমার একটা কাজ কর, আমায় পঞ্চাশটা টাকা দেও, আমি নরেন্দ্র বাবুকে দিয়েই চলে আসব, আর তার সাথে যাব না।

অত টাকার তোমার এখন কি প্রয়োজন হলো ?

টাকার জন্য স্ত্রী তাহার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিতেছে, এ ত বড়ই বেয়াদবির কথা। ভুবনমোহিনীর আস্পর্দ্ধা দেখিয়া সে যেন চমকিয়া গেল। স্ত্রী যে স্বামীকে এত বড় বেয়াদবির কথা বলিতে পারে, ইহা যেন তাহার ধারণাতেই ছিল না।

সে বিকট হাস্য করিয়া বলিল,— বাঃ, তুমি যে আমার অভিভাবক হ'য়ে উঠ্‌লে ? আমার টাকা আমি খরচ করব, তার আবার নিকাশ দিতে হ'বে নাকি ? আমার এখন ঐ কয়টা টাকার দরকার হয়েছে এই মাত্র বল্লাম, এখন তোমার দিতে ইচ্ছা হয় দেও, আর দিতে ইচ্ছা না থাকে, না দিলে। তাকে আবার নিকাশ দিতে যাব ?

কেন তোমার টাকার দরকার, তা না বল্‌লে আমি টাকা দিব না। তুমি এমনি ভাবে টাকা নিয়ে যাও বলে বাবা আমায় মন্দ বলেন।

আচ্ছা, থাক তুমি টাকা নিয়ে, বাবাকে খুসী কর যেয়ে, আমি চল্লাম। টাকা আমার চাই-ই, তবে টাকার চেষ্টাতেই আমার বাড়ীর বের হতে হবে, শেষে কিন্তু আমায় অনুযোগ দিতে পারবে না।

নিশিকান্তের কথা শুনিয়া ভুবনমোহিনীর মনে অতীব দুঃখ হইল। পিতার অন্তিমকাল প্রায় উপস্থিত, সে দিকে লক্ষ্য নাই; সে এখনও তাহার আমোদপ্রমোদ নিয়াই ব্যস্ত। লোকে কি এত নিষ্ঠুরও হইতে পারে ? কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া মনে করিল, হয়ত টাকা পাইলে সে এবার বাড়ীতে থাকিতেও পারে।

ভুবনমোহিনী বলিল,— আচ্ছা, আমি টাকা দিলে তুমি সেই টাকা দিয়েই বাড়ী চলে আস্‌বে ?

নিশ্চয়ই আসব। আমার কি জ্ঞান নাই ? আমি কি তোমাদের এ অবস্থায় ফেলে যেতে পারি ? আমি এখন বাড়ী থেকে যেতামই না,

তবে টাকা কয়টা তাকে না দিলে আমার জাত থাকবে না, তাই তাকে টাকা কয়টা দিয়েই চলে আসব।

আমি টাকা এনে দিচ্ছি। দেখো কিন্তু, তোমার কথা এবার যেন ঠিক থাকে।

দেখবেই, এবার আমার কথার নড়চড় হবে না। আমায় বিশ্বাস করেই দেখো। আমার ফিরে না আসা পর্য্যন্ত নাপিত বাড়ীর রামার মাকে এখানে বসে থাক্‌তে বলব, রামাকেও ভাল করে বলে যাব এখন। আমার ফিরে আসতে ঘণ্টাখানেক লাগ্‌বে।

তোমার কথা ত এখন ঠিক থাকে না, দেখি আজ পিতার জন্য যদি কোনও কর্ত্তব্য-জ্ঞান থাকে, এ কথাটি ঠিক থাকে কিনা।

এই কথা বলিয়া ভুবনমোহিনী পঞ্চাশটি টাকা আনিয়া নিশিকান্তের হাতে দিয়া বলিল,- যাবার সময় একবার বাবাকে দেখে যাও।

নিশিকান্ত বলিল,—"না এখন আর দেখ্‌ব কি? আমি এলেম বলে।" ইহা বলিয়া নিশিকান্ত টাকা কয়টা নিয়া চলিয়া গেল। পিতাকে দেখিয়া যাওয়া নিশিকান্ত সঙ্গত বোধ করিল না বা তাহার অত সময়ও ছিল না। সে সেই টাকা নিয়া নরেন্দ্রনারায়ণের বাড়ীতে চলিয়া গেল।

নিশিকান্তের বাড়ীর নিকটই একটি নাপিত বাড়ী। সে বাড়ীর বর্ত্তমান মালিক রামচন্দ্র শীল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যোল আনা প্রজা রামচন্দ্র। তাহার বয়স অনুমান ২৭।২৮ বৎসর, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খুব অনুগত লোক। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যখন যে প্রয়োজন হয়, সে অম্লান বদনে তাহা করে। তাহার মাতা বৃদ্ধা, বয়স অনুমান যাট। রামচন্দ্রের একটি মাত্র পুত্র, বয়স বৎসরেক হইবে। তাহারা দুই ভাই, এক বোন্। রামচন্দ্র নিজের জাত ব্যবসা করিত, ও জোত জমি যাহা ছিল

তাহাতেই দিন একরকম চলিয়া যাইত। রামচন্দ্রের ছোট ভাই গকুল-চন্দ্র, বয়স অনুমান ১৪।১৫, সে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে মাসিক ৩৲ টাকা বেতনে ভৃত্যের কাজ করিত। সে সারাদিন প্রায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতেই থাকিত। বোনটির ভিন্ন গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল, সে শ্বশুর বাড়ীতেই থাকিত।

নিশিকান্ত চলিয়া যাইবার কিছুকাল পরেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভুবন-মোহিনীকে ডাক দিলেন,—মা, এদিকে একবার এসত মা।

ভুবনমোহিনী শ্বশুরঠাকুরের ডাক শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—আমায় কি ডাক্‌ছিলেন?

আমার তন্দ্রার মত এসেছিল, নিশিকান্তের গলা না শুন্‌ছিলাম? সে কি বাড়ীতে এসেছিল?

হ্যাঁ, তিনি বাড়ীতে এসে আবার চলে গেছেন।

এসে আবার চলে গেছে? আমায় একবার দেখা দিয়েও গেল না?

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কথাগুলি বলিয়াই একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। ভুবনমোহিনী বুঝিতে পারিল, তাহার শ্বশুরঠাকুর স্বামীর ব্যবহারে কিরূপ মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইতেছে। ভুবনমোহিনীর চক্ষে জল আসিল।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—ওঃ! কি নিষ্ঠুর! বৌমা, নিশির যখন ৮ বৎসর বয়স, তখন নিশি মাতৃহারা হয়। সেই অবধি তাকে আমি বুকে করে মানুষ করেছিলাম, আমিই তার বাপ, আমিই তার মা ছিলাম। সে যে মাতৃহারা ছিল একদিনের জন্যও তাকে আমি তা বুঝ্‌তে দেই নাই। তার প্রতিদান কি এই! সবই অদৃষ্ট! সবই কর্ম্মফল! কাকে আর দোষ দেবো মা, সবই আমার কর্ম্মফল! মা, আর এজন্মে নিশির সাথে দেখা হলো না, আজ আমি চলেছি। মা,

একটা কথা বলি। সে আমার কাছে, সে তোমার কাছে শত অপরাধ করলেও সে এখনও আমার কাছে সেই মাতৃহারা শিশু। তার মা মরবার সময় তাকে আমার হাতে ধরে দিয়েছিলেন। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি কিনা ভগবান জানেন। বৌমা, আজ মনে বড় ব্যাথা পেয়ে চল্লাম।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছুক্ষণ মৌন থাকিলেন, ভুবনমোহিনী কাঁদিতে লাগিল। তিনি আবার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন,—আর ব্যথাই বা কতক্ষণ! যতক্ষণ শরীরে রক্তের কিছুমাত্র জোর আছে ততক্ষণ ব্যথা, সম্ভব সে ব্যথার আজই শেষ দিন!

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আবার কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—এমন ঘরেই মা জন্মেছিলি যে পিতৃকুলে দাঁড়াবার তোর স্থান নাই, এক ছিল মা, সেও চলে গেছে। আবার এমন ঘরেই তোকে এনেছি, সেখানেও তোর দাঁড়াবার স্থান নাই। আমি মলে যদি নিশিকান্তের মতিগতি ফিরে। তা না হ'লে যে তোকে এসংসারে একা ভাস্‌তে হবে। ভাল, নিশিকান্ত যাওয়ার সময় তোমাকে কি বলে গেল?

আমার থেকে ৫০্টি টাকা নিয়ে গেছেন, নরেন্দ্র বাবুর নাকি পাওনা আছে, সেই টাকা দিয়েই তিনি আস্‌বেন।

হাঁ, তা হলেই হয়েছে, সে আর আস্‌ছে না। এখনও প্রবঞ্চনা! এতবার তোমার থেকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়ে গেল, এবারও তার সেই ফাঁকিটা ধরতে পারলে না মা? মা, সে তোমার জন্যও এসেছিল না, আমার জন্যও এসেছিল না; সে যার জন্য এসেছিল তা হস্তগত হয়েছে, বাস্, এবাড়ীর সাথে তার আপাততঃ সম্পর্ক ঘুচে গেছে।

এই কথা বলিয়া তিনি আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন, তৎপরে বলিতে লাগিলেন,—বৌমা, তা হলে আর একটা কথা বলে যাই। ও আর

আস্‌ছে না, হয়ত আমারও আজ শেষ দিন। তোমার পেটে আমার ভবিষ্যৎ বংশ আছে। আমি মলে তুমিই আমার মুখে আগুনটা দিও, তা হ'লেই আমি নরক হতে ত্রাণ পাব।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা শুনিয়া ও তাহার অবস্থা দেখিয়া ভুবনমোহিনীর ভয়ানক ভয় হইতে লাগিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,--এসব অলক্ষণে কথা কি বল্‌ছেন? তিনি এলেন বলে।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,— আর এসেছে! যাক্ তার চিন্তা আর করি না, অনেক কাল তার জন্য চিন্তা করেছি, আর কতকাল চিন্তা কর্‌ব! এখন যার জন্য চিন্তা করা দরকার তার জন্য একটু চিন্তা করি মা!

ইহা বলিয়াই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ভুবনমোহিনী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া রহিল। সে দেখিতে পাইল, তাহার শ্বশুরঠাকুরের যেন এখন আর সে যাতনা ক্লিষ্ট বদন নাই,—তখন তাহার যেন প্রশান্ত মূর্ত্তি, তাহার হৃদয় যেন চিন্তা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার পর হইতেই ভুবনমোহিনীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অবস্থাও ক্রমে ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়িতে লাগিল। ভুবনমোহিনী যেন অকূল সমুদ্রে পড়িয়া গেল, সে যে চোখে আর কোনও দিকেই পথ দেখে না। এমন বিপদও মানুষের হয়? তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এখনও যদি নিশিকান্ত আসে। কিন্তু নিশিকান্তের কোনও খোঁজ খবর নাই। ক্রমেই রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, তখন সে তাহার স্বামীর আশা একেবারে পরিত্যাগ করিল। সে আর উপায়ান্তর না দেখিয়া গকুলচন্দ্রকে তাঁহার মাতা ও রামচন্দ্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। তাহারা সেই মুহূর্ত্তেই চলিয়া আসিল।

ভুবনমোহিনী রামচন্দ্রের মার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—নাপিত মাসী, আজ আমার যে কি বিপদ তা আর তোমাকে কি বলব? এমন বিপদ সম্ভব কারো কোনও দিন হয় না, আমি বাড়ীতে এখন সম্পূর্ণ একা, আমারও প্রসব বেদনা উঠেছে, শ্বশুরঠাকুরও চলেছেন, সম্ভবতঃ আজই যাবেন। তোমরা দুজনে আজ সারাটা রাত আমার এখানে থাকবে। মাসী, বরাবরই তুমি আমাকে মেয়ের মত দেখেছ, আমার মা নাই, তুমিই আমার মা।

রামচন্দ্রের মা বলিল, -ছোট বাবু কই? তিনি এ বিপদের কথা কিছু জানেন না? আর ছোট বাবু যে কি হলো? এমন পিতার ঔরসে এমন ছেলে হয়?

তিনিত সন্ধ্যার আগেই বাড়ী এসেছিলেন, সব দেখে শুনেও আবার নরেন্দ্র বাবুর কাছে চলে গেলেন। সবই আমার অদৃষ্ট মাসী, সবই আমার অদৃষ্ট,! এসব পূর্ব্বজন্মের ফল। মাসী, আজ আমার এবিপদে একমাত্র সহায় উপরে ভগবান, নীচে তোমরা।

তা মা, সে বিষয়ে কোনও চিন্তা করো না। আমাদের কি, আমরা সারারাতই তোমাদের কাছে থাকবো এখন। কিন্তু ভাবি, এবিপদ দেখেও ছোট বাবু চলে গেলেন? তিনি কি মানুষ না আর কিছু? হ্যাঁ, মা, তুমি আর জন্মের পাপের ফলই ভুগছ, না হলে তোমার মত সোণার মেয়ের এ অদৃষ্ট কেন?

ভুবনমোহিনী রামচন্দ্রের মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—আজ থেকে তুমিই আমার মা! মা আমায় এ বিপদ থেকে রক্ষা কর।

ভুবনমোহিনীর কথায় রামচন্দ্রের মার প্রাণ গলিয়া গেল, মা এমন মধুর ডাক; সে ভুবনমোহিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, – ভয় কি বউ,

আজ থেকে আমি তোমার মার মতই কাজ করব, আজ থেকে তুমি আমার মেয়ে হ'লে। আমরা সারারাতই তোমার কাছে থাক্‌ব। আমি তোমার কাছে থাক্‌ব, গকুল আর রাম বুড়ো কর্ত্তার কাছে থাক্‌বে। ভয় কি মা, বিপদে সাহস চাই। সংসারে থাক্‌তে গেলে কত রকম বিপদ হয়, তাতে ভয় পেলে চলবে কেন মা? সাহস কর মা।

রামচন্দ্র বলিল,—দিদি, আমরা থাকতে তোমার কোনও ভয় নাই। আজ থেকে আমাদের ভাইর মত দেখো, আমরাও তোমাকে বোনের মতই দেখবো। কোনও ভয় নাই দিদি, বিপদে ভরসা এক মধুসূদন। তাঁকে ডাকো, তিনিই সব বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

রামচন্দ্রের মাতার ও রামচন্দ্রের কথায় ভুবনমোহিনীর মনে অনেকটা সাহস হইল। বিপদ আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই লোকের ভয় থাকে, কিন্তু বিপদ আসিয়া পড়িলে লোকের ভয় অতিক্রম হইয়া যায়। তখন লোকে সেই বিপদ হইতে কি প্রকারে উদ্ধার পাইতে পারে তাহারই চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল রাত্রি দুপ্রহরের পরে ভুবনমোহিনীর প্রসব হইল, রামচন্দ্রের মাতাই তাহাকে প্রসব করাইল।

রামচন্দ্র ও গকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বসিয়া আছে, শেষ রাত্রিতে বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইয়া আসিল। ভুবনমোহিনীর প্রসবের ঘণ্টাখানেক পরেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অবস্থা খারাপ হইয়া আসিল, তখন হইতে যেন তাহার দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিতে লাগিল। রামচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনীকে কাপড় চোপড় ছাড়াইয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করাইয়াছে, এমন সময় রামচন্দ্র ডাক দিল,—বুড়ো কর্ত্তা ইহধাম ছেড়ে চলেছেন, দিদি এদিকে একবার এসো!

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুপ্রহর রাত্রির পর হইতেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া ভুবনমোহিনী রামচন্দ্রের মাতাকে

বলিল,—"আমি ত এখন শ্বশুরের কাছে না যেয়ে পারি না, এখন খোকার কাছে কে থাকে? আর আমিত একা হেঁটেও যেতে পারি না, এখন উপায়? আমি কি বিপদে পড়লাম!" ইহা বলিয়া ভুবনমোহিনী কাঁদিতে লাগিল।

রামচন্দ্রের মাতা বলিল,—মা, তুঁমি কেঁদো না, আমি তার ব্যবস্থা করছি। আমার বৌকে আমি ডাকচ্ছি, সে এসে খোকাকে রাখ্‌বে। আমার বৌর মা এসেছে, সেই আমাদের খোকাকে রাখ্‌তে পারবে। আর রাতই বা কতক্ষণ আছে। আমিই তোমাকে ধরে নিয়ে যাব।

ইহা বলিয়া রামচন্দ্রের মাতা রামচন্দ্রকে সবিশেষ বলিয়া তাহার স্ত্রীকে ডাকিতে বলিল। রামচন্দ্র তাহার স্ত্রীকে অবিলম্বে ডাকিয়া নিয়া আসিল। রামচন্দ্রের স্ত্রী আসিয়া ভুবনমোহিনীর পুত্রকে রাখিল, ভুবনমোহিনী রামচন্দ্রের মাতার কাঁধে ভর দিয়া শ্বশুরঠাকুরের শয্যার নিম্নে যাইয়া বসিল। ইহার কিছুক্ষণ পরেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটু জ্ঞান হইল। তিনি বলিলেন,—মা কই?

ভুবনমোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বাবা, এইত আমি।

আমি যেন দেখ্‌ছিলাম আমার মার কোলে একটি সোণার চাঁদ এসেছে, এটা কি সত্যি?

রামচন্দ্রের মাতা বলিল, "হ্যাঁ, ছোট বাবুর একটি ছেলে হয়েছে।" এই কথা শুনিয়া মরণের যাত্রির মুখেও একটু হাসির রেখা ফুটিল। তৎপরে অতি অস্পষ্ট স্বরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "বেঁচে থাকুক আমার বংশের প্রদীপ। মা, তোর এই প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখ্‌তে হবে, সেই ভার তোর উপর রইল।" এই কথা বলিয়াই আবার তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সূর্য্য উদয় হইতে হইতেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুণ্যাত্মা ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। নিশিকান্তের উদ্দেশে রামচন্দ্র নরেন্দ্র-

নারায়ণের বাড়ীতে গেল। সেখানে যাইয়া জানিতে পারিল, তৎপূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নিশিকান্ত নরেন্দ্র বাবুর সহিত কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। অগত্যা ভুবনমোহিনীই তাহার শ্বশুরঠাকুরের মুখে আগুন দিয়া শ্বশুর ঠাকুরের শেষ আদেশ পালন করিল।

শ্বশুরঠাকুরের দেহ দাহন করিয়া ঘরে ফিরিলে ভুবনমোহিনীর মনে হইতে লাগিল, এ পৃথিবীতে ত সে এখন সম্পূর্ণ একা। এরূপ একাত্ব সে পূর্ব্বে অনুভব করিতে পারে নাই। ঘরে ঢুকিতেই তাহার মনে হইতে লাগিল, এ বিশ্ব সংসারে সকলেই তাহার আপনার জন নিয়া আছে, তাহার যে আজ কেহই নাই। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ শূন্য ঘরে সে একা এই শিশুপুত্র নিয়া কি করিয়া থাকিবে। তাহার স্বামী থাকিতেও যে নাই। সে কথা স্মরণ করিতেও যেন তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, উঃ! লোক এত নিষ্ঠুরও হইতে পারে! আবার তাহার আর এক চিন্তা মনের মধ্যে উদিত হইল, সে যুবতী, একা এই সংসারে কি করিয়া থাকিবে? তাহার মান সম্ভ্রম ত আছে, সে মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিবে কি করিয়া? আবার স্বামীর কথা তাহার মনে হইল। তিনি কি এখনও আসিবেন না? পিতার মুমূর্ষ অবস্থার কথা শুনিয়া, স্ত্রীর আসন্ন প্রসবের অবস্থা দেখিয়াও যখন স্বামী সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিজ মনস্তুষ্টির জন্য ব্যস্ত, তখন সেই স্বামী কি এখন আসিবেন? আর আসিলেই বা তিনি কত দিন ঘরে থাকিবেন? স্বামীর উপর আর তাহার নির্ভর রহিল না। বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া আর কূল কিনারা পাইল না, তখন হতাশ হইয়া পুত্র কোলে করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আবার তাহার মনে ক্ষীণ আশার রেখা উদয় হইল। তাহার মনে হইল, যাহার কেহ নাই সে কি বিশ্ব সংসারে একা থাকে না? মহাকবি

রবীন্দ্রনাথের একটী গানের কথা তাহার মনে হইল,—এ সংসারে যাহার কেহ নাই, সকলি তাহার। এ সংসারে সকলকেই তাহার আপনার করিয়া নিতে হইবে। আপনার যদি পর হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে আপনার করা দুষ্কর, কিন্তু ভালবাসার গুণে পরকে আপনার করা অতি সহজ। তাহার মনে বল সঞ্চার হইল, তাহার মনে হইল, না, এমন করিয়া হতাশ হইয়া থাকিলে ত চলিবে না, সে ত এসংসারে একা নয়। তাহার যে শিশু পুত্র আছে। তাহাকে বাঁচাইয়া উঠাইতে পারিলে সে-ই যে তাহার প্রধান সহায় হইবে। ভগবান যে তাহাকে সেই অবলম্বন পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাকে ত তাহার বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। শ্বশুরঠাকুর মরণের পূর্ব্বে তাহাকে বলিয়া গিয়াছেন, তাহার বংশের প্রদীপ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রদীপকে তাহারই জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে। সে তখন তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিল।

ভুবনমোহিনী রামচন্দ্রের মার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—মা, আজ থেকে এ পৃথিবীতে তোমরাই আমার সকলের চেয়ে বড় আত্মীয়। তোমরাই কিন্তু আমার একমাত্র সহায়, তোমাদের উপরই কিন্তু আমার মান সম্ভ্রম, আমার আর আমাদের শিশুর জীবন মরণ নির্ভর করে।

ভুবনমোহিনীর কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের মাতা বলিল,—ভয় কি মা, আমরা থাকতে তোমার কোনও চিন্তা নাই, আজ থেকে গকুল তোমার বাড়াতে অনুক্ষণ থাকবে, আমরা ত আছিই রাত্রিতে আমি এসে তোমার কাছে শুয়ে থাকব। ভয় কি মা, বিপদে একমাত্র সহায় মধুসূদন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর তিন দিবস পরে নিশিকান্তের নিকট পিতার মৃত্যু-সংবাদ ও তাহার পুত্র হওয়ার সংবাদ পৌছিল। নরেন্দ্রনারায়ণ তখন কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ বেশ্যাকে বাড়ীতে আনিয়া আমোদপ্রমোদে মত্ত। নিশিকান্ত তাহার প্রধান সহচর। বোতলের পর বোতল নিঃশেষ

হইতেছিল, নিশিকান্ত তখন মদে বিভোর। নরেন্দ্রনারায়ণ অতি বিচক্ষণ মদ্যপায়ী, যত মদই পান করুক না কেন, সে সম্পূর্ণ জ্ঞান হারায় না। নরেন্দ্রনারায়ণ নিশিকান্তের পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাঠে নিশিকান্তকে বলিল, —তা হ'লে তোমার এখন বাড়ী যাওয়া কর্ত্তব্য।

নিশিকান্ত তাহা শ্রবণ করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—আঃ, সব ফুর্ত্তিটা মাটি করে দিলে, আজ আমোদটা জমেছিল ভাল। বাপ্‌বেটার যেন মরারও সময় নাই, আর কয়েক দিন পরে মরলে কি হতো?

নরেন্দ্রনারায়ণের অপর এক ইয়ার বলিয়া উঠিল, নিশিভায়া, এটা তোমার বাপের দোষ নয়, এটা ঐ যম বেটার দোষ, সময় নাই অসময় নাই যখন তখন ধরে টানাটানি।

নিশিকান্ত জড়িত স্বরে বলিল,—সে শালাকে একটু ভালমতে শিক্ষা না দিলে আর চল্‌ছে না, শালা বড় বেড়ে গেছে।

পিতার মৃত্যু সংবাদে নিশিকান্তের সেদিনকার আমোদটা পণ্ড হইয়া গেল। বাধ্য হইয়া তাহার বাড়ীতে রওনা হইতে হইল। পিতার মৃত্যুর পাঁচ দিবস পরে সে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাড়ীতে আসিয়া পিতার শ্রাদ্ধে কি ব্যয় করিতে হইবে তাহার ফন্দ ধরিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। গ্রামের বহু বদ্ধিষ্ণু লোক আসিয়া তখন তাহাকে বলিল, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন, সামান্য চাকরি করিলেও তিনি ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন, তাহার সঞ্চিত অর্থ দিয়া তাহার দানসাগর শ্রাদ্ধ করা উচিত। আবার কেহ কেহ বলিল, এই শ্রাদ্ধে তাহার বেশী ব্যয় করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত হইবে না, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সামান্য বেতনে চাকরি করিতেন, কত টাকাই বা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। নিশিকান্তও কার্য্যক্ষম নহে, ওদিকে তাহার একটি পুত্রও হইয়াছে, তাহাকেও মানুষ করিতে হইবে। এমত অবস্থায় যাহা একান্ত

না করিলে নয়, তাহা করিয়াই এই শ্রাদ্ধ কার্য্য নিশিকান্তের সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।

নিশিকান্তের পিতার উপর প্রগাঢ় ভক্তি উছলিয়া উঠিল। সে বলিল, পিতার কোনও মঙ্গলের কার্য্যই সে বাঁচিয়া থাকিতে করিয়া উঠিতে পারে নাই। পিতার মৃত্যুর পর তাহার সদ্গতির জন্য তাহার শেষ কার্য্যটুকু সে ভাল করিয়া সম্পন্ন করিবে না কেন? সে পুরুষ মানুষ, বাঁচিয়া থাকিলে উপার্জ্জন করিতে আর কষ্ট কি? সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুক্তিই তাহার মনঃপূত হইল, সে তাহার পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য বেশ জাঁকজমক সহকারে সম্পন্ন করিবার মনস্থ করিল।

নিশিকান্ত বলিয়া কেন, আমাদের এই হতভাগা দেশে সবই অদ্ভুত! এই অদ্ভুত কার্য্য আমরা সর্ব্বদাই প্রায় দেখিতে পাই। যে বাঁচিয়া থাকিলে তাহার ব্যারামের সময় এক টাকা ব্যয় করিয়াও চিকিৎসা করাইব না, সে মরিলে তাহারই শ্রাদ্ধে আমরা হাজার হাজার টাকা জলের মত ব্যয় করিয়া ফেলিব। ইহার একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, কিংবা তাহার সুচিকিৎসার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিলেও লোকে তাহা জানিতে পারে না। অথচ মরিবার পরে ঘটা করিয়া তাহার শ্রাদ্ধ করিলে দশ জনে তাহা জানিতে পারে, দেশ বিদেশে তাহার নাম পড়িয়া যায়, যে নিজকে নিজে গৌরবান্বিত মনে করে। সেই দশ জন লোকের কাছে অযথা নাম কিনিবার প্রলোভনটা যে আমাদের কত অনর্থের মূল, তাহা এই হতভাগ্য দেশের লোক বোঝে না। সেই অযথা নাম কিনিতে যাইয়া যে কত অর্থ অপব্যয় হয়, তাহা লোকে বুঝিতে চেষ্টাও করে না। সেইপ্রকার অযথা টাকা ব্যয় না করিয়া যদি সেই টাকা প্রকৃত সৎকার্য্যে ব্যয় হইত, তবে আমাদের দেশে অনেক হিতকর কার্য্য সম্পাদন হইত। যে দেশের

লোকেরা প্রকৃত মানুষ তাহারা অর্থ ব্যয় করে তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তা করিয়া, তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থকতা দেখিয়া। আমরা অর্থ ব্যয় করি আপাততঃ মনস্তুষ্টির জন্য, শুধু একটা ফাঁকা নাম কিনিবার জন্য।

নিশিকান্তের এবম্প্রকার মনোভাব ভুবনমোহিনী জানিতে পারিয়া ঠিক করিল, কিছু টাকা লুকাইয়া রাখিতে হইবে, নচেৎ এই সমস্ত টাকা স্বামীর হাতে পড়িলে সে যেমন করিয়া হউক তাহা অপব্যয় করিয়া ফেলিবে। তৎপরে তাহাদের ভবিষ্যৎ উপায় কি হইবে? এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভুবনমোহিনী হিসাব করিয়া দেখিল, শ্বশুরঠাকুর নগদ তিন হাজার দশ টাকা ও লোকের নিকট দেড় হাজার টাকা লাগাইয়া গিয়াছেন। সেই টাকা হইতে সে হাজার টাকা অন্য স্থানে সরাইয়া রাখিবার মনস্থ করিল। কিন্তু কোথায় সে সেই টাকা রাখিবে। একমাত্র রামচন্দ্র ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তির সহিত তাহার পরিচয় নাই। রামচন্দ্র গরীব লোক, সে যদি নিজে তাহা আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। আবার তখনই তাহার মনে হইল, না, এ চিন্তা তাহার আনাও অন্যায়। গরীব হইলেও সৎ হইতে পারে, অবস্থাপন্ন লোক হইলেও অসৎ হইতে পারে। রামচন্দ্র যে তাহার ধর্ম্ম ভাই, রামচন্দ্রকে সে বিশ্বাস করিতে পারে, তাহার স্বামীকে ত সে বিশ্বাস করিতে পারে না। মনে মনে এইপ্রকার আলোচনা করিয়া ভুবনমোহিনী রামচন্দ্র ও তাহার মাতাকে ডাকাইয়া এই সব বিষয় জ্ঞাপন করিল। তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র বলিল,—দিদি, এবিষয়ে আমি রাজি হ'তে পারলাম না,—এতে আমার দুটী আপত্তি আছে।

ভুবনমোহিনী,—কি কি?

প্রথম আপত্তি, আমি নিজে গরীব, এত টাকা দেখে আমি নিজেই যদি কোনও প্রলোভনে পড়ে যাই! অর্থই এ পৃথিবীতে যত অনর্থের মূল।

খেটেখুটে খাই, আছি ভাল ; এত টাকা দেখে আমার লোভ জন্মিতে পারে। আর দ্বিতীয় আপত্তি, আমার ঘরে এতগুলি টাকা রাখাও যুক্তি সঙ্গত নয়, চোর ডাকাতের ভয়ও ত আছে।

রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া ভুবনমোহিনী মোহিত হইয়া গেল। কি সাধুতা! রামচন্দ্র সম্পূর্ণ নির্ধন, অথচ তাহার কত সততা! ভুবনমোহিনী বলিল, "ভাই, তোমার প্রথম আপত্তিটা কিছুই নয়, দ্বিতীয় আপত্তিটা ভাব্‌বার বিষয় বটে। কিন্তু এদিকে ত সব দেখ্‌ছ ; এখন কি করে কিছু রক্ষা করি?" রামচন্দ্র কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "দিদি, এক কাজ কর ; আমার কাছে আপাততঃ এ টাকা রেখে দাও, আমি শুনেছি পোষ্টাফিসে নাকি টাকা রাখা যায়। যে, সেই নাকি রাখ্‌তে পারে। সহরে আমার পরিচিত এক উকিলবাবু আছেন,—ভোলানাথবাবু তার নাম,—তিনি খুব ভাল লোক। তার সঙ্গে পরামর্শ করে আসি তিনি কি বলেন। তিনি যা বলবেন সেই রকমই কাজ করা যাবে।"

ভুবনমোহিনী তাহাই যুক্তিসঙ্গত উপদেশ বলিয়া মনে করিল। সেই দণ্ডেই ভুবনমোহিনী একখানা কাপড়ে বাঁধিয়া এক হাজার টাকা রামচন্দ্রের হাতে আনিয়া দিল। রামচন্দ্র বাড়ীতে যাইয়া সেই টাকা তাহার একটি সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া দিল। সেই দিনই সে তাহার উকিলবাবুর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য সহরে রওনা হইয়া গেল। যাইবার সময় তাহার মাতাকে বলিয়া গেল, অদ্য রাত্রিতে যেন সে আর নিদ্রা যায় না, আজ তাহারা পরের ধনের রক্ষক। নিজের ধন অপহৃত হইলে শুধু পরিতাপের বিষয় মাত্র, কিন্তু অপরের ধন অপহৃত হইলে শুধু পরিতাপের বিষয় নয়, উপরন্তু লজ্জা ও বিপদের বিষয় বটে ; কারণ লোকে চুরি হওয়া বিশ্বাস করিবে না, তাহাদিগকেই চোর বলিয়া সন্দেহ করিবে, তাহারা চুরি না করিয়াও চোর অপবাদ ক্রয় করিবে।

রামচন্দ্র সহরে যাইয়া উকিল বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া তৎপর দিবসই ফিরিয়া আসিয়া ভুবনমোহিনীকে জানাইল, "ভোলানাথ বাবু পোষ্টাফিসেই টাকা রেখে দিতে বলেছেন।" ভুবনমোহিনীর লুক্কায়িত এক হাজার টাকা রামচন্দ্র ভোলানাথ বাবুর নিকট তৎপর দিবসই নিয়া গেল। ভোলানাথ বাবু সেই টাকা হইতে পাঁচ শত টাকা ভুবনমোহিনীর নামে ও পাঁচ শত টাকা খোকার নামে পোষ্টাফিসে রাখিয়া দিলেন। সেবিন্সবেঙ্কে ঐ টাকা রাখিয়া দিয়া বহি দুইখানা রামচন্দ্রের হাতে দিলেন, রামচন্দ্র বহি দুইখানা ভুবনমোহিনীর হাতে আনিয়া দিল।

ভুবনমোহিনী রামচন্দ্রকে বলিল,—এই বই দুইখানা আপাততঃ তোমার ওখানেই রেখে দাও, আমার এখানে থাকলে এই বই বেরিয়ে যাবে। আমার বাক্স ত দিনের মধ্যে একশ বার খোলা হবে,—আমি কোথাও কিছু রেখে দিয়েছি কিনা দেখা হবে, এই বই আমার কাছে থাকলে এ টাকা আমি লুকিয়ে রাখ্‌তে পারব না।

রামচন্দ্র তাহাতে কোনও আপত্তি করিল না।

নিশিকান্ত দুই তিন দিন পর্য্যন্ত কেবল ফর্দ্দই ধরিতে লাগিল, শ্রাদ্ধের কি কি আয়োজন করিতে হইবে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বেশ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া গ্রামে খ্যাতি ছিল। এই কয় দিন নিশিকান্তের বাড়ীতে লোকজনের বেশ সমাগম হইতে লাগিল। নানা লোকে আসিয়া নিশিকান্তকে নানাপ্রকার পরামর্শ দিতে লাগিল। বহুলোকের সহিত পরামর্শ করিয়া ফর্দ্দ অনেক কাটা ছিড়া করিয়া, অবশেষে পিতার শ্রাদ্ধ কার্য্যের জন্য নিশিকান্ত এক বিরাট ফর্দ্দ প্রস্তুত করিল।

শ্রাদ্ধের বিরাট বন্দোবস্ত করিয়া নিশিকান্ত ভুবনমোহিনীর নিকট আসিয়া বলিল,—সিন্দুকের চাবি দেও দেখি; দেখি বাবা কি রেখে গেছেন।'

ভুবনমোহিনী বিনা আপত্তিতে সিন্দুকের চাবী স্বামীর হাতে দিল। নিশিকান্ত সিন্দুক খুলিয়া দেখিল, নগদ দুই হাজার দশ টাকা, আর দেড় হাজার টাকার তমঃস্থক পিতা রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা দেখিয়া তাহার মুখ বড়ই অপ্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। সে মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল,—এতেই এত ! ভারি ত রেখে গেছেন ! আবার ফষ্টি কর্‌তেন, খুব রেখে গেলাম, এতেই তোর জীবন একরকম্ চলবে। বেটার কথার শ্রী দেখ ? এখন বলত আমি কি করি !

ভুবনমোহিনী তাহার স্বামীর কথা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল ! দেবতুল্য পিতা, তাঁহার প্রতি একি অবজ্ঞা ! তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার কর্ণ যেন অপবিত্র হইয়া গেল ! সে স্বামীর কথায় প্রতিবাদ না করিয়া পারিল না। সে বলিল,—বল্‌ছ কি ? কার প্রতি কি বল্‌ছ হিসাব করে দেখ্‌ছ না ?

নিশিকান্ত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—খুব হিসাব করে দেখেছি, তোমার আর পণ্ডিতি কর্‌তে হবে না। এখন এ কয়টা টাকা দিয়ে আমি কি করি? শ্রাদ্ধের যা ফর্দ্দ ধরা হয়েছে, এই কয়টা টাকা দিয়ে ত তার অর্দ্ধেক খরচও কুলাবে না। লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কি করে ? লোকের কাছে বেটা আবার রাষ্ট্র করে গেছে, কত টাকাই আমি রেখে গেলাম, রাখ্‌বার বেলায় অষ্টরম্ভা।

ভুবনমোহিনী বলিল,—তুমি কি বল্‌ছ ? তোমার মাথা খারাপ হ'ল নাকি ? দেবতুল্য পিতার উদ্দেশে কি বল্‌ছ, তোমার জিহ্বা ত খসে পড়বে ?

নিশিকান্ত এবার আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিল না। সে একটি জুতা হাতে করিয়া ভুবনমোহিনীকে দেখাইয়া বলিল,—হারামজাদি, মুখ সাম্‌লে কথা কস্, জুতিয়ে মুখ সমান করে দেবো ! কাকে কি বল্‌ছিস

দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না? আমি আছি আমার চিন্তা নিয়ে, উনি আসেন ধর্ম্মোপদেশ দিতে।

দেবতুল্য শ্বশুরের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়া ভুবনমোহিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল, সে এইরূপ অবজ্ঞা কিছুতেই সহ্য করিবে না। সে বলিল,—মার্‌তে হয় মার, কিন্তু আমার সাম্‌নে দেবতুল্য পিতার প্রতি এ অপমান সূচক কথা বল্‌তে পারবে না। তুমি বারবারই বল্‌ছ, তিনি ফণ্টি করে গেছেন, খুব টাকা রেখে গেলাম; এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তিনি স্বল্পভাষী, মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি কোন দিনই লোকের নিকট প্রকাশ করেন নাই যে, আমি অনেক টাকা রেখে গেলাম। আর বল্‌তে গেলে, মন্দই বা তিনি রেখে গেছেন কি? চাকরিই বা কত বড় করতেন? জেনো, তিনি যে এই টাকা রেখে গেছেন,—তাঁর নিজের কোনও প্রকারের সুখ সাচ্ছন্দ্যের দিকে না চেয়ে, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, শরীরের রক্ত জল করে তোমার সুখের জন্য। তুমি যদি হিসাব করে চল, তবে এই টাকা দিয়ে তুমি জীবন কাটাতে পার বৈ কি?

ভুবনমোহিনীর আজ মুখ খুলিয়া গিয়াছিল, সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল। তাহাকে ধমক দিয়া নিশিকান্ত বলিল,—নেও পণ্ডিত মশাই, এখন তোমার বক্তৃতাটা রাখ। আমি আছি আমার চিন্তা নিয়ে, উনি আছেন ওর বক্তৃতা নিয়ে। বক্তৃতা কর্‌বার ইচ্ছা থাকে, শ্রাদ্ধের আসরে একটা দোল মঞ্চ বেঁধে দেবো, লোকজনও অনেক আসবে, সেই দোল মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে সবার কাছে খুব লম্বা গলায় সাধ মিটিয়ে বক্তৃতা কোরো।

ভুবনমোহিনী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল,—শ্রাদ্ধে কত টাকা ব্যয় করতে চাও?

নিশিকান্ত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—আরে পোড়া কপাল!

চাইলেই বা তা পাই কই? যা আয়োজন করবার ইচ্ছা ছিল, তাতে ত অন্ততঃ পক্ষে চার পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হতো।

বল কি? অত টাকা ব্যয় করলে আমাদের ভবিষ্যৎ উপায় কি হবে?

ভবিষ্যতের জন্য ত আমিই আছি। বাবা টাকা রেখে গেছে তার সদ্গতির জন্য, তার সদ্গতির জন্য তা ব্যয় করব না?

ভুবনমোহিনী দৃঢ়স্বরে বলিল,—তিনি টাকা রেখে গেছেন তা অপব্যয় করবার জন্য নয়,—তিনি টাকা রেখে গেছেন তার সদ্ব্যবহারের জন্য। অভক্তি করে দশ হাজার টাকা ব্যয় করলেও তাঁর সদ্গতি হবে না, আর ভক্তিভরে দু টাকা ব্যয় করলেও তাঁর সদ্গতি হবে। নিজের ভবিষ্যৎ আর পুত্রের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে যা করতে হয় কোরো।

কিছুক্ষণ বাদে আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তুমি বলছ, ভবিষ্যতের জন্য ত তুমিই আছ! তুমি যদি তোমার মত থাক্‌তে, তবে কি আমার এত কথা বল্‌তে হতো?

ভুবনমোহিনী আজ বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইতেছিল মাত্র, কিন্তু শিক্ষার অভাবে সেই ভাব অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এই কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়াই মনে করিতে লাগিল, আজ স্বামীকে বড় রূঢ় কথাই সে বলিয়া ফেলিয়াছে। পিতার ধনে পুত্রেরই একমাত্র অধিকার, সে তাহা যথেচ্ছা ব্যয় করিতে পারে। তদ্বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করিবার কে? তাহার যেন তাহার উক্তি মনে পড়িয়া আত্মগ্লানি হইতে লাগিল। আবার সেই মুহূর্ত্তেই তাহার পুত্রের কথা স্মরণ পথে উদিত হওয়ায়, সেই স্মৃতি যেন আবার তাহার মনে এক নূতন বল সঞ্চার করিয়া দিল। তাহার পুত্রের প্রতিও ত তাহার একটা কর্ত্তব্য আছে? তাহার পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গল যে এক প্রকার তাহার হস্তেই ন্যস্ত। সুতরাং স্বামীর অপব্যয় সম্বন্ধে তাহার প্রতিবাদ না

করিলে চলিবে কেন? আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার ভাব তাহার মনে জাগরিত হইল। সেই মুহূর্ত্তে নিশিকান্ত তাহাকে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল,—"তোমার এ জ্যাঠামি আমি সহ্য করতে পারি না। আমার কাজে তোমার আর বুদ্ধি খরচ করতে হবে না। আমার উপর যদি ভবিষ্যতে তোমার নির্ভর করতে ইচ্ছা না থাকে, বয়সও আছে, সৌন্দর্য্যও আছে, তোমার পন্থা তুমি নিজেই বের করে নিও। দু অ: র পড়ে লম্বা লম্বা কথা শিখেছেন। মেয়েলোকদের লেখাপড়া শেখানই অন্যায়। যাও না নরেন বাবুর কাছে, সেখানেই বেশ টাকা পাবে।"

নিশিকান্তের কথা শুনিয়া ভুবনমোহিনীর সেই স্থানে আর মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইতে ইচ্ছা রহিল না। স্বামীর মুখ হইতে যে এরূপ কুৎসিত কথা বাহির হইতে পারে, তাহা তাহার ধারণাতেই ছিল না। স্বামী এতদূর অধঃপতনে গিয়াছে! স্বামীর মুখ হইতে এ কথা শুনা অপেক্ষা তাহার মৃত্যুও যে শ্রেয়ঃ ছিল। সে আর কিছু না বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

(৯)

মহাসমারোহে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। নগদ দুই হাজার টাকা ছিল, সেই টাকা দিয়া, খাতকদের হইতে হাজার খানেক টাকা আদায় করিয়া এই শ্রাদ্ধ কার্য্য নিশিকান্ত বেশ বড় রকমেই সমাধা করিল। চতুর্দ্দিকে নিশিকান্তের নাম পড়িয়া গেল,—পুত্রের উপযুক্ত কাজই সে করিয়াছে।

পিতার শ্রাদ্ধের কতকদিন পর হইতে নিশিকান্ত বাড়ীতে থাকিতে লাগিল। কিন্তু অমিতাচারের পরিসীমা রহিল না। এখন ভুবনমোহিনীর সমক্ষেই বাড়ীতে বসিয়া সে মদ্য পান করিতে লাগিল, ভুবনমোহিনীকে সে মানুষের মধ্যেই গণ্য করিত না। ভুবনমোহিনী সে বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে সে তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিত না। পূর্ব্বে পিতার সমক্ষে মদ্যপান চলিত না; এখন ত আর সে অন্তরায় নাই? সে সুরাদেবীর সেবায় গা ঢালিয়া দিল, আবার সময় সময় নরেন্দ্রনারায়ণের ওখানে যাইয়াও আড্ডা দিয়া আসে।

পিতার ত্যাজ্য ধন যতদিন ছিল, ততদিন একরকম সুখেই অতিবাহিত হইল। এ টাকা নিশিকান্তের পক্ষে কতদিন? মাস দুয়েক পরেই সে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িল। নিশিকান্তের আর খরচ চলে না। তখন অনোন্যোপায় হইয়া সে নরেন্দ্রনারায়ণের শরণাপন্ন হইল। নরেন্দ্র-নারায়ণ ত ইহাই চায়। নিশিকান্তের স্ত্রীর উপর তাহার কুবাসনা সর্ব্বদাই জাগরিত ছিল।

যথন শ্বশুরঠাকুরের ত্যাজ্য ধন সব নিঃশেষ হইয়া গেল, তখনও ভুবনমোহিনী তাহার লুক্কায়িত টাকার কথা স্বামীর নিকট প্রকাশ করিল না; কারণ স্বামী জানিলে তাহা খরচ করিতে কয়দিন লাগিবে? উপবাসে কষ্ট পাইতে থাকিলেও ভুবনমোহিনী এই টাকার কথা তাহার স্বামীর নিকট প্রকাশ করিতে সাহস করিল না। এই টাকার উপরই যে তাহার পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। স্বামী যতদিন বাঁচিয়া আছেন, আহারের ব্যবস্থা করিবেনই।

নিশিকান্ত নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট কার্য্য প্রার্থী হওয়ায় নরেন্দ্রনারায়ণ মনে করিল, এই সুযোগে যদি নিশিকান্তকে বাড়ী হইতে দূরে সরান যায়। ফরিদপুরে নরেন্দ্রনারায়ণের জমিদারি ছিল, সেই জেলার অধীনস্থ এক ডিহিতে নায়েবি কার্য্যে নিশিকান্তকে নরেন্দ্রনারায়ণ নিযুক্ত করিল।

নিশিকান্ত যখন একবারে নির্ধন অবস্থায় পতিত হইল, তখন ভুবনমোহিনীর চরিত্র পরিচয় সে একটু একটু উপলব্ধি করিতে পারিতেছিল। সে যেন দিন দিন ভুবনমোহিনীর উপর কতকটা আকৃষ্ট হইতেছিল। অর্থাভাবে আর ক্রয় করিয়া সদাসর্ব্বদা মদ্য পান করা চলে না। আহারের চিন্তা সর্ব্বদাই তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত, সেই জন্য সে আর নরেন্দ্রনারায়ণের নিকটে যাইয়াও এখন মদ্য পান করিত না। নিশিকান্ত যখন দেখিত, ঘরে খাওয়ার বিশেষ সংস্থান নাই, কিন্তু তাহার মধ্যেই তাহার স্ত্রী বেশ গুছাইয়া পরিপাটি রকমে তাহাকে ভোজন করাইবার আয়োজন করিয়াছে, আবার যখন দেখিত, ভুবনমোহিনী কোনও অবস্থাকেই ক্লেশকর মনে না করিয়া অম্লান বদনে তাহার নিজের মনে কাজ করিতেছে, আবার যখন দেখিত, সে যেন স্বামীর এবং পুত্রের সুখ বিধানের জন্য তাহার যাবতীয় শক্তি নিয়োগ করিয়া অতি দারিদ্র্য অবস্থাকেই হাসি মুখে বরণ করিয়া নিয়াছে, আবার যখন

দেখিত, তাহার শত গ্লানি, অনাদর সহ্য করিয়াও ভুবনমোহিনীর স্বামীর উপর ভক্তি কিংবা সমাদরের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না, আবার যখন দেখিত, ঘরে সচ্ছন্দ আহার নাই, স্বামীকে খাওয়াইয়া সে অম্লান বদনে উপবাস করিয়াও দিন কাটায়,—তখন প্রকৃত পক্ষেই তাহার মনে ভুবনমোহিনীর প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত হইত।

ছেলেটিকে নিশিকান্তের বড়ই ভাল লাগিত। সে এখন প্রায় ছয় মাস বয়স্ক হইয়াছে। সে নিশিকান্তের নিকট থাকিতে বড়ই ভালবাসিত। নিশিকান্তকে দেখিলেই তাহার মুখে একটা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিত। সে যখন নিশিকান্তের কোলে চড়িয়া—আঁ, উঁ, দুই একটি শব্দ উচ্চারণ করিত, তখন নিশিকান্তের প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ হইত। তাহা না হইবে কেন? এই ভাব কি দূর করা যায়? এই ভাব যে স্বভাবের নিয়মাধীন।

কিন্তু আবার যখন নিশিকান্ত মদ্য পানে নিরত থাকিত, তখন কোথায় স্ত্রী, কোথায় পুত্র,—তখন সব দূরে সরিয়া পড়িত, মদ্য পানই জীবনের একমাত্র প্রিয় বস্তু, একমাত্র শান্তির আধার বলিয়া মনে করিত। এমনি ভাবে দিন কাটাইয়া যখন দেখিল আর সংসার চলে না, উপবাস করিয়াই দিন কাটাইতে হয়, তখন একটু অনিচ্ছা স্বত্বেই নিশিকান্ত বাড়ী ছাড়িয়া ফরিদপুরে কার্য্যস্থলে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল; নচেৎ সকলের যে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

ভুবনমোহিনীর একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, স্বামীকে অত দূর দেশে যাইতে নিষেধ করে, টাকার কথা স্বামীর নিকট প্রকাশ করিয়া সেই অর্থ দ্বারা সংসার কিছু দিন চালায়। আবার তখনই তাহার মনে হইল, স্বামী যে প্রকার মদ্যপায়ী, যে প্রকার অমিতব্যয়ী, এই টাকায় কয়দিন চলিবে? কপালে যে ইহা হইতেও অধিক দুর্দ্দিন আসিবে না কে জানে?

স্বামীকে বিদেশে পাঠাইতে যেন তাহার মন কিছুতেই রাজি হইতে ছিল না। সেও যে এ কয় দিনে স্বামীর একটু ভালবাসা পাইয়াছে! সেও বুঝিতে পারিল, স্বামী বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে একটু অনিচ্ছুক, তখন এই অবস্থায় সে কোন্ প্রাণে স্বামীকে বিদেশে যাইতে দিবে? সে এ বিষয়ে বহু চিন্তা করিল, ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, সে স্বামীকে বিদেশে যাইতে দেওয়াই সঙ্গত মনে করিল। মনে মনে বলিল, কাহারও স্বামী কি বিদেশে চাকরি করিতে যায় না? আর চাকরির স্থলত এমন দূর দেশেও নয়, যাইতে মাত্র দুই দিন লাগে; কত লোক ত কত দূর দেশে যাইয়াও চাকরি করে, পরিবার বাড়ীতে থাকে। একবার তাহার মনে হইল, স্বামী চলিয়া গেলে সে একা কি করিয়া থাকিবে?—আবার তখনই মনে হইল, ভয়ই বা কি? রামচন্দ্র, তাহার মাতা, ভ্রাতা থাকিতে তাহার ভয় কি, তাহারা ত তাহার নিতান্ত আপনার জন। আবার মনে করিল, তাহার স্বামার এখন বিদেশে যাওয়াটা আর এক কারণেও মঙ্গলজনক। সেখানে গেলে নরেন্দ্রনারায়ণের সংসর্গ তিনি ত্যাগ করিতে পারিবেন। তাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না। মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া ভুবনমোহিনী নিশিকান্তকে বিদেশে যাইতে আর নিষেধ করিল না। নিয়তি দেবী অলক্ষ্যে থাকিয়া হাসিতে লাগিলেন,—অন্ধ মানব তোমরা বোঝ এক, আমি করি আর।

নিশিকান্ত রামচন্দ্রের পরিবারবর্গকে তাহার স্ত্রী ও পুত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ফরিদপুরে কার্য্যস্থলে রওনা হইয়া গেল।

(১০)

কেদার আজ এক বৎসরের বেশী হইল কলিকাতা আসিয়াছে। পটলডাঙ্গার মেসে আসিবার পরও প্রায় বৎসর খানেক চলিয়া গেল। কেদারনাথ কার্য্যে বহাল হইয়া এখন পঞ্চাশ টাকা মাহিয়ানা পাইতেছে। রমেশ বাবুর সুপারিশেই কেদারনাথের এত পদোন্নতি হইয়াছে। কর্ম্মঠ কর্ম্মচারি বলিয়া তাহার বেশ নাম আছে। রমেশ বাবুর পরিবারের সহিত আলাপ হইবার পর হইতে, ঐ পরিবার-ভুক্ত সকল লোকের সহিতই কেদারনাথের খুব আত্মীয়তা হইয়া গিয়াছে। মাসের মধ্যে দুই চার দিন তাহার রমেশ বাবুর বাড়ীতে আহার করিতে হয়। অনিতা কেদারনাথকে পাইলে সহজে ছাড়িতে চাহে না। কেদারনাথ মাঝে মাঝে অনিতাকে নিয়া গড়ের মাঠ হইতে ট্রামে চড়িয়া বেড়াইয়া আসে। রমেশ বাবু এবং তাহার স্ত্রী কেদারনাথকে পুত্রের মতই গণ্য করিতেন; কেদারনাথের চাল চলন দেখিলেও মনে হইত, সে এই বাড়ীরই ছেলে। অনিতার বয়স দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। :সম্ভবতঃ আমাদের বর্ত্তমান সমাজে মেয়ের ঐ বয়স হইলেই তাহাকে বিবাহ দেওয়ার চিন্তা পিতামাতার মনে উদয় হইতে থাকে, এবং তাহাতে তাহাদের সুনিদ্রার এবং আহারেরও ব্যাঘাত ঘটে। সেই সময় হইতেই মেয়ের রূপ, গুণের ও ভাগ্যের পরীক্ষা হইতে থাকে; সুতরাং মেয়ের চলাফিরা সম্বন্ধেও পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলি বাহির হইয়া তাহার স্বাধীনতার খর্ব্ব হইয়া যায়। কিন্তু রমেশ বাবু এবং তাহার স্ত্রীর এবিষয়ে একটু দোষ আছে। তাহাদের

চক্ষে অনিতা এখনও নিতান্ত বালিকা,—তাহার বিবাহের কথা তাহাদের মনে আদৌ ঢোকে নাই। তাহারা মনে করেন, অনিতা ছেলে মানুষ, হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবে বৈ কি ? এতে লজ্জা বা সংকোচ করিবার ত কিছুই নাই, উপরন্তু বালকবালিকা ছুটাছুটি করিয়া খেলিলে, মুক্ত বায়ু সেবন করিলে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। অনিতা বেথুন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে, বেশ মেধাবী ছাত্রী বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে ; তবে কিছু চঞ্চলা, তাড়াতাড়ি অঙ্ক কষিতে প্রায়ই ভুল করিয়া ফেলে। কেদারনাথের কাছে মাঝে মাঝে সে পড়া বুঝিয়া নিত : দিন দিনই কেদারনাথের সহিত রমেশ বাবুর পরিবারবর্গের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কেদারের মাহিয়ানা বৃদ্ধি হওয়ার পর হইতেই কেদারের মনে হইতেছিল, মাতাকে কলিকাতায় আনিয়া ছোট খাট রকমের একখানা বাসা করিয়া থাকিলে হয়। তাহার মাতা একা পল্লীপ্রান্তে দিন অতিবাহিত করিতেছেন। চাকরির পর হইতে এ পর্য্যন্ত কেদারনাথ একদিনের জন্যও ছুটি নেয় নাই ; সুতরাং কলিকাতা আসা অবধি তাহার আর মাতৃদর্শন হয় নাই। মাতার চরণ দর্শন করিবার জন্য তাহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল—মাতাকে ছাড়িয়া থাকা তাহার নিকট ক্রমশঃই অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। সে যেন মাতার অদর্শন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। অবশেষে একদিন অতি সঙ্কুচিত চিত্তে সে রমেশ বাবুর নিকট বলিল,—আজ এক বৎসরের অনেক বেশী হ'ল আমি মাকে ছেড়ে এসেছি ; মাকে না দেখে আর থাকৃতে পাচ্ছি না; মার কথা মনে পড়লে আমার রাত্রিতে ঘুম হয় না। আমাকে দিন কয়েকের ছুটি দিন না ? মাকে একবার দেখে আসি ?

রমেশ বাবু হাসিয়া বলিলেন,—তুমি ত একেবারে ছেলে মানুষ নও এখন, মার জন্য এত কাতর হলে চল্‌বে কেন? মোটে সংসার-ক্ষেত্রে

প্রবেশ করেছ. আত্মীয় স্বজনের জন্য কত প্রাণ কাঁদবে, কিন্তু ব্যথিত চিত্ত নিয়েই জীবন কাটাতে হবে। তুমি কাজে মাত্র নূতন বহাল হয়েছ, সেই ডিপার্টমেণ্টের কাজও এখন পর্য্যন্ত ভাল শিখ নাই। জান ত বাবা, তোমার আফিসের কত জনকে ডিঙ্গিয়ে তুমি এ কাজটি পেয়েছ? এখন তুমি ছুটী চাইলে একটু গোলমাল হতে পারে। আর কয়েকটা মাস যাক্, তারপর না হয় ছুটী নিও। আর তোমার মা ত ভালই আছেন। পুরুষ মানুষ তুমি, এত ব্যাকুল হবে কেন?

কেদার রমেশ বাবুর কথা শুনিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, —মাকে দেখবার জন্য কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে!

ইহার কতক দিবস পরেই কেদারের নিকট এমন এক সংবাদ আসিল, যাহাতে তাহার মাতৃদর্শন ঘটাইয়া দিল; কিন্তু তাহা বড়ই হৃদয়-বিদারক। ইহার কতক দিবস পরেই কেদারনাথ টেলিগ্রাম পাইল, তাহার বাড়ী আগুণে পুড়িয়া গিয়াছে, মাতা সাংঘাতিক পীড়িতা। কেদারনাথ সেই টেলিগ্রাম খানা রমেশ বাবুকে দেখাইল। রমেশ বাবু সেই টেলিগ্রাম খানা পড়িয়া বলিলেন, "তা হলে তোমার এখনই বাড়ী যাওয়া দরকার। তুমি ছুটীর দরখাস্ত কর, আমি বড় সাহেবের কাছে তোমার ছুটীর জন্য লিখে দিব। তুমি ছুটী পাবে নিশ্চয়ই।"

রমেশ বাবুর কথা মত কেদারনাথ ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিলে, রমেশ বাবু সেই দরখাস্ত বড় সাহেবের নিকট সুপারিশ করিয়া দিলেন। কেদারনাথ পনর দিবসের ছুটী পাইয়া সেই দিবসই রাত্রির গাড়ীতে বাড়ীতে রওনা হইয়া গেল।

কেদারনাথের বাড়ীর পার্শ্বেই এক গয়লার বাড়ী। সন্ধ্যার পরে সেই বাড়ীর গরুর ঘরে আগুণ দিয়া ধোঁয়া দিতে অসাবধানতা বশতঃ সেই ঘরে আগুণ লাগিয়া যায়, কেহই সেই আগুণ পূর্ব্বে লক্ষ্য করে না।

সেই আগুণ বিস্তৃত হইয়া গয়লার বাড়ী ধ্বংশ করিয়া কেদারের বাড়ীতে লাগে। কেদারের বাড়ীতে কেদারের মাতা ভিন্ন আর তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। কেদারের বাড়ীর গৃহে আগুণ লাগিলে কেদারের মাতা গৃহ হইতে বাহিরে চলিয়া আসেন; কিন্তু কোনও লোক সাহায্য করিতে আসিবার পূর্ব্বেই ঘরে এমন ভাবে আগুণ লাগিয়া যায় যে, ঘরের জিনিষ পত্র যাহা ছিল, তাহা বাহির করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। অগ্নিদেবতা তাহার জিহ্বা লোলহান করিয়া গৃহগুলি ভস্মীভূত করিতে লাগিল। কেদারের পিতার একখানা ফটোগ্রাফ ছিল, তাহা তাহাদের শুইবার ঘরে লটকান থাকিত। যখন সেই ঘর জ্বলিতে আরম্ভ করিল, তখন উপস্থিত দুই এক জন লোককে কেদারের মাতা অনুরোধ করিলেন, তাহারা যদি কোনও প্রকারে সেই ফটোগ্রাফ খানা বাহির করিয়া আনিতে পারে। কিন্তু নিজের জীবন বিপদগ্রস্থ করিয়া কেহই কেদারের মাতার অনুরোধ রক্ষা করিতে সাহস করিল না। কেহ কেহ কেদারের মাতার অনুরোধের বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদও করিল—এ কি পাগলের কাণ্ড! এখন ঘরে ঢুকিলে যে মৃত্যু নিশ্চয়। কেদারের মাতা সেই ফটোগ্রাফ খানার পদপ্রান্তে রোজ ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিতেন; তিনি তাহা নিজের জীবন হইতেও প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন। যখন তিনি দেখিলেন, আর কেহই সেই ফটোগ্রাফ খানা নিয়া অসিবার জন্য অগ্রসর হইল না, তখন তিনি নিজেই সেই প্রজ্জ্বলিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন অগ্নি সেই গৃহের চতুর্দ্দিকেই প্রায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কেদারের মাতা গৃহে প্রবেশ করিয়া খুটি হইতে এক টান দিয়া ফটোগ্রাফ খানা খুলিয়া বুকের মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিলেন; কিন্তু তখন বাহির হইবার পথ প্রায় এক রকম বন্ধ। কেদারের মাতা দেখিলেন, গৃহের পশ্চিমের দরজার নিকট তখনও আগুণ আসে নাই,

তাহাকে ফটোগ্রাফ খানা বাঁচাইতে হইবে, তিনি সেই দরজা দিয়া বাহিরের দিকে ছুটিলেন। যেই সেই দরজা দিয়া বাহির হইবেন, এক খণ্ড প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠ আসিয়া তাহার পৃষ্ঠ দেশে পতিত হইল; অমনি তথাকার উপস্থিত লোক সকল কোলাহল করিয়া উঠিল; একজন লোক আসিয়া কেদারের মাতাকে টান দিয়া বাহির করিয়া আনিল। কেদারের মাতা হাত বাড়াইয়া ফটোগ্রাফ খানা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "আগে এইটে যত্নে রেখে দাও, তারপর আমাকে দেখো।" এই কথা বলিয়াই কেদারের মাতা অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সকলে কেদারের মাতার পতিভক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া গেল।

সেই জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড পৃষ্ঠদেশে পতিত হওয়ায় কেদারের মাতার পৃষ্ঠে প্রকাণ্ড ঘা হইয়া গেল। কেদারের মাতাকে তাহাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিয়া গেল। সেই দিনই কেদারের নিকট তাহার মাতার অবস্থা জানাইয়া টেলিগ্রাম করা হইল।

কেদার আসিয়া মাতার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার মাতা সম্পূর্ণ চলৎশক্তি হীনা, পৃষ্ঠদেশের ঘাঁর যন্ত্রণায় সর্ব্বদাই কষ্ট পাইতেছেন। কেদার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—মা, শেষকালে তোমার এ অবস্থাও দেখ্‌তে হলো! জানি না তোমাকে এ যাত্রা রক্ষা কর্‌তে পারব কিনা।

কেদারের মাতা অতি কষ্টে বলিলেন,—বাবা, আর বেঁচে থেকে লাভ কি? মালতীর ত বিয়েই দিয়েছি, তুই পুরুষ মানুষ, সংসারে এক রকম চল্‌তে পারবি। আমি যে রত্ন উদ্ধার কর্‌তে যেয়ে এ আঘাত পেয়েছি, সেই কথা মনে পড়লে আমার কোনও যাতনাই বোধ হয় না। আমি যে তাঁর ছবি দিনরাত দেখতে পারবো, সেই আনন্দেই আমার শারীরিক কষ্ট, কষ্ট বলে মনে হয় না।

কেদার বাড়ীতে থাকিয়া মাতার সেবা করিতে লাগিল। ছুটি ফুরাইয়া

আসিলে, কেদার বলিল,—মা, আর ত তোমাকে এ অবস্থায় বাড়ীতে ফেলে যেতে পারি না। যে কয়দিন তুমি বেঁচে আছ, তোমার চরণ সেবা হতে আর আমি বঞ্চিত থাকতে পারব না। তোমাকে আমি এবার কলকাতায় নিয়ে যাব। সেখানে একখানা ছোট বাসা কর্‌ব, মায়ে ছেলে থাকব। কেমন মা, তুমি কি বল?

কেদারের মাতা বলিলেন,—চল্‌ বাবা, আমার তাতে কোনও আপত্তি নাই। যে কয়দিন বেঁচে থাকি, তোর মুখখানাই দেখে যাই। আমার দিন ত সম্ভব ঘনিয়ে এসেছে। গঙ্গার পারে যেতে কার না ইচ্ছা করে?

ইহার দিন দুই তিন পরে কেদার তাহার মাতাকে নিয়া কলিকাতায় তাহার মেসে যাইয়া প্রথমে উপস্থিত হইল। অরুণ বাবুর নিকট কেদার তাহার জন্য ছোট একখানা বাসা দশ টাকা ভাড়ার মধ্যে ঠিক করিবার জন্য ও একটি ঝি কিংবা চাকর তিন চারি টাকার মধ্যে নিযুক্ত করিবার জন্য লিখিয়া দিয়াছিল। অরুণ বাবুও সেই মতে বিডন রো লেইনে একটি বাসা ও একটি ছোট উড়িয়া চাকর কেদারের জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

অরুণ বাবুকে সঙ্গে করিয়া কেদার মাতাকে নিয়া নূতন বাসায় উঠিল। যে বাসা তাহার জন্য ঠিক হইয়াছে তাহাতে মোট আটটি ঘর। সে বাসায় আরও দুই গৃহস্থ বাস করেন। উভয় গৃহস্থই পরিবার নিয়া সেই বাসায় আছেন। তাহারা প্রত্যেক পরিবার দুইখানা করিয়া ঘর দখল করিয়া আছেন, তাহাদের ভাড়া মাসিক সাত টাকা করিয়া দিতে হয়। কেদারের ভাগ্যে নামে চারিটি ঘর পড়িল; কিন্তু তন্মধ্যে একটি ঘর বাসের একেবারে অযোগ্য, আর তিনখানা ঘর ভাল। তাহার মাসিক ভাড়া দশ টাকা দিতে হইবে। বাসায় কল আছে। মোটের উপর বাড়ী খানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

অন্য ভাড়াটিয়াদের মধ্যে এক ভাড়াটিয়ার বধূ অতীব কলহপ্রিয়, সেই বাড়ীতে ঢুকিলেই সেই বাড়ীতে যে লোক আছে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়; কারণ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার গলার ব্যবহারের বড় বিরাম হয় না। সূর্য্যদেব সারাদিন পৃথিবীতে কিরণ বিস্তার করিয়া ক্লান্ত হইয়া যখন সন্ধ্যার সময় বিশ্রাম করিতে চলিয়া যান, সেই গৃহস্থ-বধূও বাটীস্থ সকল লোকের কর্ণ ঝালা পালা করিয়া ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য রাত্রিতে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ঢাক বহুক্ষণ বাজিবার পর তাহা থামিলে যেমন শ্রোতারা হাফ ছাড়িয়া বাঁচে, সেই বাটীস্থ অপর লোকও তখন তেমন আরাম বোধ করে। সকলের চেয়ে বিপদ কলের নিকট গেলে,—অপর গৃহস্থের কলের নিকট যাওয়ার বড় বিশেষ অধিকার থাকিত না। সে মনে করিত কলটি তাহার নিজস্ব সম্পত্তি। প্রথম প্রথম অপর গৃহস্থ এই গৃহস্থ বধূর কার্য্যে ও ব্যবহারে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিত; কিন্তু তাহার সহিত বাক্য-সংগ্রামে কেহই আটিয়া উঠিত না; তাহারা অবশেষে বাক্যরণে পরাস্ত হইয়া নিজ নিজ পথ অবলম্বন করিত। এহেন বাক্য-সমর-বিজয়ী পত্নী যাহার তাহার নাম কেশব বাবু। তিনি একটি সওদাগরি আফিসে চাকরি করিতেন, মাসিক বেতন আশি মুদ্রা। তাহার দুইটি পুত্র, দুইটি কন্যা। ছেলেপিলে সবই প্রায় ছোট, বড় ছেলেটির বয়স আট বৎসর, সে বাসায়ই পড়ে। এ হেন সমর-বিজয়ীর নাম স্বর্ণময়ী। তাহাদের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়। নামের মাহাত্ম্যে হউক কিংবা যে কোনও কারণেই হউক, স্বর্ণময়ীর হৃদয় বলিয়া যে একটি পদার্থ ছিল, তাহা জগতে পাওয়া বড় দুর্লভ। পরের দুঃখে তাহার প্রাণ গলিয়া যাইত। সে অপরের সেবার জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্তও বিপদগ্রস্থ করিতে ত্রুটি করিত না।

অপর গৃহস্থের কর্ত্তার নাম এককড়ি বাবু, তাহার পত্নীর নাম সুহাসিনী। বাস্তবিকই সে সুহাসিনী,—অপরের সহিত কথা কহিতে হইলে সে হাসিয়া বাঁচিত না। কলহ করা কাহাকে বলে সে তাহা জানিত না। কিন্তু হৃদয়টি ছিল ঠিক তাহার বিপরীত; হিংসা, দ্বেষে স্বার্থপরতায় তাহা পরিপূর্ণ। অপরের দুঃখে তাহার প্রাণ গলা দূরে থাকুক, সে যেন তাহাতে সন্তুষ্টই হইত। এককড়ি বাবুর একটি ছেলে, স্কুলে পড়ে। এককড়ি বাবুও এক সওদাগরি আফিসে চাকরি করিতেন। তাহার সহিত তাহার স্ত্রীর প্রায় বনি-বনাওই হইত না। এককড়ি বাবু লোকটি সাদাসিধা অথচ বদ্‌মেজাজি। তাহার আফিসে বড় বেশী পরিশ্রম করিতে হইত। এককড়ি বাবু আফিস হইতে আসিবার পর সুহাসিনী প্রায় সর্ব্বদাই নানা আদবার, অভিমান করিতে থাকিত। এককড়ি বাবু ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া সময় সময় স্ত্রীর উপর রীতিমত বীরত্ব প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করিতেন না। সুহাসিনীর আব্‌দার থাকিত প্রায়ই গহনা নিয়া। এইরূপ মার পিট খাইয়া সে স্বামী হইতে মাঝে মাঝে দুই একখানা গহনা আদায় করিত।

স্বর্ণময়ী একদিন সুহাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—তুমি স্বামীকে এত জ্বালাতন কর কেন? আর এত মারই বা খাও কেমন করে? কর্ত্তা আফিস থেকে খেটে খুটে আসেন তাকে কি এত জ্বালাতন করতে আছে?

সুহাসিনী তদুত্তরে বলিল, "দিদি, মারপিট খেয়েই ত কয়েকখানা গয়না আদায় করেছি, গয়নাও যেমন-তেমন নয়; অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ সাত শ টাকার হবে। আর জ্বালাতনের কথা বল্‌ছ, মিন্‌সেরা জ্বালাতন না করলে কি গয়না দেয়? এমনি করেই ত আদায় করতে হয়। আর মারপিটের কথা বল, তা আমার সয়ে গেছে। ওটা কিছু

নয়।” এককড়ি বাবুর বাড়ী রাণাঘাট অঞ্চলে। তিনি সত্তর টাকা মাহিয়ানাতে চাকরি করেন।

এহেন বাসিন্দাবর্গের সহিত কেদারনাথের বাস্তব্য করিতে হইবে বলিয়া তাহাদের পরিচয় একটু সবিশেষ রূপে দিতে হইল। কেদারনাথ নূতন সংসারি পাতিল। কেদারের মাতা এ কয় দিনে অতি কষ্টে একটু চলা ফিরা করিতে পারিতেন, কিন্তু পিঠের ঘা আর কিছুতেই শুকাইতেছিল না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবার তাহার কালের ডাক পড়িয়াছে।

কেদারনাথ অতি প্রত্যুষে আফিসে চলিয়া যাইত, বেলা দশ ঘটিকার সময় আফিস হইতে আসিয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া দুইটি ছোট কলসি ভরিয়া জল আনিয়া মাতার জন্য ও নিজের জন্য রন্ধন করিত। সেই রন্ধন নিজে মাতা ও ভৃত্য আহার করিত, কিছু ব্যঞ্জন রাত্রির জন্য রাখিয়া দিত, রাত্রিতে শুধু ভাত পাক করিয়া নিত। মাতাকে কোনও দিনই রন্ধন করিতে বা অন্য কোন কাজ করিতে সে দিত না কেদারনাথ আনন্দচিত্তে মাতার সেবা করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিল। কেদার নাথ এ বাসায় আসার মাসেক কাল পরে স্বর্ণময়ী কেদারের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাইল। তাহার মাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও তাহার মাতৃসেবা দেখিয়া স্বর্ণময়ী মুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার প্রাণ কেদারের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাহার পর হইতে সর্ব্বদাই স্বর্ণময়ী কেদার ও তাহার মাতার তত্ত্বাবধান করিত। কেদারকে ছোট ভাইয়ের মত সে জ্ঞান করিতে লাগিল, কেদারও তাহাকে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায়ই মান্য করিত।

৮১

এই বিশ্বসংসারে দেখা যায়, যাহারা নিতান্ত পর তাহারা যেন অল্প দিনের মধ্যেই আপনার হইয়া পড়ে, আর যাহারা নিতান্ত আপনার তাহারা সামান্য কারণেই অল্প দিনের মধ্যেই পর হইয়া যায়। যাহারা পর, তাহারা অপরের শুধু গুণটুকুই লক্ষ্য করে, তাহারা অপরের ছোট খাট দোষের প্রতি লক্ষ্য করে না; আর যাহারা আপনার তাহারা অপরের গুণ হইতে দোষের প্রতিই বেশী লক্ষ্য করে, সেই দোষটাই তাহাদের চক্ষের সমক্ষে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। আবার এমনও দেখা যায়, লোকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্বার্থ অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারে, অকাতরে পরের হিতের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে পারে, কিন্তু সময় সময় সামান্য একটু স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে না; তাহাতে সে এমন সংকীর্ণতা দেখায় যে তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। আবার যাহারা পর, তাহারা যখন নিতান্ত আপনার হয়, তখন অপরের সামান্য দোষ, সামান্য ত্রুটিটা তাহাদের চক্ষের সমক্ষে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, গুণের ভাগটা ক্রমেই তাহাদের লক্ষ্য হইতে অদৃশ্য হইতে থাকে।

রমেশবাবু ও কেদার সম্পর্কেও তাহাই হইল। কেদারকে রমেশ বাবুর পরিজনবর্গ নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কেদারকে তাহারা কিছুদিন না দেখিলেই তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িত; তাহাদিগকে কিছুদিন না দেখিলে কেদারেরও যেন ভাল লাগিত না।

রমেশ বাবুর স্ত্রী একদিন কেদারের নিকট প্রস্তাব করিয়া বসিলেন,—তুমি এখন হতে আমাদের বাসায়ই থাক না কেন? মেসে থাকতে তোমার বড়ই কষ্ট হয়। মেসে কি রীতিমত খাওয়া দাওয়া হয়?

রমেশ বাবুও সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। অনিতা ত সেই প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দেই মগ্ন। অনিতা কেদারের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—কেদারদা, থাক্‌বে তুমি? তা হলে কবে থেকে থাক্‌বে?

কিন্তু কেদার সেই প্রস্তাব অতি নম্রতা সহকারে হাসিতে হাসিতে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল,—আমি ত এক রকম আপনাদের বাসায়ই আছি, এ কলকাতার সহরে আপনাদের চেয়ে বড় আত্মীয় বল্‌তে গেলে আমার আর কেউ নাই।

কেদার, রমেশ বাবুর ও তাহার স্ত্রীর প্রস্তাবে চিন্তা করিয়া দেখিল, তাহারা তাহার কে? পরিচিত এবং হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্র। তাহাদিগ-হইতে এতদূর উপকার এবং সহায়তা পাইবার তাহার অধিকার কি? সে যে উপকার পাইবে, তাহার প্রতিদান ত সে দিতে পারিবে না? এমন অবস্থায় সেই উপকার সে কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে? আবার মনে করিল, নিতান্ত আত্মীয় না হইলে দূরে দূরে থাকাই ভাল, নিকটে আসিলেই সামান্য কারণে মনোমালিন্য ঘটিতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া কেদার রমেশ বাবুর প্রস্তাব হাসিতে হাসিতে প্রত্যাখ্যান করিল।

কেদারের মাতা কলিকাতা আসার কতক দিন পরে, কেদারের মুখে তাহার মাতার আসিবার কথা শুনিয়া রমেশ বাবুর স্ত্রী একদিন কেদারকে বলিলেন,—তোমার মা এসেছেন, তিনি এখনও বুঝি তেমন চলাফিরা করতে পারেন না, আমাদের একদিন তোমাদের বাসায় নিয়ে চল না? তোমার মাকে একবার দেখে আসব।

অনিতা ধরিল,—কেদারদা, চল না একবার তোমাদের বাসায় আমাদের নিয়ে?

অনিতার এখন চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স। যৌবন তাহার পানে উঁকিঝুঁকি মারিয়া আড়নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, কিন্তু অনিতার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে সদা হাস্যময়ী, চঞ্চলা, বাল্যসুলভ চপলতা যেন সে কোনও কালেও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তাহার হাবভাব, তাহার কার্য্য-কলাপ দেখিলে মনে হইত, সে মনে করিত, সে চিরকালই বালিকা থাকিবে, যৌবনের ধার সে কোনও দিনও ধারিবে না; কিংবা সে মনে করিত, যৌবন-তরঙ্গ ত সে আর রোধিতে পারিবে না? তাহা যখন স্বভাবের নিয়মসিদ্ধ, তখন যতদিন পর্য্যন্ত যৌবন-তরঙ্গ রোধিয়া রাখা যায়, তাহাই ভাল। সুতরাং সে এখনও নিতান্ত বালিকা।

অনিতার কথায় কেদার কোনও উত্তর না দিতেই অনিতা কেদারের গলা ধরিয়া বলিল,—চল না দাদা, দেরী কর্‌চ কেন? আমাদের বাসায় দিয়ে আবার ত সন্ধ্যার আগে তোমার বাসায় ফিরে যেতে হবে?

অনিতার মাতা বলিলেন,—অনি, তোর বয়স হতে চল্‌লো, তুই যে ছেলে মানুষের মত কেদারকে একেবারে অস্থির করে তুল্‌লি?

অনিতা এবার অভিমান করিয়া বলিল,—থাক্, আমি যখন কিছু বল্‌লেই তোমরা অমন কর, তখন আমি কিছু বলব না।

কেদার এবার বলিল,—না দিদি চল। তোমরা তৈরী হও, আমি গাড়ী নিয়ে আসি।

রমেশ বাবুর স্ত্রী ও অনিতাকে তাহার বাসায় নিয়া যাইতে কেদারের একটু অনিচ্ছা ছিল। কেদারের বাড়ী পুড়িয়া যাওয়ায় তাহাদের বিছানা পত্র যাহা ছিল সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল; অথচ তাহার হাতে টাকাও নাই, মাতাকে কলিকাতায় আনিয়া দুই খানা তক্তপোষ, সামান্য

জিনিস পত্র কিনিয়া সে এবং তাহার মাতা দিন কাটাইতে ছিল। এইরূপ দৈন্য অপরের নিকট দেখাইতে কেদারের তেমন বাসনা ছিল না। যদিও কেদার তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল, সে নিতান্ত গরীব, পিতার আমলের যে কিছু তৈজস পত্র ছিল তাহা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, তবুও নিজের আভ্যন্তরীণ দৈন্যতা বাহিরের লোকের নিকট প্রকাশ করিবে কেন? তাহার মাতা তাহাতে লজ্জা বোধ করিতে পারেন। কিন্তু অনিতার বাক্যে এমনিই একটা আত্মীয়তার ভাব প্রকাশ পাইল যে, তাহার কাছে সেই দৈন্যতা প্রকাশ করিতে কেদারের আর কোনও সংকোচের ভাব রহিল না।

কেদার গাড়ী আনিতে চলিয়া গেল। আসিবার সময় খাবারের দোকান হইতে কিছু খাবার কিনিয়া আনিল, তাহা গাড়ীর ভিতরেই রাখিয়া দিল। কেদার জানিত অনিতা এবং তাহার মাতা তাহাদের বাসায় বেড়াইতে গেলে তাহাদিগকে জল খাবার না দিতে পারিলে মাতা মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন, সে ইহা বুঝিয়াই জল খাবার সঙ্গে নিয়া চলিল।

গাড়ী আনিয়া সে অনিতা এবং তাহার মাতাকে নিয়া তাহার বাসায় চলিল। অনিতা ও তাহার মাতাকে তাহার মাতার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। অনিতার মাতা ও কেদারের মাতা প্রায় সমান-বয়সি। তাহাদের বয়স ৪০।৪৫ হইবে, কেদারের মাতা শোকে এবং রোগে জর্জ্জরিতা হওয়ায় তাহাকে কিছু বয়োবৃদ্ধা দেখা যায়।

অনিতা যাইয়া কেদারের মাতাকে প্রণাম করিল। কেদারের মাতা অনিতার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—জন্মায়ুস্তি হ'য়ো, স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে থেকো।

অনিতার মাতা বলিলেন,—ছেলেটি বহু পুণ্য বলে পেয়েছেন, এমন ছেলে এখনকার দিনে বড় পাওয়া যায় না।

কেদারকে কেহ প্রশংসা করিলে অনিতার মুখখানা যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, কেদারের গৌরবে সেও যেন গৌরবান্বিতা মনে করিত। সে কেদারকে এমন চখেই দেখিত।

কেদারের মাতা বলিলেন,—তা আশীর্ব্বাদ করুন, ওকে থুয়ে যেন যেতে পারি। ওর মুখে ত আপনাদের প্রশংসাই ধরে না। ও ছেলেবেলা থেকেই মুখ চাপা, কিন্তু আপনাদের কথা উঠ্‌লেই ওর মুখ খুলে যায়, তখন কে বলবে ও এত কথা কইতে জানে।

অনিতার মাতা বলিলেন,—আফিসেও সকলেই ওকে ভালবাসে, আর ওকে ভালবাসবেই বা না কেন, এমন সৎ, সরল, কর্ত্তব্যপরায়ণ, বুদ্ধিমান। এমন ছেলেকে কি কেউ ভাল না বেসে পারে?

কেদার এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল,—একটা কথা কিন্তু না বলে পারি না। যদি আমাকে এত প্রশংসাই করতে হয়, তা হলে আমি চলে যাই, তারপর না হয় আপনি আমার খুব প্রশংসা করুন। আমার সাম্‌নে এত বল্‌লে যে আমার মাথা বিগড়ে যাবে।

অনিতার মাতা বলিলেন, "মাথা বিগড়াবার ছেলেই তুমি।" তৎপরে কেদারের মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আপনার পিঠের ঘাঁ টা একটুও কম্‌ছে না?

না কম্‌বে কি, এবার যে আমার কালের ডাক পড়েছে।

অনিতা কেদারের মাতার মুখে এই কথা শুনিবামাত্রই তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এমন কঠোর সত্য সে যেন আজ পর্য্যন্ত কোনও দিনও শোনে নাই। সে কেদারের মুখে শুনিয়াছিল, তাহার মাতার ঘাঁ যেন কিছুতেই শুকাইতেছে না, তিনি তাহার যন্ত্রণায় অতীব কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। কোনও চিকিৎসাতেই কিছুই ফল দর্শিতেছে না। না জানি এই ঘাঁ হইতেই তাহার জীবন সংশয় হইয়া দাঁড়ায়! সে

কেদারের মাতার মুখে আজ এই অপ্রিয় সত্যটি শুনিয়া কেদারের দুঃখে তাহার হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সে আজ স্বচক্ষে দেখিতে পাইল কেদারের মাতার কালের ডাকই পড়িয়াছে।

অনিতার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঘরের কোনও জিনিষই বুঝি বের করতে পারলেন না? এমন আগুণই লেগেছিল?

কেদারের মাতা বলিলেন,—যা সব চেয়ে মূল্যবান তা রাখ্‌তে পেরেছি, যা যাবার তা গিয়েছে, তার জন্য শোক করে আর ফল কি?

কেদারের মাতা কি প্রকারে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা অনিতার মাতা কেদারের মুখে শুনিয়াছিলেন। অনিতার মাতা কেদারের মাতাকে বলিলেন, "এমন মা না হলে কি এমন ছেলে হয়!"

আরও কিছুক্ষণ আলাপের পর কেদারের মাতা কেদারকে বলিলেন,— যা ত বাবা, কিছু খাবার নিয়ে আয়, অনিতার হাতে দিতে হবে।

কেদার হাসিয়া বলিল, "তা আর তোমার বল্‌তে হবে না, আমি তা আগেই নিয়ে এসেছি।" ইহা বলিয়া কেদার একটা ঠোঙ্গা স্থিত কতক খাবার তাহার মাতার হাতে দিল। দুই খানা থালা আনিয়া কেদার তাহার মাতার নিকট রাখিল। তাহার মাতা দুই খানা থালায় সেই খাবার উঠাইলেন। এক খানা থালায় দুই জনের জন্য খাবার উঠাইলেন, আর এক খানা থালায় এক জনের জন্য খাবার উঠাইলেন। এক খানা থালা অনিতার মাতার নিকট দিয়া কেদারের মাতা বলিলেন, "কিছু মিষ্টি মুখ করতে হয়।" অনিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এস মা এদিকে, তুমি আর কেদার এক সঙ্গে খাবে।"

অনিতা কেদারের সহিত খাবার খাইতে নিযুক্তা হইয়া গেল। অনিতার মাতা বলিলেন,—আমাকে আবার কেন?

কেদারের মাতা বলিলেন,—না, একটু মিষ্টি মুখ না করে কি কেউ

যায় ? অনিতা ও কেদারের খাওয়া হইয়া গেলে কেদারের মাতা আন-তাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এস ত মা, আমার কাছে।" অনিতা তাহার নিকটে গেলে, তিনি অনিতার মুখখানা ধরিয়া বলিলেন, "এমন মুখ দেখ্‌লে কার না ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে ? না হলে আমার মুখচোরা ছেলে এমন ব্যাখ্যা করে ? সে সর্ব্বদাই বলে, অনিতাকে দেখলে আমার মনে হয়, সে আমার ছোট বোন্। আমি সম্ভব বেশী দিন বাঁচব না, তোমরাই কেদারকে দেখ্‌বে শুন্‌বে।"

অনিতা এবার কেদারের মাতার কথায় উত্তর দিল,—আপনি কি বল্‌ছেন ? আপনি সেরে উঠ্‌বেন। আমারা যেতে দিলে ত আপনি যাবেন।

কেদারের মাতা হাসিয়া বলিলেন, –সময় আসলে কেউ কি কারোও ধরে রাখতে পারে লো মা ?

আরও কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া অনিতা ও তাহার মাতা চলিয়া গেল। কেদার তাহাদিগকে তাহাদের বাসায় দিয়া আসিল।

নিশিকান্ত আজ বৎসরেক হইল কার্য্যস্থলে চলিয়া গিয়াছে। প্রথম দুই তিন মাস সে ভুবনমোহিনীর নিকট তাহার খরচ নির্ব্বাহের জন্য টাকা পাঠাইত, ও তাহার বাড়ীর অপরাপর খবর অনুসন্ধান করিত। কিন্তু আজ কয়েক মাস যাবৎ সে বাড়ীর কোনও খবরই নেয় না, সে বাড়ীতে কোনও টাকাও পাঠায় না। নিশিকান্তের মনে স্ত্রীর প্রতি একটা শ্রদ্ধার ও তৎসঙ্গে একটা ভালবাসার ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সেই ভাবটা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই ভুবনমোহিনীর নিকট হইতে সরিয়া পড়ায় তাহা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। চরিত্রহীন ব্যক্তির মনে দৃঢ়তা বা একাগ্রতা থাকিতে পারে না। সে যখনই যাহা করে তাহা সাময়িক উত্তেজনার বশে করিয়া থাকে। সেই উত্তেজক পদার্থ তাহার চোখের সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া গেলে বা দূরে সরিয়া পড়িলে, সেই উত্তেজনার ভাবটা ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসে, সে আবার পূর্ব্ব চরিত্র প্রাপ্ত হয়। নিশিকান্ত নূতন স্থানে আসিয়া দিন কয়েকের জন্য ভুবনমোহিনীর জন্য একটা বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব করিতে লাগিল; কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, তাহার সেই বেদনা ক্রমে ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। এদিকে নিশিকান্ত জমিদারের প্রবল পরাক্রান্ত নায়েব পদে অভি-ষিক্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহার ত সাঙ্গোপাঙ্গের অভাব নাই। প্রত্যেক স্থানেই নায়েবের সাঙ্গ পাঙ্গ মোসাহেব থাকে, বিশেষতঃ নায়েব যদি একটু চরিত্রহীন হয় তবে সাঙ্গোপাঙ্গের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়; কারণ সেই মোসাহেবি

ব্যাপারে তাহাদেরও বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন হয়। নিশিকান্ত নূতন কার্য্যস্থলে আসিবার কতক কাল পরেই সাঙ্গোপাঙ্গ জুটিল, সেই সব সাঙ্গোপাঙ্গের অনুকম্পায় এক গৃহস্থের বিধবা কন্যাকে প্রেমিকা রূপে প্রাপ্ত হইল। সে তাহারই প্রেমে ক্রমে ক্রমে মুগ্ধ হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সুরা-দেবীর সেবাও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপে মাস ছয় সাত চলিয়া গেলে ভুবনমোহিনী, তাহার পুত্র, বাড়ী ঘর নিশিকান্তের মন হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইল। সে আত্মচিত্ত-বিনোদনে সম্পূর্ণরূপে গা ঢালিয়া দিল। ভুবনমোহিনী, শিশু পুত্র, বাড়ী ঘর সম্বন্ধে চিন্তা করিবার আর তাহার অবসর রহিল না।

পুত্রের প্রতি বাৎসল্যের ভাব নিশিকান্তের মনে সময় সময় উদয় হইত বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণ কালের জন্য মনে অবস্থান করিয়া আবার হৃদয়ে বিলীন হইয়া যাইত। তখন যে সুরা-দেবী ও প্রেমিকাই তাহার জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভুবনমোহিনী নিশিকান্তের নিকট চিঠির উপর চিঠি লিখিয়া ক্লান্ত হইয়া গেল। নিশিকান্ত নিরুত্তর. নিশি-কান্তের কোনও চিঠিপত্র কিংবা খবর আসিল না। ভুবনমোহিনী নিশি-কান্তের বিষয়ে ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। খরচ নির্ব্বাহের আর উপায়ান্তর না দেখিয়া সে রামচন্দ্রকে দিয়া প্রতি মাসে মাসে পোষ্টাফিস হইতে কিছু কিছু টাকা উঠাইয়া আনিয়া খরচ নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। এই ভাবে আরও পাঁচ ছয় মাস চলিয়া গেল, ভুবনমোহিনী তখন স্বামীর আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের লালন পালনের দিকেই তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিল।

নিশিকান্ত বাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়ার পর নরেন্দ্রনারায়ণের ভুবন-মোহিনীর সম্পর্কে কুবাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রনারায়ণের ইয়ার বন্ধুর অভাব ছিল না, তাহারাই তাহার কুবাসনা-বহ্নির ইন্ধন যোগাইয়া

দিত। কত অসহায়া রমণী যে তাহাদের কুচক্রে সতীত্ব হারাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই বন্ধুগণের ও নরেন্দ্রনারায়ণের নিযুক্ত দূতী থাকিত। তাহারা চক্রান্ত করিয়া গৃহস্থ বধূ কিংবা কন্যাকে প্রলোভনে ভুলাইয়া কিংবা তাহাদিগকে অসহায় অবস্থায় আনিয়া তাহাদের সতীত্বের জলাঞ্জলি দেওয়াইত। এই প্রকারে বন্ধুগণের ও দূতীর উভয়েরই আয় হইত। নরেন্দ্র বাবু প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার, তাহার ভয়ে কেহই উচ্চ বাক্য করিতে সাহস করিত না। নিশিকান্ত বাড়ীতে থাকিতে তাহা-দ্বারাও নরেন্দ্রনারায়ণ সময় সময় স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিত। নিশিকান্তের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী এক ঘর কায়স্থের বাস। সেই বাড়ীতে বসন্তকুমারী নাম্নী জনৈক বিধবা স্ত্রীলোক বাস করিত। বসন্ত বাল বিধবা, সে বিধবা হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত পিত্রালয়েই বাস করিতেছে। বসন্তের সংসারে তাহার এক বৃদ্ধা মাতা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। বসন্ত যৌবনের মুখে পদার্পণ করিতেই চরিত্র হারাইয়া ফেলে। দেখিতে কালো হইলেও তাহার মুখশ্রী অতি সুন্দর, তাহার বয়স এক্ষণে ৩০।৩৫ বৎসর। সে সদা হাস্যময়ী, অতি মিষ্টভাষী, কথা বলিবার বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। কথাটি এমন ভাবে বলিবে, তাহাতে চরিত্রহীন ব্যক্তির সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বসন্তের চরিত্র-দোষ গ্রামবাসী সকলের নিকটেই বিদিত ছিল।

বসন্ত নিশিকন্তের দক্ষিণ হস্ত ছিল। বসন্ত দ্বারা নিশিকান্ত নরেন্দ্র-নারায়ণকে তিন চারিটি গৃহস্থ বধূ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। নরেন্দ্রনারায়ণও বসন্তের এ বিষয়ে ক্ষমতার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়া ছিল। নিশিকান্ত চলিয়া গেলে তাহার কতক দিবস পরেই নরেন্দ্রনারায়ণ বসন্তকে খবর দিল। বসন্ত কালবিলম্ব না করিয়া নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইল।

বসন্ত নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইলে নরেন্দ্রনারায়ণ বলিল,—দেখ, আজ একটা বিশেষ কাজের জন্য তোমায় ডেকেছি। জানই ত বসন্ত, বিশেষ কাজ না থাকলে আর তোমার মত কাজের লোককে ডাকাব কেন? আমি জানি বসন্ত না হ'লে আমার এ কাজটি আর কেউ সম্পাদন করতে পারবে না।

বসন্ত বলিল,—বাবু আর ভনিতা করে কাজ কি, বলে ফেলুন না কি করতে হবে? আমি আপনার কাজে কবে পশ্চাদপদ?

আরে তাইত, তা জেনেই ত তোমাকে ডেকেছি। কাজটা একটু শক্ত, তাই এবার তোমার স্বয়ং এর তলব। তবে তেমন শক্তও নয় যদি তুমি একটু বিশেষ মনোযোগ দেও। তোমার ক্ষমতা ত আমার অজানা নেই?

বলেই ফেলুন না কি করতে হবে? আমার সাধ্য থাকলে আমি নিশ্চয়ই তা করব।

নিশিকান্তের বৌটা নাকি বড়ই সুন্দরী, তাকে হাত করে দিতে হবে তোমার।

বসন্ত একেবারে জিব কাটিয়া উত্তর দিল,—বাবু, এদিকে দৃষ্টি দিবেন না, এ দিকে কোনও আশা নাই। এ বাসনা ত্যাগ করুন। একি যেমন তেমন ছুকরি, এযে সাক্ষাৎ সতী সাবিত্রী। এর চোখের কাছে যায় কার সাধ্য?

আর রেখে দাও তোমার সতী সাবিত্রী! কত সতী সাবিত্রীরই ত তোমাদের কল্যাণে দেখা পেলাম।

না বাবু, এ আর অন্যে তফাৎ আছে। এ একেবারে আগুণ! এর কাছে যাওয়া না আগুণ নিয়ে খেলা করা।

বুঝেছি, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না, তোমার মতলব বুঝেছি। যে

রকম তার একটা সার্টিফিকেট দিলে, না হয় তুমি বড় রকমের একটা পারিশ্রমিক পাবে।

আচ্ছা, দেখব কি করতে পারি। তবে যদি কৃতকার্য্য হতে পারি, অনেক বেগ পেতে হবে। কিছুদিন দেরীও হবে। ওদিকে নিশিকান্ত ত এসে পড়বে না?

না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তাকে আমি একরকম চিরদিনের জন্যই সরিয়েছি। তার কি আর বাড়ীর দিকে মন আছে? সে সেখানে নূতন সঙ্গিনী পেয়েছে, সে এখন তাই নিয়েই বিভোর।

তা হলে পর আশা করি, তাকে এনে আপনার হাতে দিতে পারব।

তোমাকে আমি কতকটা ফন্দিও বলে দিচ্ছি, তারপর তুমি তোমার বুদ্ধি খরচ করবে। তুমি তার স্ত্রীর কাছে সদাসর্ব্বদা যাবে, নিশিকান্তের বিষয় তার কাছে অতিরঞ্জিত করে বল্‌বে, ক্রমেই সে তার স্বামীর উপর বিগড়ে যাবে। সে ত আর আস্‌ছে না, খাওয়া পড়ারও কষ্ট হবে, তখন টাকা ছড়াব, আপনিই পোষ মানবে।

তা মানবে বৈ কি? তবে কিছু বেগ পেতে হবে। বসন্তের পাল্লায় পড়ে তাঁকে না এসে কি পরিত্রাণ আছে।

"বসন্ত, একটু বোসো, গলাটা শুকিয়ে আস্‌ছে, একটু খেয়ে নি, তুমিও একটু বায়না নেও।" ইহা বলিয়া নরেন্দ্রনারায়ণ মদের বোতল খুলিল, একগ্লাস পান করিয়া বসন্তকে একগ্লাস ঢালিয়া দিয়া বলিল, "নেও প্রাণটা একটু সরস করে নেও।"

ছিঃ, আমায় আবার কেন? এখন কি এসব খাওয়ার সময়?

নেও, এখন নেকামি রাখ, দেবির আরাধনার আবার সময়, অসময় কি? একি যেমন তেমন দেবি? কলিকালের জাগ্রত দেবতা!

উদারহৃদয়া, ভক্ত-বৎসলা! ভক্তের জন্য সর্ব্বদাই অস্থির। যখন ডাকবে তখনই ভক্তকে আশ্রয় দেন। এখন এস, আর দেরী কোরো না, দেবির সেবা আরম্ভ কর।

ইহা বলিয়া সে মদের গ্লাস আবার বসন্তের হাতে দিল। বসন্ত এবার অম্লান বদনে তাহা গলায় ঢালিয়া দিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ তখন আবার একগ্লাস পান করিল। তখন সে পূর্ণ মাতাল। সে বলিল,—বসন্ত, সাধে কি তোমার নাম রেখেছে বসন্ত, তোমার শরীরে যে চির-বসন্ত বিরাজ করছে! বসন্ত, কি রূপই তুমি পেয়েছিলে? কি মধুর কণ্ঠই তুমি পেয়েছিলে, বয়স থাকৃলে তোমাকে নিয়েই জীবন কাটাতাম।

আর রঙ্গ এখন রেখে দিন, এখম যাকে চাচ্ছেন তাকে পেলেই হয়।

বসন্ত, একাজটি করে দিতে পারলে আমি তোমার কেনা গোলাম হ'য়ে রইলাম।

আর বল্‌তে হবে না বাবু, আমার সাধ্যের ত্রুটি হবে না। যতদিন বেঁচে আছি, আপনাদের কাজ করে যেতে পারলেই সুখ।

বসন্ত, বলি ও বসন্ত, আমি ত তোমার পথ পানেই চেয়ে রইলাম। কবে তোমার মুখে সুখবরটি পাব, সেই আশায়ই দিন কাটাব। আমার প্রাণটা কিন্তু তোমার হাতে সপে দিলাম, এখন রাখলেও তুমি মারলেও তুমি।

বসন্ত হাসিয়া বলিল,—বাবু সবুর করুন, ধৈর্য্য ধরুন! সবুরে মেওয়া ফলে। এত উতলা হবেন না, এত উতলা হলে চলবে কেন?

মেওয়া ফল্‌বে ত?

আল্‌বৎ ফল্‌বে। বসন্তের কৃপায় না ফলে যায় কৈ?

"তাহলে আজ থেকেই তোমার কেনা গোলাম হয়ে রইলাম।" ইহা

বলিয়াই নরেন্দ্রনারায়ণ বসন্তের পায়ের কাছে উপুর হইয়া নাকে খৎ দিয়া বলিল, "এই দেখ বসন্ত, আজ থেকেই তোমার গোলাম হলেম।

"আপনি এতও জানেন!" এই কথা বলিয়া বসন্ত নরেন্দ্রনারায়ণ হইতে অগ্রিম পারিশ্রমিক বাবদ কিছু নিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। নরেন্দ্রনারায়ণ নিশিকান্তের স্ত্রীর রূপ ধ্যান করিতে করিতে নেশায় বিভোর হইয়া পড়িয়া রহিল।

প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণের নায়েব পদে অভিষিক্ত হইয়া নিশিকান্ত পঞ্চগ্রামে আসিয়াছে। তাহার আগমনের কতককাল পরেই তাহার ভয়ে ও প্রতাপে তাহার অধীনস্থ গ্রাম সকল কম্পমান। বিশেষতঃ পঞ্চগ্রামের ভদ্রলোক ও সাধারণ প্রজারা ত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচে; তাহারা সর্ব্বদাই আশঙ্কা করিত, কখন কাহার মানসম্ভ্রম নষ্ট হয়। কিন্তু কি করিবে, পৈতৃক ভদ্রাসন ত ত্যাগ করা সহজ কথা নহে? সুতরাং যতদূর সম্ভব নূতন নায়েব মহাশয়ের মনস্তুষ্টি করিয়াই সকলে চলিতে লাগিল।

পঞ্চগ্রামে ভদ্রলোকের সংখ্যা খুব কম। দুই ঘর গৃহস্থ ভদ্রলোক বাড়ীতে বাস করিত। অপরাপর ভদ্রলোকেরা সপরিবারে বিদেশেই কার্য্য-স্থলে থাকিত। এখনকার দিনে বঙ্গদেশে যাহারা শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারা প্রায় কেহই গ্রামে বাস করেন না। তাহারা বিদেশে কার্য্যস্থলেই প্রায় বার মাস বাস করেন; ক্বচিৎ দুই চারি বৎসর পরে কেহ কেহ দুই চারিদিনের জন্য বাড়ীতে আসেন, আবার কেহ কেহ "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী" মায়া জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া বিদেশকেই দেশ বলিয়া মানিয়া নিয়া জীবন কর্ত্তন করেন। তাই বলিয়া তাহাদের যে দেশের জন্য মায়া কম, তাহা নহে। এখনকার দিনে এই ঘোর অনটনের জন্য, সকলেই জীবিকা সংস্থান করিতে গলদঘর্ম্ম হইয়া যায়; প্রায় সকলেরই আয় হইতে ব্যয়ের পরিমাণ অধিক; সুতরাং মাথার ঘাম পায় ফেলিয়াও

দুই পয়সা তাহারা সঞ্চয় করিতে পারে না ; তাহাতে আবার যাওয়া আসার পাথেয় খরচ দিন দিন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই পাথেয় খরচ বহন না করিতে পারিয়া বাসনা থাকিলেও অতৃপ্ত বাসনা নিয়া বিদেশকেই স্বদেশ বলিয়া মানিয়া নিতে হয়। যাহারা দেশে থাকে, হয় তাহারা বিদেশে যাইয়া উপার্জ্জনক্ষম নহে, কিংবা তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ বিষয় সম্পত্তি আছে ; তাহার উপস্বত্বদ্বারা তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু সেই যে দুই চার জন ভদ্রলোক গ্রামে থাকে, তাহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ গ্রাম্য দেবতারূপে অবস্থান করে। তাহাদের অত্যাচারে, তাহাদের কূটবুদ্ধির প্রভাবে অন্য লোকের গ্রামে অবস্থান করাও কষ্টকর হইয়া উঠে। তাহাদের আইন কানুন কণ্ঠস্থ, কূটনীতি তাহাদের নিত্য-সহচর। গ্রামে যত বাদ বিসম্বাদ ঘটে, তাহারা তাহার কোনও না কোনও দলে থাকিবেই থাকিবে। এই সব কারণে গ্রামের দিকে এখন আর কেহ বড় মনোযোগ দিতে পারে না। ওদিকে গ্রামে আর এখন তেমন জলাশয় নাই, পানীয় জলের জন্যও লোকে এখন হাহাকার করে। পূর্ব্বে জলাশয় খনন করিয়া লোককে জলদান করা একটা মহাপুণ্যের কার্য্য বলিয়া লোকে গণ্য করিত ; সেইজন্য তখন যেখানে সেখানে লোকে জলাশয় খনন করাইত। এখন সকলেই প্রায় স্বার্থ চিন্তায় মগ্ন, পরার্থের দিকে কাহারও তেমন মন নাই ; তাই এখন আর কেহ জলাশয় খনন করায় না; জলাশয় খনন করান দূরে থাকুক, অংশীদারগণের বাদবিসম্বাদে পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারও কেহ করায় না। যে সব জলাশয় আছে, তাহা চৈত্র মাসের প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে প্রায় শুষ্ক হইয়া উঠে। এখন গ্রামে সুস্বাদু জল পান করা একটা সৌভাগ্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পূর্ব্বে খাদ্য-সংস্থানের জন্য এত ক্লেশ পাইতে হইত না। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অতি অল্প আয়াসেই তাহার সন্তান-

গণের খাদ্যের সংস্থান করিয়া দিতেন। এমন দিন তাহার ছিল, যখন তাহাকে স্বর্ণ-প্রসূতি বলিয়া লোকে আখ্যা দিত, দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে তাহার সন্তানগণ তাহা জানিত না, তাহা তাহারা কল্পনাতেই আনিতে পারিত না। আজ তাহাদের সন্তানগণ 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া দেশ বিদেশে ঘুরিতেছে। তাহার সন্তানগণের আর সেই তেজোদীপ্ত আভা নাই, সারা বৎসর অর্থাভাবের বিষাদ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতেই তাহারা জীবন কর্ত্তন করে। বঙ্গদেশের এমন যে দুর্গোৎসব,—যে উৎসবের জন্য বঙ্গের সমস্ত নরনারী উৎসুকচিত্তে সারা বৎসর অতিবাহিত করিত, আবার মাতা ভগবতীকে তাহার সন্তান-সন্ততিসহ সাদরে বরণ করিয়া নিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত, সেই দিনটা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রাণ নাচিয়া উঠিত; আর এখন? এখন আর সেই আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, দুর্গাপূজার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চিন্তা-স্রোত বৃদ্ধি পাইতে থাকে,—পাওনাদারদের কি দিয়া বিদায় করিবে, কি দিয়া পুত্র পরিবারের অভাব দূর করিবে, কি দিয়া পুত্র পরিবারের জন্য একথানা নূতন বস্ত্র ক্রয় করিয়া কোনও মতে মনকে পরিতুষ্ট করিবে। চারিদিকেই কেবল নিরানন্দের ছবি, চারিদিকেই কেবল হাহাকার!

নিশিকান্তের বড় আনন্দেই দিন যাইতেছিল, তাহার ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, নিজ চিত্তবিনোদনেই সে বিভোর। দেশের কথা, দশের কথা তাহার চিন্তা করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। মহালে যাহা আদায় হইত, নিজের ইচ্ছামত মনিব সরকারে কিছু জমা দিয়া বক্রি সে নিজ চিত্তবিনোদন কার্য্যে ব্যয় করিত।

গ্রামদেশে প্রবল পরাক্রান্ত নায়েব একটি ক্ষুদ্র নবাব বিশেষ। তাহার মেজাজ একটু গরম হইলে, তাহার হুঙ্কারে সমস্ত গ্রাম বিকম্পিত হয়। জমিদারগণেরও এখনকার দিনে আর প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি নাই। তাহারা

বাঁচিয়া আছে, না মরিয়া আছে তাহাও তাহাদের দেখিবার অবসর নাই। তাহারা ভুলক্রমেও গ্রামদেশে আসিয়া প্রজাগণের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করে না। তাহারা গ্রামদেশে আসিলে, প্রজার অভিযোগ শ্রবণ করিলে, নায়েবের অত্যাচারের মাত্রাও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাহারা সহরে থাকে নিজ মনস্তুষ্টি নিয়া, আর সরকারি বড় বড় রাজপুরুষদের চিত্তবিনোদন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া। যে কৃষককুল এক দিন ভারতের গৌরব ছিল, যে কৃষককুল সকল জাতিরই স্তম্ভস্বরূপ, সেই কৃষককুলের এখন জমিদারের ও তাহার নায়েব পাইকের অর্থ যোগাইতে যোগাইতে ওষ্ঠাগত প্রাণ।

এবার দেশের বড়ই দুর্বৎসর। কার্ত্তিক মাস হইতেই বৃষ্টি বন্ধ হইল। বৈশাখ মাস পার হইতে চলিল, দেশে বৃষ্টি নাই। ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল; খাল, বিল, পুষ্করিণী সব শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। লোকে অন্ন ও জলকষ্টে হাহাকার করিতে লাগিল।

দেশে যে সব পুষ্করিণী এক দিন সুস্বাদু জলের জন্য খ্যাত ছিল, খননের অভাবে সেই সব পুষ্করিণীর জল প্রায় শুষ্ক হইয়া আসিল, তাহাতে এখন যে জল বিদ্যমান আছে, তাহা কেবল ভেকের লীলাস্থল হইয়াছে; সেই জল একেবারে কর্দ্দমাক্ত। গৃহস্থ-বধূরা সেই জলই নেকড়ার সাহায্যে অতি কষ্টে গৃহে নিয়া যায়, তাহাই তাহারা অতি সুস্বাদু বলিয়া পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে ও জীবন ধারণ করে। এক দিকে আহারের সংস্থান নাই, অন্নের অভাবে লোকে অন্নের পরিবর্ত্তে কচু, গাছের পাতা পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে লাগিল, অন্য দিকে পানীয় জলের অভাবে লোকে কর্দ্দমাক্ত জল পান করিতে লাগিল। শরীর ত লোহার নয়, তাহা রক্তে মাংসেই গঠিত; ভারতবর্ষ বলিয়া ত আর ভগবান তাহাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করেন নাই। দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেখা দিল। দেশে চুরি, ডাকাতির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাইল; এমন কি, জলাভাবে যে বাড়ীতে কোনও

ভাল পুষ্করিণী কিংবা কূপ আছে, তাহার জল পর্য্যন্ত চুরি হইতে লাগিল। সরকার পক্ষ হইতে গ্রামে গ্রামে কিছু কিছু ঔষধ পাঠান হইল; কিন্তু লোকে তাহা কতক গ্রহণ করিল, কতক করিল না। তাহারা বলিল, পথ্যের বন্দোবস্ত না হইলে ঔষধ ভক্ষণ করিয়া কি হইবে? সরকার পক্ষ হইতে কিছু কিছু অর্থ সাহায্যও করা হইল। তাহা কেহ পাইল, কেহ পাইল না। যাহারা পাইল তাহারাও দুই দিন পরে আবার উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। এমত অবস্থায়ও প্রজাদের শান্তি নাই।

জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ নিশিকান্তের নিকট লিখিয়াছে, তাহার বিশেষ প্রয়োজন, টাকা যেন শীঘ্র পাঠান হয়। মহালে খাজনাও বাকী পড়িয়া গিয়াছে; লোকে অভাবের গতিকেই হউক আর স্বভাবের গতিকেই হউক খাজনা দিয়া উঠিতে পারে নাই। এ দুর্বৎসরেও প্রজাদের উপর নিশি-কান্তের জরুরি হুকুম গেল, "খাজনা আদায় চাই।" লোকেরা প্রাণের ভয়ে না খাইয়াও কিছু কিছু খাজনা আদায় করিতে লাগিল।

পঞ্চগ্রামে নবীন চক্রবর্ত্তী নামে জনৈক ভদ্রলোক বাস করিত। সে একটি গ্রাম্য দেবতা বিশেষ; অবস্থা নিতান্ত খারাপ। তাহার প্রধান ব্যবসাই লোকের মোকদ্দমার তদ্বির-তালাপি করা, অর্থাৎ পরস্পরে বিরোধ বাঁধাইয়া যাহাতে দুই পয়সা উপার্জ্জন হয় তারই চেষ্টা করা। ওদিকে স্বভাবও তাহার নিতান্ত খারাপ; পরের উপর মদ ইত্যাদি পাইলে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে সে কোনদিনও আপত্তি করিত না। নিশিকান্ত এই গ্রামে নায়েব হইয়া আসা অবধি সে নিশিকান্তের একজন প্রধান সহচর হইয়া দাঁড়াইল, বাড়ীতে থাকিলে নিশিকান্তের ওখানেই আড্ডাটা জমিত ভাল।

চরিত্রহীন ব্যক্তির এক স্ত্রীলোকে আসক্তি অধিক দিন থাকিতে পারে না। নিশিকান্ত যে স্ত্রীলোককে নিয়া এতদিন ছিল, ক্রমেই যেন

তাহার উপর তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল, আবার তাহার নূতন একটি স্ত্রীলোক চাই। এমন স্ত্রীলোক কোথায় পাওয়া যায়, অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। এমন সময়ে নবীন চক্রবর্ত্তী একদিন নিশিকান্তকে খবর দিল—নায়েব মশাই! আপনার কপাল ফেটেছে, এবার যা শীকার জুটেছে তা জগতে দুর্লভ।

নিশিকান্ত বলিল,—সে কেমন ?

নবীন চক্রবর্ত্তী বলিল,—আপনি সুন্দরী মেয়েমানুষ খুঁজছিলেন, তা জুটে গেছে।

তাহা শুনিয়া নিশিকান্তের প্রাণ নাচিয়া উঠিল, সে বলিল,—খুলে বলুন্ ত ব্যাপারটা কি ?

আর ব্যাপার, আপনার কপাল ফেটেছে। পরাণের মেয়েটা বিধবা হয়ে বাড়ীতে এসেছে।

কোন্ পরাণ ?

আপনাদের রায়ত পরাণ মণ্ডল।

আমাদের পরাণ ? তার মেয়ে কবে এল ? তার বয়স কত ?

আপনাদের পরাণই, এই ত আজ ৫।৭ দিন হল এয়েছে। বয়স আর কত হবে ? জোর ১৬।১৭।

দেখ্‌তে কেমন ?

কেমন আবার ! পরমা সুন্দরী, ছোট লোকের ঘরে এমন সুন্দরী বড় দেখা যায় না।

সত্যি ? তা হলে ত সে দিকে দেখ্‌তেই হবে।

তা হ'লে নায়েব মশাই, একটা কথা বলি, এবার যদি এ শীকার বাগিয়ে দিতে পারি, তবে কিন্তু আমার বাড়ীর সাম্‌নের জমিটুকু আমাকে পাইয়ে দিতে হবে।

আচ্ছা, সে বিষয় দেখা যাবে, এদিকে এখন দেখুন। ভাল, আপনার বাড়ীর কাছে জমিটুকু না কার?

আব্দুলের। সে বেটাকে কত বল্‌লাম আমাকে জমিটুকু ছেড়ে দিতে, সে জমিটুকু না হ'লে আমার থাকাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখলেন ত, কত ফন্দি কর্‌লাম; কিছুতেই শালার থেকে জমিটুকু ছাড়িয়ে নিতে পারলাম না, চেষ্টার ত কোনও ত্রুটি করি নাই। জানেন ত নায়েব মশাই, করিমের নামে আব্দুলের নাম সংযুক্ত এক কবালা তৈয়ার করে আব্দুলের নামে করিমকে দিয়ে এক জাবেদা মোকদ্দমা কর্‌লাম, সাক্ষী সাবুদও বেশ হয়েছিল। হাকিম শালা এক মহা গরু, কবালাটা মিথ্যা সাব্যস্ত করে মোকদ্দমাটা হারিয়ে দিলে। আপনি যদি একটু চাপ দেন, তবে আব্দুল জমিটা আমায় নিশ্চয় ছেড়ে দেয়।

আচ্ছা, আমি সে বিষয় দেখ্‌ব। এখন পরাণের মেয়েটাকে পাই কিসে তাই বলুন।

সে ভার আমার উপর, আমি এর মধ্যেই টোপ ফেলেছি। যা শুন্‌তে পাই মেয়েটার স্বভাবও ভাল নয়। আচ্ছা, আপনি আর একটা কাজ করুন ত, দেখুন ত পরাণের খাজনা পত্র বাকী আছে কিনা? বেটা ত না খেয়ে মর মর হয়েছে।

নিশিকান্ত সেই দণ্ডেই মুহুরিকে ডাক দিল। মুহুরি আসিলে বলিল,—দেখুন ত পরাণ মণ্ডলের খাজনা পত্র কিছু বাকী আছে কিনা?

মুহুরি হিসাববহি বাহির করিয়া দেখিল, তাহার সাত বৎসরের খাজনা বাকী। তাহা শুনিয়াই নিশিকান্ত ও নবীন চক্রবর্ত্তীর বদনকমল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

নিশিকান্ত বলিল,—দেখুন ত পরাণের বার্ষিক খাজনা কত?

মুহুরি বলিল,—২০৷৶০ আনা।

নিশি বলিল,—বটে? তার কাছে এত বাকী পড়ে গেছে? এ ত আদায় কর্‌তে হবে। বাবুর চিঠি ত দেখেছেন, টাকা আদায় চাই-ই। আপনি আজ রাত্রিতেই পরাণের নিকট লোক পাঠান, খাজ্‌না যেন নিয়ে আসে, তার সঙ্গে বুঝা পড়া করতে হবে।

মুহুরি চলিয়া গেলে নবীন চক্রবর্ত্তী বলিল,—তা হলে দেখা যাচ্ছে, বেটার কাছে একশ চল্লিশ টাকার উপরে খাজনাই বাকী, তার উপরে সুদ ত আছেই। বেটার দুবেলা এখন আহারই জোটে না, সপরিবারে এখন এক প্রকার না খেয়েই থাকে, তার উপরে আবার অসুখ; তার উপরে খাজনার চাপ দিলে পরাণই তার মেয়েকে এনে আপনার হাতে দিয়ে যাবে।

বুদ্ধিটা পাকিয়েছেন ভাল।

তখন উভয়ে মিলিয়া কিছুক্ষণ পরামর্শ করিল, কি প্রণালীতে ভবিষ্যতে কার্য্য করিতে হইবে। নিশিকান্ত বলিল,—আজ রাত্রিতে একবার আসবেন, পরাণচন্দ্র কি বলে দেখি।

রাত্রিতে পরাণ মণ্ডল নিশিকান্তের নিকট আসিল, নবীন চক্রবর্ত্তী ইহার পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়া বসিয়াছিল। পরাণ আসিয়া উভয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল।

নিশিকান্ত আজ রক্ত জবার ন্যায় চক্ষু করিয়া বসিয়া আছে। মদে টং, মুখ হইতে মদের তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছে। নিশিকান্তের এ মূর্ত্তি দেখিয়াই পরাণ মণ্ডলের মুখ শুকাইয়া গেল। সে নিশিকান্তও নবীন চক্রবর্ত্তীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কোনও বাক্য উচ্চারণ করিতেও তাহার সাহস হইতেছিল না। ঐ ভাবে কতক-ক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অতি সন্তর্পিত চিত্তে সে বলিল,—কর্ত্তা, আমায় কি ডেকেছেন? অধীনের প্রতি আজ্ঞা করতে হুকুম হয়।

নিশিকান্তের এবার যেন চৈতন্য হইল, সে গুরু গম্ভীর ভাবে বলিল,—এ্যাঁ, কি বল্লে? তোমায় ডেকেছি কেন? তা শুন্তে চাচ্ছ? তুমি বুঝ্তে পারনি কেন তোমায় ডেকেছি?

পরাণ হাত জোর করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—আজ্ঞে কর্ত্তা, আমি অধম, আমি কি বুঝব?

নিশিকান্ত বলিল,—হ্যাঁ, তা বটেই, এখন বুঝবে কেন? বলি, খাজনা পত্র এনেছ? লোকের পর লোক পাঠান হচ্চে, বাবুর যে খোঁজই নাই!

খাজনা এবার ভাদ্র মাসে দিব, পাটটা বেঁচে নেই।

ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত কে বাঁচে কে মরে তার ঠিক নাই, আমি যাব ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে। ও সব হবে না, এই দণ্ডে টাকা দিতে হবে। টাকা দিতে পারবে কিনা বল?

আজ্ঞে কর্ত্তা, এখন টাকা কেমন করে দেব, এখন কি আমাদের কাছে টাকা আছে? স্ত্রীর আজ মাসাবধি জ্বর, পথ্যের অভাবে মারা যাচ্ছে। সরকারি ডাক্তার ঔষধ দিয়েছিলেন, আমার স্ত্রী ঔষধ ফেলে দিয়ে বল্লে, ঔধধ খেয়ে কি হবে, আমাকে চারটা ভাত দেও। ঘরে চাউল ছিল না, আর এক বাড়ী থেকে কতক চাউল এনে তাকে খাওয়েছি, এমনি করে আমাদের দিন যাচ্ছে। আমাদের এ কয়টা দিন মাপ করে নিন্—এবার দেখেছেন কর্ত্তা, রৌদ্রে ধান সব মারা গেল।

ও সব কিছু না, যার থাকে তার সব সময়েই থাকে, যার না থাকে তার কোনও সময়েও থাকে না। ওসব বাজে আপত্তি, তা হচ্চে না। টাকা দিবে কিনা বল?

আজ্ঞে কর্ত্তা, এতই সয়েছেন এ কয়টা দিন সয়ে নিন্। আপনি আমাদের বাপ মা, কর্ত্তা; রাখ্লেও আপনি মার্লেও আপনি।

না,না, ওসব কথা বোলো না, রাখ্‌বার মার্‌বার আমি কে? জমিদার চিঠি লিখিছেন, তার টাকার বিশেষ দরকার, তার খাজনা পত্র যদি আমদানি না হয়, তবে আমরা আছি কেন? আমাদের শুধু বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ার জন্য রেখেছেন? তৎপরে মুহুরিকে সম্বোধন করিয়া নিশিকান্ত বলিল, "আপনি বেটাকে বুঝিয়ে দিন'ত, জমিদার কি লিখেছে।"

মুহুরি বলিল,—পরাণ, ভালয় ভালয় খাজনা এনে দেও। বাবু লিখেছেন, প্রজা বাঁচুক আর মরুক তাতে তার কি? মেরে হউক ধরে হউক, খাজনা আদায় চাই-ই। তার বিস্তর টাকার প্রয়োজন, টাকা না পেলে আমাদের কাজ থেকে বরখাস্ত করবেন।

নিশিকান্ত বলিল—শুনলে ত বাপু? এখন আমার কোনও দোষ আছে? এখন ভাল মানুষের ছেলের মত টাকা কয়টা নিয়ে এস।

পরাণ বলিল,—কর্ত্তা, আমরা ছোট লোক, আমরা শুনেছি আপনি আমাদের মহারাজের বন্ধু। আপনি ইচ্ছা করলেই আমাদের বাঁচিয়ে নিতে পারেন, আমরা ত আপনার পায়েই পড়ে আছি।

নিশিকান্ত এবার হাসিয়া বলিল,—আরে বাপু, ওসব কথা কিছু নয়, টাকার কাছে বন্ধু ঠন্ধু নাই, সেখানে সব ফাক্কা। টাকা আমদানি করতে না পারলে আমাদের কারও চাকরি থাকবে না। যাক্ ওসব বাজে কথা! তৎপরে মুহুরিকে হুকুম দিল, "দেখুন ত এর কাছে কত বাকী?"

মুহুরি বলিল, সাত বৎসরের খাজনা বাকী। ২০৸৶০ আনা করে বৎসর, সাত বৎসরে হলো ১৪৪৷৶০ আর সুদ ৩৬৴১০, মোট ১৮০৷৴১০।

নিশিকান্ত বলিল, "বাস্, এখন রাত হয়েছে উঠা যাক্, কাল ভোরে এই ১৮০৷৴১০ আনা চাই, আর যেন তোমার বাড়ীতে লোক না পাঠাতে হয়।" ইহা বলিয়াই নিশিকান্ত গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইল।

পরাণ মণ্ডল অমনি নিশিকান্তের পা ধরিয়া বলিল,—মহারাজ, আমায়

এ কয়টা দিন মাপ করুন, আর এ চারটা মাস, ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত সময় চাই। এখন হাতে এক পয়সাও নাই, এখন এক পয়সাও দিতে পারব না, খুন করলেও না।

ভাদ্র মাস ত এবারই নূতন আস্‌ছে না, ছয় ভাদ্র ত আরও চলে গেছে, এতদিন খাজনা দেও নাই কেন? ওসব কিছু না; আমি আর সবুর করতে পারব না, কালকের মধ্যে খাজনা চাই।

বাবু, কর্ত্তা, গরীবের মা বাপ আপনি, আমায় আর কয়টা দিন মাপ করুন, এখন দিতে পারব না।

পরাণ মণ্ডলের কথা শুনিয়া নিশিকান্ত আবার উপবেশন করিল, তৎপরে হুঙ্কার দিয়া বলিল,—দিতে পার্‌বে না? বুঝেছ আমি সহজে ছাড়ব? জান, আমি কড়া হলে বড়ই কড়া, আর নরম হলে বড়ই নরম। তুমি বল্‌লে খাজনা দিতে পারবে না, আমি খাজনা আদায় কর্‌বই। এখনও বলি, ভালয় ভালয় খাজনাটা এনে দেও, তা না হ'লে আমাকে অগ্নি মূর্ত্তি ধারণ কর্‌তে হবে। মাপ কর্‌তে কর্‌তেই এতটা হয়েছে।

পরাণ আবার নিশিকান্তের পা ধরিয়া বলিল,—কর্ত্তা, এ কয়টা দিন অপেক্ষা করুন, এবার যা ফসল হয়েছে দেখছেনই ত, বল্‌তে গেলে কিছুই হয়নি। আমরা ত না খেয়ে মরবই। যদি না খেয়েও মরি, আপনার খাজনা কিছু পরিষ্কার কর্‌বই।

নিশিকান্ত চীৎকার করিয়া বলিল,—বড় অনুগ্রহ কর্‌লে! ভাদ্র মাসে কিছু পরিষ্কার করবো, শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হলো! যাক্, আর বাক্‌বিতণ্ডা করে সময় নষ্ট করে লাভ নাই। চাড়াল বেটা ছুঁয়ে ফেলেছে, এই দুপ্রহর নিশিতে আবার স্নান কর্‌তে হবে, তা না হলে ত জলগ্রহণও করা যাবে না। আরে কে আছিস্, শালাকে বাঁধ ত, দেখি গুঁতোর চোটে টাকা আদায় হয় কি না।

নিশিকান্তের ডাক শুনিয়া কাছারির দুই জন পাইক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা আসিলে নিশিকান্ত হুকুম দিল,—শালাকে বাঁধ, তারপর লাঠির গুঁতো চালাতে থাক, যতক্ষণ টাকা আন্‌তে কবুল না করে গুঁতো চালাও।

কথা বলামাত্রই তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। কাছারিতে নায়েব যে প্রকার থাকে, অন্যান্য কর্ম্মচারিরাও প্রায় সেই প্রকারেরই হয়। পাইকদ্বয় সেই দণ্ডেই পরাণ মণ্ডলের হাত ধরিয়া পিঠ মোড়া করিল। পরাণ তখন কাঁদিতে লাগিল। নিশিকান্ত আবার বলিল,—কেমন শালা, টাকা দিবি কি না বল্?

পরাণের সেই এক কথা,—কর্ত্তা, এখন টাকা কোথা পাব? খেতে পারি না, এখন ত কারো কাছে টাকা কর্জ্জও পাব না।

নিশিকান্ত বলিল,—তবে শালা, তুই তোর পরিণাম ভোগ কর্। শালাকে গুঁতো চালাও।

দুই পাইক দুই দিক হইতে পরাণকে দুই লাঠির গুঁতা মারিল। পরাণ, "মরলাম গো, গেলাম গো, মেরে ফেল্‌লে গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

নিশিকান্ত বলিল, "না শালা বড় চেঁচায়, ষাঁড়ের মত গলা, বেজায় আওয়াজ। শালার মুখে কাপড় গুঁজে মুখ বন্ধ করতে হবে।" পাইক-দ্বয়কে সে সেই মর্ম্মে হুকুম দিল।

পাইকদ্বয়ও সেই হুকুম সেই দণ্ডে কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। পরাণ মণ্ডল তখন তাহার জীবনের আশা এক প্রকার পরিত্যাগ করিল।

নবীন চক্রবর্ত্তী এতক্ষণ নীরবে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। সে পরাণের দুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া নিশিকান্তকে বলিল,—বাবু, আপনি একটু সবুর করুন, এ গরীব বেচারিকে মেরে আর কি হবে? ও বাস্তবিকই খেতে

পায় না। ওকে ছেড়ে দিন, গরীব মানুষ, মার্‌লে ধর্‌লে কিছু ফল হবে না। দেখি আমি ওকে একটু বুঝিয়ে।

নিশিকান্ত বলিল,—আচ্ছা দেখুন আপনি, আমারও ইচ্ছা নয় যে আমি অনর্থক একজন লোকের উপর অত্যাচার করি। আমার কি? আমি দু দিন আছি, তারপর নাই। দেখুন তা হলে আপনি ওকে বুঝিয়ে কিছু কর্‌তে পারেন কি না।

নবীন চক্রবর্ত্তী পরাণ মণ্ডলকে মুক্ত করিয়া বাহিরে নিয়া গেল। সেখানে যাইয়া পরাণকে নবীন চক্রবর্ত্তী বলিল,—দেখ বাপু এক কাজ কর। আমি যা বলি তা যেয়ে কর, তা না হলে তোমার আর উপায় নাই। বাস্তবিকই জমিদার যেমন করাক্কার ভাবে লিখেছে, নায়েব খাজনা আদায় না করে আর ছাড়বে না। এখন খাজনা দেবে কোত্থেকে, এখন কি তোমাদের হাতে টাকা আছে? আমি দেশে থাকি, আমি ত সব বুঝি। আর ঐ যে নায়েব, মুহুরি দেখছ, ওরা বিদেশী। ওরা আমাদের দুঃখ কি বুঝ্‌বে?

পরাণ মণ্ডল নবীন চক্রবর্ত্তীর মুখে সহানুভূতির কথা শুনিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—আজ্ঞে ঠাকুর কর্ত্তা, আপনি আমাকে বাঁচান, আপনি যা বল্‌বেন আমি তাই করব।

নবীন চক্রবর্ত্তী তখন বলিল,—পরাণ, দেখ্‌ছ ত টাকা না দিলে আর অব্যাহতি নাই। নায়েবকে বাধ্য কর্‌তে পার্‌লে তুমি বাঁচতে পার। আমার মনে হয় একটা কাজ কর্‌লে তুমি নায়েবকে বাধ্য কর্‌তে পার।

পরাণ বলিল,—বলুন, বলুন, তা কর্‌তে এখনই আমি রাজি আছি। বাবা, পাইকগুলার লাঠির গুঁতোয় এখনও আমার শরীর চর চর কর্‌ছে।

নবীন বলিল,—তা হলে এক কাজ কর। নায়েবের যেমন মদ টদ খাওয়ার অভ্যাস দেখি, স্বভাব চরিত্রও ভাল নয়। আমার মনে হয়, তোমার

মেয়ে সুশীলাকে এনে নায়েবের কাছে দিলে সম্ভব নায়েব তোমাকে বাঁচিয়ে নিতে পারে।

পরাণ নবীন চক্রবর্ত্তীর কথা শুনিয়া একটু চিন্তাযুক্ত হইল।

পরাণকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া নবীন চক্রবর্ত্তী বলিল,—আর চিন্তা কোরো না, যা বলেছি তাই ভাল যুক্তি। সুশীলা বালবিধবা, সে কি স্বভাব আর ভাল রাখ্‌তে পার্‌বে? ছোট লোকের মেয়ে, এ বয়সে যখন বিধবা হয়েছে, নিশ্চয়ই কারো সঙ্গে বেরিয়ে বৈষ্টবী হয়ে যাবে। তুমি আর তাকে ধরে রাখ্‌তে পার্‌বে না। নায়েবের কাছেই থাকুক, তারও একটা পন্থা হবে, তুমি খাজনা ত রেহাই পাবেই, বরং টাকা পয়সাও সময় সময় সাহায্য পাবে।

পরাণ মনে মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—না ঠাকুর কর্ত্তা, আমায় মাপ করুন। মরি তাও স্বীকার, কিন্তু পিতা হয়ে কোন্ প্রাণে মেয়েকে সতীত্বের জলাঞ্জলি দেওয়াব।

আচ্ছা, তা হলে তুমি মর।

ইহা বলিয়া নবীন চক্রবর্ত্তী ঘরের মধ্যে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিল, পরাণ মণ্ডল তাহার অনুসরণ করিল।

নবীন চক্রবর্ত্তী বলিল,—না, নায়েব মশায়, এ বেটা বড়ই বেয়ারা।

নিশিকান্ত পরাণ মণ্ডলকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—আচ্ছা, তা হলে এখন যাও, কাল ভোরে টাকা চাই।

পরাণ মণ্ডল বিনা বাক্যব্যয়ে নিশিকান্ত হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। পরাণ চলিয়া গেলে নিশিকান্ত নবীন চক্রবর্ত্তীর মধ্যে আবার মন্ত্রণা চলিতে লাগিল।

নিশিকান্ত বলিল,—না, এতদূর যখন গড়াল, তখন একে পাওয়া চাই-ই।

নবীন চক্রবর্ত্তী বলিল,—নায়েব মশাই, এ ছুকরি সুন্দরীও। এমন সুন্দরী বড় সহজে মিলে না।

নিশিকান্ত কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল,— আচ্ছা, যখন নিশিকান্ত লেগেছে তখন তা পাবেই। যদি শীকার মনের মত হয়, তবে আপনিও তার পুরস্কার পাবেন।

নবীন বক্রবর্ত্তী বলিল,—সে আপনার অনুগ্রহ।

উক্ত ঘটনার পঞ্চ দিবস পরেই গ্রামে রাষ্ট্র হইল, পরাণ মণ্ডলের মেয়ে সুশীলাকে পাওয়া যায় না। পরাণ মণ্ডল গ্রামের বহু লোকের নিকট যাইয়া নায়েবের অত্যাচার বিবৃত করিল; কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত নায়েবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কাহারও সাহস হইল না।

নির্ধন পরাণ মণ্ডল টাকা ব্যয় করিয়া কন্যা হরণের প্রতীকার করিতে পারিল না, সুতরাং নীরবেই সেই অত্যাচার সহ্য করিল! ইহার দুই দিবস পরেই পরাণ মণ্ডলের স্ত্রী প্রাণত্যাগ করিল, পরাণ মণ্ডল বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল কেহ জানিল না।

প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে গাছপালা ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল ; ক্ষেত্রের শস্য সবই মরিয়া গেল ; গাভীগুলিও এখন আর মাঠে যাইতে পারে না, গৃহ হইতে বাহির হইয়া বিচরণ করিয়াও আহার পায় না ; গৃহ-পালিত পশু-গুলিও অনাহারে মরিতে লাগিল। মাঠগুলা যেন রৌদ্রের উত্তাপে শাঁ শাঁ করিতে লাগিল, দুপ্রহরের সময় গৃহ হইতে বাহির হইলে মনে হয় অংশুমালী তাহার প্রবল প্রতাপ দেখাইবার জন্যই যেন পৃথিবীতে অগ্নিকণা নিক্ষেপ করিতেছেন। পুষ্করিণী, খাল, বিলে জলের এতদুর অভাব যে লোকের জলাভাবেই মরিবার উপক্রম হইল। সরকারের নিকট জলকষ্টের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া আবেদনের পর আবেদন যাইতে লাগিল, একই প্রকার উত্তর আসিতে লাগিল,—টাকা উঠাও, গ্রামের উন্নতি কর, পুষ্করিণী খনন করাও। টাকাও উঠান হইল না, পুষ্করিণীও খনন করা হইল না। জমিদারের নিকট প্রজাগণ আবেদন করিল, হয় জমিদারের ব্যয়ে দুই চারিটি পুষ্করিণীর পঙ্ক উদ্ধার করিয়া দেওয়া হউক, না হয় তিনি প্রজাদিগকে অনুমতি করুন, প্রজারাই নিজ ব্যয়ে পুষ্করিণী খনন করিয়া নিবে। জমিদার প্রজাদিগের আবেদনের উত্তর দেওয়া সঙ্গত বোধ করিলেন না, কিংবা পত্রের উত্তর দেওয়ার তাহার অবসরও নাই।

আব্দুল অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, তাহার বাড়ীতে লোকও অনেক, গরু বাছুরও অনেক। সে একটু নিরিবিলি গোছের লোক, বেশ সৎ, লোকের সাথে কলহ বিবাদ করা সে কোন দিনও ভালবাসে না। বাড়ীর

পুষ্করিণীটি, যাহা সে জমিদারকে বহু টাকা দিয়া বন্দোবস্ত নিয়াছিল, তাহাও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। পানীয় জল আর নাই, গরু বাছুর প্রখর রৌদ্রের তাপে তাহাতে নামিয়া কোনও মতে তৃষ্ণা নিবারণ করে; কিন্তু লোকের জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিবার উপায় নাই। যখন প্রজাগণ জমিদারের নিকট আবেদন করিয়াও কোনও উত্তর পাইল না, তখন আব্দুল অনন্যোপায় হইয়া বহু টাকা ব্যয় করিয়া তাহার বাহির বাড়ীর পুষ্করিণীটির পঙ্ক উদ্ধার করিল। তখন সেই পুষ্করিণী হইতে শত শত লোক প্রত্যহ জল নিয়া প্রাণ ধারণ করিয়া দুই হাতে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

লোকে আশীর্ব্বাদ করিলে কি হয়, এই দেশের যে সবই অদ্ভুত। পুষ্করিণী খননের কতক দিবস পরেই সুশীলা নিশিকান্তের কবলে পড়িল। নিশিকান্তের আর শত সহস্র অপরাধ থাকিলেও সে অকৃতজ্ঞ নহে। নবীন চক্রবর্ত্তী তাহার এত বড় একটা উপকার করিয়া দিয়াছে, তাহার প্রত্যুপকার করা তাহার নিতান্ত কর্ত্তব্য। নিশিকান্ত আব্দুলের হইতে নবীন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখানা নবীন চক্রবর্ত্তীকে দিতে বদ্ধ-পরিকর হইল।

নিশিকান্তের নিকট খবর আসিল, আব্দুল বহু টাকা ব্যয় করিয়া তাহার বাহির বাড়ীর পুষ্করিণীটি খনন করাইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে পুরাতন পুষ্করিণীর আয়তনও বৃদ্ধি করিয়াছে। আব্দুল পুষ্করিণীটিকে সকল প্রকারে সুন্দর করিবার জন্য তাহা একটু বড় করিয়া এবার কাটাইয়া ছিল।

প্রবল প্রতাপান্বিত নায়েব নিশিকান্ত তাহা শুনিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিল,—কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার এলাকায় থেকে মনিবের অনুমতি না নিয়েই আব্দুল পুষ্করিণী কাটিয়ে ফেল্‌ল? আচ্ছা দেখা যাবে! ডাক আব্দুলকে, তার ভিটা বাড়ী উচ্ছন্ন করব, তাকে দেশ ছেড়ে যেতে হবে।

অমনি আব্দুলের তলব হইল। প্রজার অবস্থা সচ্ছল হইলেও জমিদারের নায়েবের নাম শুনিলে তাহারা ভয়ে কম্পমান হয়; তাহাতে আবার নিশি-কান্তের অত্যাচারের বৃত্তান্ত সমস্ত মহালেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাছারিতে আসিতে আব্দুলের মনেও আশঙ্কা হওয়ায়, সে তাহার সঙ্গে কয়েক জন মাতব্বর প্রজাকে নিয়া আসিল।

আব্দুল এবং অন্যান্য প্রজারা নিশিকান্তকে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিল। নিশিকান্ত গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া আব্দুল জোর হাত করিয়া বলিল,—কর্ত্তা, আমাকে নাকি ডেকেছেন?

হ্যাঁ ডেকেছি বই কি? তোমার মত বড় লোক যে আমার ডাকে এসেছে এইত আমার সৌভাগ্য! তুমিত এখন মস্ত বড় লোক হয়ে গেছ।

সে কি রকম কর্ত্তা? আমরা চাষার ছেলে, আমরা আবার বড় লোক হব? বড় লোক হবার আকাঙ্খা আমরা কোনও দিনই রাখি না। মাটি চষে খেয়ে যেতে পারি আল্লাতাল্লার কাছে এই আমাদের এক আকিঞ্চন। খোদার দোয়া থাক্‌লেই হলো!

না হে তা নয়; টাকা না হলে কি আর জমিদারকে কেউ অবজ্ঞা করে? তোমরা ত এখন জমিদারকে জমিদার বলেই মান্‌তে চাও না। এখন নিজেরাই হয়েছ জমিদার।

সে কি রকম কর্ত্তা?

তা নয় ত কি। বলি, এই যে বাড়ীতে পুষ্করিণীটি কাটিয়েছ, মনিবের অনুমতি নিয়েছ? মাটি কি তোমার?

না কর্ত্তা, তা বল্‌ব কেন? মাটি মনিবেরই। আমরা জলাভাবে মরে যাচ্ছিলাম, তাই পুরাণ পুকুরটি একটু ঝালিয়ে নিয়েছি। এখন যা জল হয়েছে, নায়েব মশায়, ঠিক যেন ডালিমের রস; তা লোকে খেয়ে আমাদের

মনিবকেই আশীর্ব্বাদ কর্ছে, তাতেও আমাদের মনিবের পরমায়ু শত গুণে বেড়ে যাবে।

ওসব খোষামুদে কথা রেখে দাও! আমি ওসব রঙ্গের কথা অনেক শুনেছি। বলি, এই যে পুকুরটি কাটালে মনিবের অনুমতি এনেছ কিনা তাই বল?

আজ্ঞে কর্ত্তা, মনিবের কাছে সে বিষয় লিখেছিলাম, তিনি কি আমাদের মত গরীবদের চিঠির উত্তর দেবেন? সম্ভবতঃ তিনি তা পানই নাই।

তাই ত হলো, তুমি মনিবের অনুমতি না নিয়ে পুকুরটি মনিবের জায়-গায় কেটেছ। তুমি জান, বাঙ্গালা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে কি বলে?

আজ্ঞে কর্ত্তা! তা অত শত আমরা কেমন করে জান্‌ব? আমরা গোমুক্ষু চাষা।

তবে শোন। আইনে বলে, মনিবের অনুমতি ব্যতীত একটুকরা মাটি কাট্‌তে পার্‌বে না; যদি কাটে, মনিব ইচ্ছা করলে তাকে উচ্ছেদ কর্‌তে পার্‌বে।

পানীয় জলের জন্যও সে পুকুর কাট্‌তে পার্‌বে না?

না।

মানুষ জল না খেয়ে মরে যাবে?

মরুক, তাতে আইনের নিয়ম ভাঙ্গতে পার্‌বে না।

আব্দুল এই আইন শুনিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিছুকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—আজ্ঞে কর্ত্তা, আমি ত নূতন পুকুর কাটাইনি, পুরাণ পুকুরটি কাটিয়েছি মাত্র।

আব্দুল, তোমাকে সত্যবাদী বলে জানতাম, এটা কি তুমি সত্য কথা বল্‌লে? তুমি পুরাণ পুকুর কাটাতে গিয়ে নূতন মাটি কাটনি? পুকুরটি আগের চেয়ে বড় করনি?

হাঁ কর্ত্তা, তা করেছি। এ রকম না কর্‌লে ত পুকুরে জল থাকৃত না, এই রকম করে কাটিয়েছি বলেই পুকুরটিতে খুব ভাল জল হয়েছে।

ওসব আইনে টিকবে না। আইন দেখবে না তোমার পুকুরের জল ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে ; মোদ্দা, তুমি নূতন মাটি কাটিয়ে মনিবের বহু ক্ষতি করেছ, তোমার নামে উৎখাতের নালিশ কর্‌তেই হইবে। মনিবের স্পষ্ট হুকুম আছে, এই রকম পুকুর কেউ কাট্‌লে তাকে উৎখাত কর্‌তে হবে, যত টাকা লাগে।

আজ্ঞে কর্ত্তা, এ ত দেখ্‌ছি অদ্ভুত নিয়ম! জলাভাবে লোক মর্‌ছিল, এত টাকা ব্যয় করে পুকুর কাটিয়ে জল খাচ্ছি, তার শাস্তি হলো আমাকে উৎখাত করা।

তা বই কি? আইনের নিয়ম, মনিবের আজ্ঞা আমার পালন কর্‌তেই হবে! যদি তুমি এর প্রতিবিধান না কর, তবে তোমাকে উৎখাত করার জন্য আদালতে নালিশ কর্‌তেই হবে। তুমি একজন মাতব্বর প্রজা, তাই তোমাকে জানিয়ে তবে আদালতে যাচ্ছি, পরে আমাকে অনুযোগ দিতে পার্‌বে না ; অন্য লোক হলে আর এত কর্‌তাম না।

আজ্ঞে কর্ত্তা, না হয় এবার আমাকে মাপ করে নিন্, দেখছেনত এবার দেশে কেমন জলকষ্ট হয়েছে?

না, না, তা হতে পারে না, তা হলে যে একটা প্রথা হয়ে যাবে। পুকুর কাটা কি মাপ করা যায়? না, তা হতে পারে না, তুমি এর প্রতিবিধান না কর্‌লে আমাকে আদালতে যেতেই হবে। এখন দেখ তুমি কি কর্‌বে।

নবীন চক্রবর্ত্তীর প্ররোচনায় করিম আব্দুলের নামে যে মোকদ্দমা করিয়াছিল, তাহাতে তাহার যে অর্থব্যয়, শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ হইয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িলে এখনও হৃৎকম্প উঠে। তাহার মনে হইত, মোকদ্দমা করিতে যাওয়া হইতে নরককুণ্ডে যাওয়াও বুঝি শ্রেয়ঃ।

নায়েবের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব দেখিয়া সে বলিল,—কি করলে আমি রেহাই

পেতে পারি বলুন? এদেশে বাস্তব্য করতে হলে দেখ্‌ছি জল খেলেও পাপ, না হলে আমার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে কেন?

আমি বাপু স্পষ্ট বলে দিচ্ছি যা মনিব লিখেছেন। নবীন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর লাগ তোমার একখানা জমি আছে; তা যদি ছেড়ে দাও,তবে আমরা আর আদালতে যাব না।

আব্দুল নিশিকান্তের কথা শুনিয়া যেন বিস্মিত হইল। সে বলিল,—সে জমি দিয়ে আপনার কি প্রয়োজন?

নিশিকান্ত এবার একটু মেজাজ গরম করিয়া বলিল,—কি প্রয়োজন তা আবার তোমায় বল্‌তে হবে নাকি? ইচ্ছা হয় জমিখানা ছেড়ে দাও, ইচ্ছা না হয় না দেও, আদালত ত খোলাই আছে। ভারি ত জমি, এক কাণির বেশী ত হবে না।

কর্ত্তা, এক কাণি জমির দাম এখনকার দিনে ৪০০৲ শত টাকার কম হবে না। জল খেয়ে প্রাণ বাঁচাবার আক্কেল সেলামি ত কম নয়।

মিঞা সাহেবের আবার ঠাট্টা হচ্ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি! তুমি কি আমার কোনও কুটুম? তবে এখন উঠি, আদালতে আবার দেখা হবে।

আব্দুল দেখিল, নিরুপায়। তখন সে বলিল,—আচ্ছা, আমি একটু চিন্তা করে নি, তারপর আপনাকে আমি আমার মত জানাব।

তবে আমাদের কতদিন দেরী করতে হবে? মনিবের বড়ই কড়াক্কড় হুকুম, বেশী দিন দেরী কর্‌তে পারব না।

না, বেশী নয়, সাত দিন মাত্র।

আব্দুল নিশিকান্ত হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। আব্দুলের সঙ্গে তাহার আত্মীয় জবরালি আসিয়াছিল; সে আব্দুলকে জিজ্ঞাসা করিল,—কি কর্‌বে ঠিক কর্‌লে?

কি কর্‌ব এখনও ঠিক করি নাই, তবে যেমন দেখছি জমিটুকু না যায়।

কেন অম্‌নি ছেড়ে দেবে? একবার লড়েই দেখ না? অম্‌নি উৎখাত, কেবল মুখের কথা!

আরে ভাই, লড়ার নামেই যে আমার হৃৎকম্প উঠে। কোনও দিন ত লড়নি, তাই একথা বল্‌ছ? করিমের সাথে একবার লড়েই যা শিক্ষা পেয়েছি তাতে লড়বার আর সাধ হয়'না। জান ত ভাই, ঐ জমিখানা আমার, করিম আগাগোড়া মিথ্যা মোকদ্দমা করেছিল, করিমের উকিল প্রায় সাব্যস্ত করেছিল, আমি নাকি তার থেকে ২০০৲ টাকা নিয়ে কবালা করে জমিখানা বিক্রি করেছিলাম। বাবা পেরেষানি কত? জলের মত টাকা ব্যয়, তারপর উকিলের বকুনি, তার জেরা, সাক্ষীদের খোষামুদি, পেয়াদার চোট্‌পাট্‌, হাকিমের ধমকানি।

আব্দুল বাটিতে প্রত্যাগমন করিয়া সহরে তাহার উকিল বাবুর সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে গেল। তাহার উকিল বাবু সব কথা শুনিয়া বলিলেন, যখন তুমি নূতন মাটী কেটেছ তখন এ মোকদ্দমার ফলাফল অনিশ্চিত, তবে লড়ে দেখ্‌তে পার।

আব্দুলের মনিবের সহিত লড়িবার বাসনা মোটেই হইল না। সে মনিব বরাবরে জমিখানা পরিত্যাগ করিয়াই বিবাদ মিটাইতে প্রস্তুত হইল। মনে মনে বলিল,—মনে করব পুকুরটি কাটাতে আরও চারশ টাকা বেশী খরচ পড়ল, খোদার দোয়া থাক্‌লে এ টাকা আবার আসবে।

বাড়ীতে যাইয়া নিশিকান্তকে জানাইল, "সে জমিখানা মনিব বরাবরে ইস্তাফা দিতে প্রস্তুত আছে।" ইহার কতক দিবস পরেই নবীন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর নিকটস্থ ভূমিখণ্ড আব্দুল মনিব বরাবরে ইস্তাফা দিলে নবীন চক্রবর্ত্তী তাহা প্রাপ্ত হইল।

এই প্রকারে নিশিকান্তের অত্যাচার দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

---

(১৫)

ভুবনমোহিনীর দিন যে কি ভাবে যাইতে লাগিল, তাহা ভুবনমোহিনীই জানে। সে দিনরাত্রি কেবল নিশিকান্তের চিন্তাই করিত। নিশিকান্ত যদিও ক্ষণকালের জন্যও স্ত্রীর বিষয় চিন্তা করিত না, ভুবনমোহিনী ত তাহার স্বামীর চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করিতে পারিত না। সে যে হিন্দু রমণী। হিন্দু রমণীর যে স্বামীই প্রধান আরাধ্য দেবতা, হিন্দু রমণী যে বাল্যকাল হইতেই সাবিত্রী, দময়ন্তী, সীতা, শৈব্যা প্রভৃতি আদর্শ রমণীর আদর্শ চরিত্রের কাহিনী শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহাদের ন্যায়ই আদর্শ রমণী হইবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। তাহারা যে নিজের দুঃখ, নিজের কায়িক ক্লেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একমাত্র স্বামী, পুত্র কন্যার সুখ চিন্তাতেই বিভোর থাকে। তাহাদের নিজের সুখ সাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি করা যে একটা প্রয়োজনীয় বিষয়, এটা তাহারা ধারণাতেই আনিতে পারে না। ভুবনমোহিনীর এক এক বার মনে হইত, তবে কি তাহার স্বামীর কোনও পীড়া হইয়াছে? তিনি না জানি কি ভাবে দিন কাটাইতেছেন! নরেন্দ্রনারায়ণের লোক আসিয়া তাহাকে সময় সময় জানাইয়া যাইত, নিশিকান্ত ভালই আছে। নরেন্দ্রনারায়ণের সহিত বসন্তের কথাবার্ত্তা হওয়ার পর নরেন্দ্রনারায়ণের লোক আসিয়া ভুবনমোহিনীর নিকট নিশিকান্তের চরিত্রের বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়াও সময় সময় বলিত। ভুবনমোহিনী জানিতে পারিল, নিশিকান্ত ঘোরতর মাতাল হইয়া পড়িয়াছে, কোনও গৃহস্থের কন্যাকে নিয়া সে সেখানে মহাসুখে আছে, চব্বিশ ঘণ্টাই এক

প্রকার মদে বিভোর। নিশিকান্তের পূর্ব্ব চরিত্রের বিষয় ভুবনমোহিনী সম্পূর্ণরূপে জানিয়াও এসব বৃত্তান্ত সে যেন বিশ্বাস করিতে চাহিত না। একবার তাহার মনে হইত, এসব মিথ্যা; আবার তাহার মনে হইত, এসব সত্য হইলেও তাহার স্বামী যেন তাহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন, খোকাকে তিনি ভুলিয়া থাকিবেন কেমন করিয়া। তাহার জন্য না হউক, খোকার জন্য তিনি বাড়ী আসিবেনই। আবার তাহার মনে হইত, মদ্যপায়ী বেশ্যাসক্ত হইলে বুঝি সবই সম্ভব, স্ত্রী পুত্র সবই ভুলিয়া থাকিতে পারে। তিনি আর বাড়ী আসিবেন না। এই কথা মনে হইলেই তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিত; তাহার এবং তাহার পুত্রের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন যে সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে; এভাবে সে সমস্ত জীবন কেমন করিয়া কাটাইবে? সে চিন্তা করিতে করিতে আর কোনও কূলকিনারা পাইত না; সে তখন হতাশ হইয়া মনে মনে বলিত, "নিয়তি দেবি, দেখি তুমি আমায় কোথায় নিয়া যাও!" এইরূপ চিন্তার উপর দিয়া ভুবনমোহিনীর জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ভুবনমোহিনী যতই নিশিকান্তের বিষয় শুনিতে লাগিল, সে ততই তাহার শিশু পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। সে যে তাহাতেই তাহার স্বামীর রূপ প্রকটিত দেখিতে পাইতেছে। তাহাকে ত বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। তাহার লালন পালনের যাবতীয় ভার যে তাহার উপরে ন্যস্ত; সে-ই যে বংশের একমাত্র প্রদীপ, সে-ই যে ভুবনমোহিনীর ভবিষ্যতের একমাত্র আশা ভরসা।

নরেন্দ্রনারায়ণের সহিত কথাবার্ত্তা হওয়ার কিছুদিন পরেই একদিন বসন্ত ভুবনমোহিনীর সাথে দেখা করিতে আসিল। নিশিকান্ত বাড়ীতে থাকিতে বসন্তের সমাগম নিশিকান্তের বাড়ীতে প্রায়ই হইত। নিশিকান্ত বাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়ার পর বসন্ত নিশিকান্তের বাড়ীতে আর বড়

বিশেষ আসিত না। যদি বা আসিত ভুবনমোহিনীর সাথে দুই চার মিনিট কথা কহিয়াই চলিয়া যাইত। আজ ভুবনমোহিনীর সাথে আলাপ করিতে আসিয়া সে জাকাইয়া আসন গ্রহণ করিল। ভুবনমোহিনী বসন্তকে বসিবার জন্য একখানা পিড়ি দিল। বসন্ত সেই আসনে উপবেশন করিয়া ভুবনমোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,—কি গা বামুন বৌ, দাদা বাবুর কোনও খবর পেলে ?. তিনি কবেতক আস্‌ছেন ?

ভুবনমোহিনী বলিল, কই, তিনি ত কোনও চিঠি পত্রই লিখ্‌ছেন না, আমি যে কি উৎকণ্ঠিত চিত্তে দিন কাটাচ্ছি তাত বুঝতে পাচ্ছ ?

তা আর বল্‌তে। দাদা বাবুর আক্কেলটা কি ? এই সোমস্ত বৌ থুয়ে, আবার যেমন তেমন বৌ নয়, বল্‌তে গেলে চাঁদের আলো, আর সোণার চাঁদ ছেলে ফেলে কোথায় কোন্ বিদেশে বিভুয়ে পড়ে আছে গো ? দাদা বাবুর আক্কেলখানা কি ?

বিদেশে না গিয়ে আর কি কর্‌বেন ? পেট চালান চাই ত ? ঘরে বসে থাক্‌লে ত আর পেট চল্‌ত না।

রেখে দাও তোমার পেট চালান। আমি যদি পুরুষ হ'তাম, মাটি কামড়ে বাড়ীতে পড়ে থাকতাম, এমন বৌ ফেলে যেতাম না। না খেয়ে মরলেও আমি নড়্‌তাম না।

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল, "সকলে যে তোমার মত বুদ্ধিমতী নয়, এইত দুঃখু। তোমার দাদা বাবু যে জাতিতে ব্রাহ্মণ, পেটুকের হদ্দ, পেটের জ্বালা এক দণ্ডও সইতে পারে না, আমার দিকে আর খোকার দিকে চেয়ে থাক্‌লে ত আর পেট পোষাবে না, তাই বিদেশে গেলেন। কিন্তু দিদি, বিদেশে ত অনেকেই যায়, তাই বলে কি আর স্ত্রীপুত্রের কোনও খবর রাখতে নেই ?" তৎপরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "জানি না আমার অদৃষ্টে কি আছে !"

আর খবর! দাদা বাবুর কি আর এদিকে মন আছে? পুরুষ মানুষ, ভোমরার মত উড়ে উড়ে মধু খায়, যেখানে উড়ে যায় ফুলের অভাব হয় না; ফুল মিললে মধুরও অভাব হয় না। যত কষ্ট আমাদের মেয়েমানুষের! আমরা আছি কেবল পুরুষের মুখের দিকে হা করে চেয়ে। তাই বল্‌ছিলাম বামুন বৌ, দাদা বাবুকে ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় নাই। যা শুনলাম, তাতে মনে হয়, তিনি আর দেশে শীগ্‌গির ফির্‌ছেন না, ওখানেও নাকি বেশ ফুল জুটেছে, মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে তোমার ভোমরা বধূ মধুপান কর্‌ছেন, বাড়ীর কথা কি আর তার মনে আছে?

ভুবনমোহিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—কি জানি দিদি, দেখা যাউক অদৃষ্টে কি আছে? কপালের ভোগ ভুগ্‌তেই হবে

এই কথা গুলি ভুবনমোহিনী উচ্চারণ করিয়া সে তাহার স্বামীর চিন্তায় অভিভূতা হইয়া পড়িল। তাহার কি স্ত্রীপুত্র ভুলিয়া থাকা সম্ভব? বিবাহের পর হইতে বাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত নিশিকান্ত তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে সে বিষয় মনে পড়িল, বাড়ীতে থাকিতে তাহার চরিত্রের কথা মনে পড়িল, পিতার মৃত্যুর সময়ের নিশিকান্তের ব্যবহারের কথা মনে পড়িল, ক্রমেই সে নিশিকান্তের বিষয় হতাশ হইয়া পড়িল। ক্রমেই যেন তাহার বদনকমল ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া আসিতে লাগিল। আজ যেন আবার তাহার মনে হইতে লাগিল, সে তাহার শিশুপুত্র নিয়া জগৎ সংসারে একা।

ভুবনমোহিনীকে এরূপ চিন্তামগ্ন দেখিয়া বসন্ত তাহাকে বলিল,—আর বৌ, মিছে চিন্তা করে তোমার শরীর খারাপ কচ্ছ। আমার ত মনে হয় তিনি আর শীগ্‌গির বাড়ী আস্‌ছেন না। বাড়ীর দিকে তার আদৌ মন নেই।

তা ত বুঝি দিদি, কিন্তু মনকে ত মানিয়ে রাখ্‌তে পাচ্ছি না। আর

মনকে মানাবই বা কি? তার হাতের একখানা চিঠি পেলেও মনকে প্রবোধ দিতে পার্‌তাম।

চিঠি লিখবার তার সময় নেই। শুনেছি সারাদিন তিনি হরদম ফূর্ত্তিতেই আছেন। আর মদও নাকি খেতে পারেন! তাকে একটি মদের পিপে বল্‌লেও হয়।

থাক্ দিদি, আর সে আলোচনা করে ফল কি। তার যা ইচ্ছা তাই করুন, আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের সাধ্য কি? আমরা ভুগতেই এসেছি, ভুগেই যাব।

কেন, মেয়েমানুষ ব'লে বুঝি আমরা আর মানুষ নই? পুরুষেরা যা তা করবে, আর আমরা বুঝি সারা জীবন বসে বসে ভুগব? আমরা পুরুষের দিকে অত চেয়ে থাকি বলেই আমাদের এই দশা।

পুরুষের দিকে না চেয়ে আর আমাদের উপায় কি?

উপায় আছে বৌ, আমি বলি কি বৌ, তুমি নিজে তোমার পথ দেখো।

সে কি রকম?

আর রকম কি, নিজে যাতে খেয়ে দেয়ে ছেলেটাকে মানুষ কর্‌তে পার তার চিন্তা কর।

তাই ত চিন্তা করি দিদি, কেমন করে ছেলেটাকে মানুষ কর্‌ব, আর আমিই বা কেমন করে সারাটা জীবন কাটাব। আমার ত কত বড় জীবনটা সাম্‌নে পড়ে রয়েছে।

ভুবনমোহিনীর কথার ঠিক অর্থ বসন্ত উপলব্ধি করিতে পারিল না। সে তাহার অন্য অর্থ ধরিয়া নিয়া বলিল, তাই ত বলি বউ, তোমার এমন সোমত্ত বয়স, এমন ভাবে দিন কেমন করে কাটাবে? রূপ যৌবন কে না উপভোগ করতে চায়? যদি ভোগই না করব, তবে ভগবান রূপ যৌবন দিতেছেন কেন? শুধু কি জ্বলে পুড়ে মরতে?

ভুবনমোহিনী বসন্তের কথার অর্থ বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিল। বসন্তের চরিত্র তাহার নিকট অবিদিত ছিল না। ভুবনমোহিনীর কথার অর্থ ছিল, সে কেমন করিয়া এইরূপ রামচন্দ্রের পরিবারের ছায়া-তলে থাকিয়া সারাজীবন কাটাইবে। বসন্ত যে তাহার এরূপ কদর্থ করিবে, সে তাহা ধারণাই করিয়াছিল না। সে বসন্তের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিল, তাহার কথাটাই কিছু খাপছাড়া হইয়াছিল।

ভুবনমোহিনী বসন্তের কথা শুনিয়া বলিল,—দিদি, রূপ যৌবন দিয়ে কি হবে, যে দেবতার চরণে রূপ যৌবন অর্পণ কর্‌লাম যদি সে দেবতা তা গ্রহণ না কর্‌ল? ফুল যদি পূজার জন্য তুলে পূজা না করা যায়, তবে সে ফুল ফুটেই বা লাভ কি, আর ফুলের জন্মই বা সার্থক হ'ল কি করে?

বসন্ত বুঝিল ভুবনমোহিনী সহজ মেয়ে নয়, তাহাকে বাঁকে আনা তাহার সহজ হইবে না। কিন্তু বসন্তও যেমন তেমন মেয়ে লোক নয়, তাহারও এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। বসন্ত অতি সুচতুরা ও বুদ্ধিমতী, তাহার সহিত কথায় আটিয়া উঠা দায়।

বসন্ত হাসিয়া বলিল,— দেবতার কাজে যে ফুল লাগবে তা দেবতারও ভাগ্য, ফুলেরও ভাগ্য। ফুল ত আর দেবতা ঠিক করে জন্ম গ্রহণ করে না, তা মানুষ পছন্দ করে দেবতার পূজায় লাগায়। ফুল পূজায় লাগান না লাগান এটা মানুষের উপরই নির্ভর করে। তোমা হেন ফুল পূজায় লাগান তোমার উপরেই নির্ভর করে। আর এও বলি বৌ, ফুল তুল্‌লাম পূজার জন্যই, কিন্তু যে পূজার জন্য তুলেছি সে পূজা যদি আগেই হয়ে যায় বা সে পূজা যদি না-ই হয়, সেই ফুল দিয়ে যদি অন্য দেবতাকে পূজা করি তবে কি ফুলের জন্ম সার্থক হলো না?

ভুবনমোহিনীর স্কন্ধে আজ যেন শনি চাপিল, বসন্তের কথা শুনিয়া

তাহার বড়ই হাসি পাইতে লাগিল। তাহার বসন্তের সঙ্গে একটু রসিকতা করিতে ইচ্ছা হইল। সে হাসিয়া বলিল, "আমি ফুল বটে, কিন্তু দিদি আমি পলাস ফুল, এফুলে গন্ধ নাই, দেবতার চরণে এফুল দিলে দেবতা সন্তুষ্ট হয় না।

বসন্ত হাসিয়া বলিল,— তুমি পলাস ফুল? গন্ধরাজ, জবা, গোলাপ, সব ফুলের সব গুণই তোমার মধ্যে সমাবেশ হয়েছে। ফুলের মাহাত্ম্য ফুলে কি বুঝ্‌বে? যে ফুল পায়, সে বোঝে কেমন ফুল পেয়েছি। তোমা হেন ফুল যদি কোনও দেবতা পায় তবে ত সে দেবতার পরম ভাগ্য। দেবতার মত দেবতা হলে তোমা হেন ফুলের পূজা পায়।

না দিদি, ফুল ত পূজায় দিয়েই ছিলাম, সে দেবতা তা অগ্রাহ্য করে দূরে ফেলে দিয়েছেন। তা হলে তোমার মতে দেখ্‌ছি আমারও দুর্ভাগ্য আমার দেবতারও দুর্ভাগ্য। এ উভয়েরই অদৃষ্ট দোষ।

না বৌ, অদৃষ্টের দোষ নয়, তুমি ফুল দেবতার চরণে দেও নাই, তা অপদেবতার চরণে দিয়েছিলে। দেবতার চরণে ফুল দেও, তখন দেখ্‌বে দেবতা গ্রহণ করে কি না। দেবতার মত দেবতা হলে ত ফুলের আদর বুঝবে।

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল,—না দিদি, এ ফুল দেবতাকেই দিয়ে ছিলাম, এখন এ ফুল উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, 'এখন এ ফুল অন্য দেবতা গ্রহণ কর্‌বে কেন?

তা হলোই বা। তুমি বৌ মুখ দিয়ে কথা বের কর, দেবতার মত দেবতা এনে দিব। রাজরাণী হয়ে থাকবে, সারাজীবন তোমার আর তোমার ছেলের কোনও কষ্ট হবে না, দেবতার মতই দেবতা পাবে।

বসন্ত বুঝিল, ভুবনমোহিনী অনেকটা বাঁকে আসিয়াছে। ভুবনমোহিনী তখন তাহার ভুল বুঝিল; বুঝিল, সে বসন্তকে বড় বেশী প্রশ্রয় দিয়া

ফেলিয়াছে, তাহার এতটা বলা ভাল হয় নাই, তাহার আত্মগ্লানি হইতে লাগিল। একবার তাহার মনে হইল, এখনই তাহাকে ঝাটা মারিয়া বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়; কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল,তাহার ত কোনও অপরাধ নাই, এ ত তাহার নিজেরই দোষ, সেই যে তাহাকে এ কথা বলিতে উৎসাহিত করিয়াছে। ভুবনমোহিনী যে কথা বলিয়াছিল, তাহাতে ত বসন্ত তাহাকে অনায়াসেই ঐ কথা বলিতে পারে। ভুবনমোহিনী বুঝিল, আর এ বিষয়ে বসন্তকে বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া সঙ্গত হইবে না। ভুবনমোহিনী বলিল,—না দিদি, আর পাপে কাজ নাই, পূর্ব্ব জন্মে না জানি কত পাপ করেছিলাম, তার ফল ভোগ এ জীবনে কচ্ছি; আবার এ জীবনে পাপ করব, আর জন্মে তার ফল ভোগ করতে হবে। আর পাপকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল।

বসন্তও এ ক্ষেত্রে অতি সুনিপুণা। সে জানে প্রথম দিবসে বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নহে। আজ এইখানেই এই পালা শেষ করা কর্ত্তব্য। বসন্ত ভুবনমোহিনীর সঙ্গে অন্য বিষয়ে আরও কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া চলিয়া গেল।

বসন্ত চলিয়া গেলে, ভুবনমোহিনী মনে মনে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—দেখে যাও, আজ তোমার ঘরে বসিয়া তোমার সহধর্ম্মিণী, তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী কি অপমানের কথা, কি জঘন্য কথা, কি গ্লানির কথা শুনিল! তুমি যদি আজ দশ জনের মত হইতে তবে সাধ্য কি আজ ঐ কুলটা রমণী তোমার স্ত্রীকে আজ এই জঘন্য কথা বলিতে পারে, তোমার স্ত্রীর নিকট আজ সেই জঘন্য প্রস্তাব করিতে সাহস পায়? যাহার স্বামী বিরূপ, তাহার উপর বিশ্ব সংসারই বুঝি বিরূপ।—সে চিন্তা-সাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতেছিল, সে যেন সেই চিন্তা-সাগরের কোনও কূলকিনারা পাইতেছিল না। তখন দিশাহারা নাবিকের ন্যায়

হাল ছাড়িয়া বলিল,— নিয়তি দেবি, আমায় কোথায় নিয়া যাইতেছ; অদৃষ্টে কি আরও বিড়ম্বনা আছে ?

সেই সময় নিদ্রিত শিশু কাঁদিয়া উঠিল, ভুবনমোহিনীর চিন্তাস্রোতে বাঁধা পড়িল। সে স্বামীর চিন্তা ত্যাগ করিয়া পুত্রের যত্নে নিযুক্ত হইল। সারাদিনই তাহার বসন্তের কথাগুলি মনে উদয় হইতে লাগিল, তাহা যেন তাহার নিকট সর্পদংশনের জ্বালার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাহাকে আজ অসহায়া পাইয়া যে যাহা বলিতে সাহস পাইতেছে! তাহার যে স্বামী থাকিতেও নাই। সে আজ অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া তাহার অসহায় অবস্থা বিশেষভাবে বুঝাইয়া স্বামীর নিকট চিঠি লিখিল। চিঠি লিখিয়া এবার সে মনে করিল, এই চিঠি পাইলে তাহার স্বামী নিশ্চয়ই বাড়ী আসিবেন। আশা মরীচিকা। নিশিকান্ত ভুবনমোহিনীর চিঠি পাইল সত্য, কিন্তু ভুবনমোহিনীর বিষয় তাহার চিন্তা করিবার ত অবসর ছিল না, সুতরাং ভুবনমোহিনী নিশিকান্তের দেখা পাওয়া দূরে থাকুক, তাহার চিঠির উত্তরও পাইল না।

(১৬)

লোকে যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, নিয়তি দেবী যেন সময়ে সময়ে তাহা পূরণ করাইয়া দেন। বসন্ত সর্ব্বদাই সুযোগ খুঁজিতেছিল, আবার কেমন করিয়া ভুবনমোহিনীর নিকট তাহার পূর্ব্ব প্রস্তাব উত্থাপন করিবে। সে সুযোগ অতি সহজেই তাহার মিলিয়া গেল। বসন্তের সহিত ভুবনমোহিনীর আলাপের কতক দিবস পরেই রামচন্দ্রের ভগিনী বড় পীড়িতা হইয়া পড়িল। সংবাদ আসিল, তাহার জীবন সংশয়; রামচন্দ্রের মাতা তাহাকে দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া পড়িল। ভুবনমোহিনী তাহার শিশু পুত্রকে নিয়া রাত্রিতে একা শুইতে পারে না, এই জন্য রামচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনীর নিকট শয়ন করিত। যখন রামচন্দ্রের ভগ্নীর কাছে রামচন্দ্রের মাতার যাইবার কথা উঠিল, তখন এক সমস্যা উঠিল, ভুবনমোহিনীর নিকট রাত্রিতে শোয় কে? বহু চিন্তার পর রামচন্দ্রের মাতা প্রস্তাব করিল, 'আমি ত না যেয়ে পারি না মা, যে কয় দিন আমি না আসি, সে কয় দিন না হয় বসন্ত এসে রাত্রিতে রাত্রিতে তোমার এখানে শোবে। কয়েকটা দিন বহুত নয়।

বসন্তের নাম শুনিয়াই ভুবনমোহিনীর শরীর শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু কি করিবে? সে যে নিতান্ত অসহায়, নিরুপায়, রামচন্দ্রের মাতা যে এতদিন তাহার নিকট শুইত, ইহাই যে তাহার প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহ। প্রকৃত পক্ষেই রামচন্দ্রের মাতা যে না যাইয়া পারে না, তাহার কন্যা যে অত্যন্ত

পীড়িতা শিশু পুত্রকে নিয়া রাত্রিতে একা শয়ন করা অপেক্ষা যে বসন্তকে নিয়া রাত্রিতে শয়ন করাও শ্রেয়ঃ। এমন লোক আর কে আছে যে, তাহার সংসার ফেলিয়া রাত্রিতে আসিয়া ভুবনমোহিনীর নিকট শয়ন করিতে পারিবে? কিন্তু বসন্তকে নিয়া শয়ন করিতেও যে তাহার সাহস হইতেছিল না, তাই রামচন্দ্রের মাতার প্রস্তাবে সে সহসা কোনও উত্তর দিতে পারিতেছিল না।

রামচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনীর নিরুত্তরের কারণ বুঝিতে পারিল। বসন্তের চরিত্রের বিষয় তাহার নিকটও অবিদিত ছিল না। সে বলিল 'কি কব্‌ব মা, আমার নেহাত ঠেকা বলেই আমি দিন কয়েকের জন্য যাচ্ছি. যত শীগ্‌গির পারি আমি চলে আস্‌ব। আর ত কোনও লোক পাচ্ছিলা না আমি চেষ্টা ত কম করিনি। তুমি আমার মেয়ের মত, তোমার মান অপমান আমি দেখব বই কি? বসন্তের চরিত্রের কথা আমি জানি, তবে কি জান মা, নিজে যদি ভাল থাক, জগতে এমন লোক নাই যে তোমাকে মন্দ করতে পারে। সবই নিজের উপর নির্ভর করে। এ কয়টা দিন বসন্তকে নিয়েই থাক, খুব সাবধানে থাক্‌বে। আমার মেয়েকে একটু ভাল দেখলেই আমি চলে আস্‌ব। যদি পারি গকুলকে আমি আগেই পাঠিয়ে দিব, রামাকেও বলে যাব এখন, সে যেন দিন রাত তোমার খবর নেয়। আর মা, এমন কপালও করে এসেছিলে, এমন লক্ষ্মীর মত স্বভাব তোমার, যেমন রূপ তেমনি গুণ, তোমাকে ফেলে, এমন সোণার চাঁদ ছেলে ফেলে ছোট বাবু কোথায় যেয়ে রইলেন!'

ভুবনমোহিনী বলিল,—আর মা, সে বিষয়ে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। আমার কপালে যে আর তার দর্শন পাই এমন মনে হয় না। যাবে না তুমি, অবশ্য যাবে। আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। তুমি আমাকে মেয়ের মত দেখ বলে, রামচন্দ্র গকুলচন্দ্র আমাকে বোনের মত দেখে

বলেই আমি এতদিন নিরাপদে আছি। তা না হলে আমার উপায় কি হত, তা মনে পড়লেও আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠে। আচ্ছা, তুমি যাও, আমি এ কয়দিন বসন্তকে নিয়েই থাক্‌ব। ভগবান তোমার মেয়েকে আরাম করুন। আর মা ভয়ের কথা বল্‌ছ? বসন্তকে নিয়ে শুতে ভয় করে কি কর্‌ব মা, সাগরে যার শয্যা, শিশিরে তার ভয় কি?

রামচন্দ্রের মাতা বলিল,—মা, তোমাকে ফেলে যেতে আমার প্রাণ কাঁদছে, তোমাকে যে আমার মেয়ের মতই লাগে। তোমার মত একটি লক্ষ্মী মেয়ে যে আমি জীবনে দেখি নাই। আমার মেয়েকে একটু ভাল দেখ্‌লেই আমি চলে আস্‌ব। কিছু ভয় নাই, উপরে ভগবান আছেন, বিপদে একমাত্র উপায় মধুসূদন।

রামচন্দ্রের মাতার, রামচন্দ্রের ও তাহার ভ্রাতা গকুলচন্দ্রের ব্যবহারে প্রকৃত পক্ষেই ভুবনমোহিনী মোহিত হইয়া গিয়াছিল। তাহারা ভুবনমোহিনীর সহিত এমন ব্যবহার করিত, নিতান্ত আপনার জন হইলেও বুঝি এমন ব্যবহার করে না। ভালবাসার গুণে, স্বভাবের মাধুর্য্যে নিতান্ত পরকে ভুবনমোহিনী নিতান্ত আপনার করিয়া নিয়াছিল।

রামচন্দ্রের মাতা তাহার মেয়েকে দেখিতে চলিয়া গেলে, বসন্ত আসিয়া ভুবনমোহিনীর নিকট রাত্রিতে শয়ন করিতে লাগিল। এই ভাবে দিন কয়েক যাওয়ার পরেই বসন্ত ভুবনমোহিনীর নিকট শুইয়া শুইয়া গল্পচ্ছলে বলিল,—বৌ, কতকাল আর এভাবে কাটাবে?

ভুবনমোহিনী বলিল,—কি কর্‌ব দিদি? তিনি না এলে কি কর্‌ব? আমি যে ভাঙ্গা কপাল নিয়েই এসেছি। ভুগ্‌বার কপাল আমার, ভুগেই আমি যাব।

বলি, ভাঙ্গা কপাল কি আর জোড়া লাগে না? ইচ্ছা করলে তোমার কপাল ত দুদিনেই ফিরিয়ে ফেল্‌তে পার, তোমার সে দিকে মন নাই।

ভুবনমোহিনী তখন তাহার স্বামীর কথা চিন্তা করিতেছিল, সে অন্য-মনস্কভাবে বলিয়া ফেলিল,—সে কি রকম ?

বসন্ত হাসিয়া বলিল,—নেকা রে আমার, তিনি যেন আর কিছুই বোঝেন না! বল না কেন, দুদিনেই তোমাকে রাজরাণী করে দিই ?

বসন্তের কথা ভুবনমোহিনীর কর্ণে প্রবেশ করামাত্রই ভুবনমোহিনীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, সে বুঝিতে পারিল বসন্ত কোন্ বিষয় বলিতেছে। ভুবনমোহিনী বসন্তকে সেদিকে আর অগ্রসর হইতে দিতে অত্য ইচ্ছুক ছিল না, সে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইল। সে বলিল,—যাক্, সে বিষয়ে আলোচনা করে কাজ নাই। নিজের স্বামীদ্বারা যদি কপাল না ফিরে, তবে কি আর অন্যের দ্বারা কপাল ফির্‌বে ? এখন রাত হয়েছে ঘুমাও।

ভুবনমোহিনী এ কথা বলিয়াই চুপ করিয়া রহিল। বসন্তও দেখিল, এ বিষয়ে আজ আর আলোচনা করা বৃথা। সুতরাং সেও চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

বসন্ত বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ভুবনমোহিনীকে তাহার বাঁকে আনিতেই হইবে। সে দুই তিন দিন পরে পরেই নিশিকান্তের চরিত্রের বিষয় উল্লেখ করিত, তাহার নিন্দার একশেষ করিয়া তাহার কুপ্রস্তাবটি ভুবন-মোহিনীর নিকট উত্থাপন করিত, ভুবনমোহিনী তৎক্ষণাৎ অন্য কথা উত্থাপন করিয়া তাহা চাপা দিয়া রাখিত। এইরূপে আরও দশ বার দিবস চলিয়া গেল। বসন্তের ধ্রুব বিশ্বাস আছে, তাহার শিকার বাঁকে আসিবেই, তবে তাহা সময়-সাপক্ষ।

দশ পনর দিবস চলিয়া যাওয়ার পর বসন্ত ভুবনমোহিনীকে এক রজনীতে বলিল,—আজ নরেন্দ্র বাবুর সাথে দেখা হয়েছিল, তিনি বল্‌ছিলেন কি জান ? যদি তুমি তার কথায় রাজি হও, তবে তিনি তোমার ছেলের নামে দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কিনে দিবেন, আর তোমাকে ত

রাজরাণীর মত রাখ্‌বেনই। আমি বল্‌লাম, থাম্‌কা আমাকে জ্বালাতন করবেন না, আমাদের বামন-বৌ তেমন মেয়ে নয়।

ভুবনমোহিনীর স্কন্ধে আজ আবার দুষ্ট-শনি আরোহণ করিল। সে হাসিয়া বলিল,—সত্যি? নরেন্দ্র বাবুর এত টাকাই আছে?

বসন্ত বলিল,—বল কি, নরেন্দ্র বাবুর টাকার কি আর হিসাব আছে? এমন বড় লোক ত এ দেশেই নাই। তুমি মুখ দিয়ে কথা বের কর, আজ রাত্রির মধ্যেই দেখ্‌বে আমি হাজার হাজার টাকা এনে হাজির করি।

পার্‌বে?

তুমি কথা দেও, এখনই পার্‌ব।

থাক্, আজ না, আর এক দিন। আজ রাত্রি হয়েছে ঘুমাও।

ভুবনমোহিনী আর কথা বলিল না, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, রামচন্দ্রের মাতা এখনও আসে না কেন? বসন্তকে নিয়া তাহার থাকা যে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার কাণ যে রোজ অপবিত্র হইয়া যায়, তাহার জীবন যে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার যে বসন্তকে নিয়া থাকাও অসম্ভব, অথচ তাহার অন্য উপায়ও নাই। এখন সে কি করিবে, কোথায় যাইবে? সে বহুক্ষণ শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিল, আর উপায়ান্তর না দেখিয়া আবার নিয়তির উপর নির্ভর করিল, কিছুক্ষণ বাদে ঘুমাইয়া পড়িল।

বসন্ত ভুবনমোহিনীর কথায় মনে করিল, ভুবনমোহিনী রাজি হইয়াছে, এখন নরেন্দ্র বাবু টাকা ব্যয় করিলেই ভুবনমোহিনীকে পাইতে পারে। সে যেন তখন বিজয়-গৌরব অনুভব করিতে লাগিল। কোনও কার্য্য করিতে পরিশ্রম যত বেশী হয়, কার্য্য সফল হইলে আনন্দ তত বেশী হয়। মনের আনন্দে আজ আর বসন্তের ঘুম আসিতেছিল না। বসন্ত তখন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল, এখন সে নরেন্দ্রনারায়ণ হইতে কি পুরস্কার

পাইতে পারে, পুরস্কারের কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহার প্রাণ আনন্দে নাচিতে লাগিল।

তৎপর দিবস অতি প্রত্যুষে বসন্ত নিদ্রা হইতে উঠিয়া একেবারে নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট যাইয়া হাজির হইল। আজ তাহার সুপ্রভাত। নরেন্দ্রনারায়ণকে সে বাহির বাড়ীতেই পাইল। বসন্তকে দেখিয়া নরেন্দ্রনারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিল,—বলি, আজ ভোর বেলাই বসন্তের আগমন! আজ ভোরেই বসন্তের দেখা, সারাদিন যে আমার জীবনে বসন্তের খেলাই খেলবে। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পাচ্ছি, কি যেন সুখবর এনেছ।

বসন্ত হাসিয়া বলিল,—কি বক্‌সিস দেবেন বলুন? আজ যা খবর এনেছি তার দাম লাখ টাকা;

বসন্তের হাব ভাব, কথার ভঙ্গি দেখিয়াই নরেন্দ্রনারায়ণ বুঝিতে পারিল, বসন্ত কি বিষয়ে বলিতেছে, সে বলিল,—আমি যে খবর চাই, সে সুখবর যদি দিতে পার, তবে তুমি যে পুরস্কার চাও তাই দেবো। আমার সমস্ত জমিদারি পণ।

আচ্ছা, আমি সে সুখবরই দিবো, এখন আমার বায়না স্বরূপ দুশ টাকা এনে দিন, তারপর সুখবর পাবেন। আর আপনি কাজ ফতে করে আমায় আরও তিনশ টাকা দেবেন।

সব ঠিক, দেখো?

সব ঠিক।

সত্যি?

সত্যি না কি মিথ্যা? বসন্ত যে কাজে লাগে তা কি ফতে না করে আর সে আসে?

আচ্ছা, তুমি বসো, আমি এখনই তোমার সুখবরের বায়না দুশ টাকা নিয়ে আসছি।

বসন্তকে বৈঠকখানায় বসাইয়া নরেন্দ্রনারায়ণ তাহার চেষ্টড্রয়ার খুলিয়া দুইশত টাকা আনিয়া বসন্তের হাতে দিয়া বলিল, বসন্ত এখন সবিশেষ বলে আমার উৎকণ্ঠিত প্রাণ ঠাণ্ডা কর। আমি যে সে খবরটি শুনবার জন্য পাগল হয়ে আছি।

বসন্ত তখন ভুবনমোহিনীর সহিত তাহার যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সবিশেষ নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট বর্ণনা করিয়া বলিল,—দেখলেন ত, আমি শিকার বাঁকে এনেছি কি না? বসন্তের অসাধ্য কাজ কিছুই নাই। বাবা, একে পটান কি সহজ কাজ? কত প্রলোভন দেখিয়ে, নিশিকান্তের বিরুদ্ধে কত কথা বলে, কত উপমা দিয়ে তবে ত শিকার বাঁকে এনেছি। বেটা আবার নেকামী করে? মনে মনে ত বল্‌ছে এখনই পেলে বেঁচে যাই, আবার মুখে বল্‌ছেন, এখন না থাক্, আর একদিন। রূপ যৌবন নিয়ে পুড়েমরা কি সহজ কথা? যে ভুক্তভোগী সে জানে। নেকী লো আমার! এখন নিন্, ভুবনমোহিনীকে অঙ্কলক্ষ্মী করে প্রাণ মজিয়ে আনন্দ উপভোগ করুন। আর বল্‌ব কি বাবু, বেটী সুন্দরীও, এমন সুন্দরী আর হতে নাই, ঠিক যেন পটে আঁকা, ঠিক যেন ছাঁচে ঢালা, কোনও জায়গায়ই ত এক ছিটে খুঁত নাই। মনে হয় বিশ্বকর্ম্মা তার সমস্ত বিদ্যাই ওকে সৃষ্টি করবার সময় জাহির করেছে, ওকে দেখ্‌লে তার নির্ম্মাণ-কৌশলের বাহাদুরি দিতে হয়। কিবা তার রং, কিবা তার শরীরের গড়ন, কিবা তার চোখ, কিবা চোখের ভ্রূ, কিবা হাত পা, কিবা চুল, কিবা তার ঠোট দুখানি, কিবা তার মুখের আকৃতি, কিবা তার অঙ্গ সৌষ্ঠব, মনে হয় যেটি যেখানে দরকার তার সবটুকুই সব জায়গায় আছে; এখন শ পাঁচ ছয় টাকা নিয়ে একদিন চলুন।

বসন্তের মুখে ভুবনমোহিনীর বর্ণনা শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্রনারায়ণের প্রাণ নাচিয়া উঠিতে লাগিল, সে বলিল,—সত্যিই এত সুন্দরী?

সুন্দরী, সুন্দরী বলে সুন্দরী! তার রংএর কাছে সবরিকলা, অতশি ফুলও পরাস্ত পায়, তার চ'খের কাছে পটল-চেরা চোখও পরাস্ত পায়, তার মুখের আকৃতির কাছে কুমারের তৈরী প্রতিমার মুখও পরাস্ত পায়, চুল তার প্রায় পা পর্য্যন্ত পড়ে, ঠোট দুখানা যেন সর্ব্বদাই হাস্‌ছে, আল্‌তার মত ঠোট দুখানা টুকটুকে, মনে হয় এ মানুষ নয়, এ একটি পটে আঁকা ছবি, মনে হয়—

নরেন্দ্রনারায়ণ বসন্তকে আর বলিতে না দিয়া বাঁধা দিয়া বলিয়া উঠিল,— বসন্ত, তোমার পায়ে পড়ি, আমি পাগল হয়ে যাব, আমায় আর ক্ষেপিও না, আমি আর আমাতে নাই। আমার সর্ব্বস্ব পণ, আমার সমস্ত জমিদারি তার পায় ঢেলে দিব। এখন কবে যাব বল?

আপনার যে দিন ইচ্ছা, টাকা হাতে করে নিয়ে চলুন, পাখী আপনার হয়ে যাবে।

আমার আবার ইচ্ছা কি? আমি ত এখনই যেতে চাই, আমার কি সবুর সয়? তুমি আমার অবস্থা বুঝতে পাচ্ছ না, আমার প্রাণ যে ভুবনমোহিনীর কাছে উড়ে গেছে, এই যে দেহটা দেখ্‌ছ, এত শুধু খোসাটা পড়ে আছে। টাকার কথা কি বল? না হয় আমি ৭০০।৮০০ শত টাকা নিয়েই যাব। আমি তাকে চাই-ই।

তা হলে চলুন, আজই যাওয়া যাক্, দেরী করে আর কাজ কি? দেখ্‌বেন আমার পুরস্কারের কথা কিন্তু ভুল্‌বেন না।

'বল কি বসন্ত, আমি কি এতই অকৃতজ্ঞ? তোমাকে কি আমি ভুল্‌তে পারি? আজ থেকে আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে রইলাম। কাজ সমাধা হলে তোমায় আশাতীত পুরস্কার দিব। তুমি চাচ্ছ তিনশ, তার অনেক বেশীই পাবে।' তৎপরে হাসিয়া বলিল, 'আর এও দেখো বসন্ত, আমার বুদ্ধিকেও তোমার প্রশংসা করতে হয়, নিশিকান্তকে কেমন

করে পথ থেকে সরিয়েছি, আর তাকে সেখানে কেমন করে মজিয়ে রেখেছি।'

তা ত নিশ্চয়ই বাবু, আপনার কৌশলের জন্যই ত কাজটা হাসিল করতে পেরেছি। নিশিকান্ত এখানে থাকলে কি আর একাজ হতো? নিশিকান্তের আশা ছেড়ে দেওয়াতেই ত সে রাজি হলো। তা হলে আজ রাত্রিতেই যাওয়া ঠিক; আমি ত তাকে নিয়ে রাত্রিতে শুয়ে থাকব, আপনি শ পাঁচ ছয় টাকা সঙ্গে নিয়ে রাত্রি এগারটা বারটার সময় আমাদের ওখানে যাবেন, আমি সজাগ থাকব, আপনি গিয়ে ঘরের দরজায় টোকা মারবেন, আমি প্রদীপ জ্বালিয়ে দরজা খুলে দিব। আমি সরে পড়ব, আপনি ঘরের ভিতর যেয়ে আপনার কাজ সমাধা করবেন। প্রথমে সে একটু নেকামি করতে পারে, মেয়েটা একটু লাজুক, তারপর আপনি বাঁকে আসবে। আপনি একটু কৌশলেই কাজ করবেন। শত হলেও গেরস্থের বৌ, লজ্জা ভাঙ্গতেও একটু সময় লাগে। আপনি তাকে অনেক প্রলোভন দেখাবেন, আপনি পথে আস্‌বে। আমি একটু আড়ালে থাক্‌ব। কেমন?

'আরে, সে বিষয় তুমি চিন্তা কোরো না, ঘরে ঢুকতে পারলে আমার কাজ আমিই করে নিব। একাজে আমি ত আর নূতন ব্রতী নই? জান ত বসন্ত, এ বিষয়ে আমি রীতিমত একজন ওস্তাদ, সে বিষয়ে আমি সম্ভব তোমার সার্টিফিকেট পেতে পারি! কত গেরস্থের বৌ দেখ্‌লাম, কত সতী দেখ্‌লাম, এ হাতে পড়লে সব ঠিক হয়ে যায়।' তৎপরে হাসিয়া বলিল, 'আমাকে রমণীরঞ্জন বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। কেমন?'

না, সে বিষয়ে কি আর ভুল আছে? রমণীদের রঞ্জন করার জন্যই ত আপনার জন্ম। সার্থক জন্ম আপনার! কলিকালের সাক্ষাৎ মহাপুরুষ আপনি!

ঠাট্টা কোরো না বসন্ত, মহাপুরুষ না হই, সুপুরুষ ত ? সে বিষয়ে সম্ভব ভুল নাই ?

তা নিশ্চয়ই, আপনি মহাপুরুষও সুপুরুষও। আপনার মত দুনিয়াতে আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। এখন আমি তবে যাই, আপনি তা হলে আজ রাত্রিতে ঠিকঠাক হয়ে আস্‌বেন, আমিও তৈরী হয়ে থাকব, দেখ্‌বেন, কি জিনিষ আপনাকে ঘটিয়ে দিয়েছি।

আচ্ছা, আমি ঠিকঠাক হয়েই যাব।

বসন্ত চলিয়া গেল, নরেন্দ্রনারায়ণ ভুবনমোহিনীর রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। তাহাকে পাইলে সে কেমন করিয়া কোথায় নিয়া থাকিবে, কেমন স্ফূর্ত্তিতেই দিন কাটাইবে, দিন রাত হরদম স্ফূর্ত্তি! ভুবনমোহিনীর কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহার প্রাণ নাচিতে লাগিল। সে আর নিজকে সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না, প্রাণকে সাময়িক ভাবে সন্তোষ করিবার জন্য চেষ্টড্রয়ার হইতে মদের বোতল খুলিল, মনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া সুরাদেবীর আরাধনা করিতে লাগিল।

বসন্তকে নিয়া শয়ন করিতে ভুবনমোহিনীর সর্ব্বদাই ভয় হইত, সেইজন্য সে প্রতি রাত্রিতেই তাহার বিছানার নীচে একখানা অতি ধারাল রাম দাও নিয়া শয়ন করিত। মনে মনে সংকল্প করিত, ভয় কি, জীবন থাকিতে তাহার উপর কে অত্যাচার করিবে ? আত্মরক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই সে প্রস্তুত হইয়া শয়ন করিত।

সেই দিবস রাত্রিতে বসন্ত তাহার নিকট শয়ন করিতে আসিলে, বসন্ত তাহাকে কথায় কথায় বলিল,—বামন-বৌ রামচন্দ্রের মার কোনও খবর পেলে ? সে মাগি ম'ল নাকি ? বল ত কত দিন আর আমি আমার ঘর ছেড়ে পড়ে থাকি ?

ভুবনমোহিনী বলিল,—তার মেয়ের নাকি ব্যারাম বেড়েছিল শুনেছি,

তার আস্‌তে আরও দিন কয়েক দেরী হতে পারে। তোমার উপকার আমি জীবনে ভুল্‌তে পার্‌ব না। বাস্তবিকই তোমাদের দশ জনের কৃপায় আমি এই শিশু সন্তান নিয়ে এই ভাবে জীবন কাটাচ্ছি, তা না হলে কি এ রকম ভাবে একলা কেউ থাক্‌তে পারে ?

বসন্ত বলিল,—না, এ আর একটা কৃপা কি, এ ত কর্ত্তব্য কাজ, বিপদে আপদে সাহায্য না করলে পাড়াপড়শি থাকে কেন ?

না দিদি, এমন অসময়ও লোকের হয় ? কোন দিকে যে পথ দেখি না ; আমার ভবিষ্যৎ যে একেবারে অন্ধকার !

না বৌ, ও কথা বোলো না, সময় অসময় সকল লোকেরই আছে। আজ তুমি অসময়ে পড়েছ, কালই হয়ত তুমি রাজরাণী হবে। তখন তোমার পা টিপ্‌বে শত শত লোক। একদিনের মধ্যে অন্ধকার কেটে যেয়ে আবার ফুটফুটে জ্যোৎস্না হবে, পূর্ণিমার রাত্রির মত তোমার জীবন আলোকিত হয়ে উঠ্‌বে।

আমার জীবনে আবার পূর্ণিমা হবে ? যদি হতেও চায় তবে সমস্ত আকাশ মেঘে ভরা থাকবে, চাঁদের আলো আর মেঘ কেটে বের হতে পার্‌বে না।

তা বোলো না বৌ, মেঘও যদি আসে, প্রকাণ্ড এক ঝড় এসে এক মুহূর্ত্তে সেই মেঘকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। তোমার জীবনে সেই পূর্ণিমার দিন এসেছে বউ, আমি বল্‌ছি, তখন এ গরীব বেচারিকে কিন্তু ভুলো না, গরীবের কথা যেন মনে থাকে।

আমার জীবনে আবার জ্যোৎস্না হবে, এ যে চির অন্ধকারময়, জন্মের থেকেই আঁধার চলছে, মরণ পর্য্যন্ত আঁধারই চলবে। আমার কপাল কি আর জুড়্‌বে ? ভাঙ্গা কপাল কোনও দিনই জোড়া লাগে না।

দেখ না, তোমার ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগাই কিনা, তোমার সুখের দিন এসেছে।

ভুবনমোহিনী আর কথা না বলিয়া শুইয়া শুইয়া তাহার অতীত, ভবিষ্যৎ জীবনের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল, চিন্তা করিতে করিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

বসন্ত আজ আরশুমায় নাই। সে উৎসুক চিত্তে নরেন্দ্রনারায়ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আজও ভুবনমোহিনীর কথায় সে স্পষ্ট বুঝিল, সে তাহার কথায় সম্মত আছে, লজ্জায় মুখ ফুটিয়া সব কথা খুলিয়া বলিতে পারে না, উপযুক্ত অর্থ পাইলেই সে আত্ম বলিদান করিতে প্রস্তুত।

রাত্রি প্রায় দুপ্রহর। সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ। আরাম দায়িনী, সর্ব্ব-দুঃখ-হারিণী নিদ্রাদেবী পৃথিবীর জীবজন্তুর শোক দুঃখ হরণ করিয়া তাহাদিগকে আরাম দিতেছেন, মাঝে মাঝে দু একটি পেচক পক্ষী তাহাদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে জাহির করিতেছে।

হে নিশীথ সহচরি নিদ্রাদেবি, হে সর্ব্ব-চিন্তা-হারিণি, সর্ব্ব-দুঃখ-নিবারিণি নিদ্রাদেবি! তোমার অপার মহিমা আমা হেন ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে বোঝা বড় দায়, আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে তোমার মাহমা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, বামন হইয়া চাঁদ ধরা অপেক্ষাও অত্যধিক অসম্ভব। যদি কালিদাস, ভবভূতি, সেক্ষপিয়ার, ডান্টি, হোমার, গেটে, ভার্জ্জিল, কিংবা একান্তপক্ষে মধুসূদন, বঙ্কিম, নবীন, হেম, রবীন্দ্রনাথ তোমার মহিমা বর্ণনা করিতে যাইতেন, তাহা হইলে তাহা বা কতকটা সম্ভবপর হইত, আমি হেন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে তোমার মহিমা বর্ণনা করা কি সম্ভবে? তবে তাহা করিতে যাইতেছি কেন জান? প্রথমতঃ নিতান্ত দুরাশায় প্রণোদিত হইয়া, দ্বিতীয়তঃ আমি তোমার একজন প্রধান সাধক, তোমার মহিমা আমি অনেকবার হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি বলিয়া।

হে অসীম-প্রতাপ-শালিনি! তোমার মোহ-রাজ্য পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তোমার এই রাজ্যে চিরবসন্ত বিরাজিত। তোমার এই রাজ্যে ছোট, বড়, জ্ঞানী, গুণী, রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র সকলেই সমান। তোমার এই রাজ্যে পশু, পক্ষী, জীব-জন্তু সকলেরই একই অবস্থা। তুমি যদি নিদয়া হও তবে পশু,পক্ষী, জীব, জন্তুর সকলের অবস্থাই অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। তোমার লীলা বোঝা ভার, কখনও সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া সমস্ত রজনী তোমার উপাসনা করিয়াও তোমার দেখা পাই না, আবার কখনও সামান্য মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া অতি কষ্টে ভূমিশয্যায় দেহ পাতিত করিয়াও তোমার দর্শন পাইয়া মোহ সাগরে ডুবিয়া থাকি। তোমার দর্শন যে পায় না, তাহার মত হতভাগ্য প্রাণী আর জগতে নাই। হে অসীম-প্রতাপ-শালিনি নিদ্রাদেবি! তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

অমাবস্যা রজনী, ভীষণ অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ভীষণ কার্য্য করিবার উপযুক্ত রজনী। আকাশে একটি তারাও নাই, মাঝে মাঝে দুই একবার মেঘ গর্জ্জন হইতেছে, প্রেত, প্রেতিনীর তাণ্ডব নৃত্য করিবার উপযুক্ত রজনী। মাঝে মাঝে একটা ভূতুম পেঁচা আসিয়া ভুবনমোহিনীর ঘরের চালের উপর বসিয়া ডাকিতেছিল, "ভূত, ভূতুম।" অমনি বসন্তের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। আজ যেন "স্বভাবই" জগৎ মধ্যে প্রচার করিতেছে, একটা ভীষণ কাজ অদ্য রাত্রিতে সংঘটিত হইবে।

বসন্ত উৎসুক চিত্তে নরেন্দ্রনারায়ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মেঘ গর্জ্জন, ভূতুম পেঁচার ডাক শুনিয়া বসন্তের মনে প্রকৃতই একটা অমঙ্গল ডাক ডাকিতে লাগিল, আজ যেন কি ভীষণ কার্য্য হইয়া যায়। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল, এ কার্য্যে হাত না দেওয়াই বুঝি তাহার ভাল ছিল, আবার মনে করিল, এতদূর সে অগ্রসর হইয়াছে এখন

আর পশ্চাৎপদ হওয়া যে একেবারে অসম্ভব। তখন বার বার তাহার মনে হইতে লাগিল, এখন নরেন্দ্র বাবু আসিলেই সে বাঁচে, এই ভাবে রাত্রি কাটানও তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল।

ভুবনমোহিনী তাহার শিশু পুত্রকে নিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। ভুবনমোহিনীর ঘরে টোকার শব্দ হইল, বসন্ত যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে নিঃশব্দে প্রদীপ জ্বালাইল। ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "সব ঠিক কোনও ভয় নাই, আজও তার সম্মতি জানিয়েছে, আপনি এখন ঘরে যান। গিয়ে আপনার কাজ করুন। আমি একবার আমার বাড়ী থেকে আসি।"

এই কথা বলিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিল, দেখিয়াই যেন তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল, বলিল, "বাবা, কি দুর্যোগ আজ, কি অন্ধকার করেছে।" ইহা বলিয়াই বসন্ত চলিয়া গেল।

আসিবার সময় নরেন্দ্রনারায়ণ এক বোতল মদ সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া আসিয়াছিল, যেন এই বীরোচিত কার্য্য করিতে কোনও দ্বিধা বা সংকোচের ভাব মনে না আসে। বসন্ত চলিয়া গেলে নরেন্দ্রনারায়ণ ভুবনমোহিনীর ঘরে ঢুকিল। সে ভুবনমোহিনীকে দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল, দেখিল বসন্তের ভুবনমোহিনীর রূপ বর্ণনার এক বর্ণও মিথ্যা হয় নাই, বরং কিছু ত্রুটি হইয়াছে। বাস্তবিকই এমন সুন্দরী সে জীবনে দেখে নাই। সে নির্নিমেষ নয়নে ভুবনমোহিনীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার মস্তক যেন ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। একবার তাহার মনে হইল, এখনই যাইয়া ভুবনমোহিনীকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া আনে, আবার তাহার সেই দণ্ডেই মনে হইল,—না, প্রথমেই এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সবুরে মেওয়া ফলে। ঠিক সেই সময়ে ভূতুম পেঁচা ভুবনমোহিনীর ঘরের উপর বসিয়া ডাকিল, "ভূত্ ভুতুম।" নরেন্দ্রনারায়ণের এখন মদের নেশা

হইতেছিল, তথাপি ভুতুম পেঁচার ডাক শুনিয়া তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহারও প্রাণে যেন কি এক অমঙ্গল আশঙ্কা উপস্থিত হইল। কিন্তু সেই ভাব ক্ষণকালের জন্য উপস্থিত হইয়া অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়া গেল; ভুবনমোহিনীর প্রতি আবার দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার রূপ তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল।

ভুবনমোহিনীর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, সে ধীরে ধীরে যাইয়া ভুবনমোহিনীর গাত্র স্পর্শ করিল। ভুবনমোহিনী শিহরিয়া চমকিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল, বুঝি বা সে এমনই এক অমঙ্গল স্বপ্ন দেখিতেছিল। চক্ষু মেলিয়া দেখে, একজন পুরুষ তাহার ঘরে। সে যেন তাহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, মনে হইল সে বুঝি স্বপ্নই দেখিতেছে, সে তাহার চক্ষুদ্বয় রগড়াইতে লাগিল। তখন নরেন্দ্রনারায়ণ অতি মৃদুস্বরে বলিল, তুমি অমন কচ্ছ কেন? আমি ত তোমার কথাতেই এসেছি, এখন এস, আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ কর। এই নেও তোমার জন্য আমি ৮০০৲ শত টাকা এনেছি। আজ আমায় খুসী কর, কালই তোমার ছেলের নামে দশ হাজার টাকার কোম্পানি কাগজ লিখে দিব, তোমাকে রাজ-রাণীর মত সারা জীবন রাখব। আমার সমস্ত জমিদারির মালিক তুমিই হবে। এস, আর দেরী কোরো না।

ভুবনমোহিনী বুঝিতে পারিল, এ স্বপ্ন নহে বাস্তব ঘটনা। সে বুঝিল, এ দুর্ব্বৃত্ত নরেন্দ্রনারায়ণ। সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। নরেন্দ্রনারায়ণের মুখ হইতে তীব্র মদের গন্ধ বাহির হইতেছিল। এক্ষণে বসন্তের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা তাহার স্মরণ পথে উদিত হইল। সে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ ভুবনমোহিনীকে মৌন থাকিতে দেখিয়া মনে করিল, সে বুঝি লজ্জায় তাহার প্রস্তাবে অবিলম্বে সম্মত হইতেছে না। নরেন্দ্র-

নারায়ণ বলিল, "আর দেরী কেন হৃদয়েশ্বরি? আমার প্রাণের ভিতরে এসে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।" সে তখন পূর্ণ মাতাল, এই কথা বলিয়াই সে ভুবনমোহিনীকে ধরিতে অগ্রসর হইল। ভুবনমোহিনী দেখিল, আর লজ্জা বা ভয় করিবার সময় নাই। লজ্জা, ভয় করিলে তাহার অমূল্য সতীত্ব-রত্ন এ দুর্ব্বৃত্তের হস্তে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, তাহা ত সে করিতে পারে না, মৃত্যুও যে তাহা হইতে সহস্র গুণে বরণীয়! ভুবনমোহিনী শয্যা হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইল। সে কিছুক্ষণ নরেন্দ্রনারায়ণের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—আপনি এক্ষণি এখান থেকে চলে যান, আপনি জানেন আমি পর-স্ত্রী, আমার ছেলের সাম্‌নে এসব কথা বল্‌বেন না। আপনি এখনি বেরিয়ে যান, লোকে আপনাকে এখানে দেখ্‌লেও আমার জাত যাবে। আপনি এক্ষণি বেরিয়ে যান।

নরেন্দ্রনারায়ণ ভুবনমোহিনীর জন্য তখন উন্মত্ত। সে কি আর সহজে ভুবনমোহিনীকে ছাড়িয়া যাইতে পারে? সে এবার ভুবনমোহিনীর গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিল,—আর দেরী কোরো না প্রাণেশ্বরি! আমি যে আর সহ্য কর্‌তে পারি না।

ঠিক সেই সময়ে "কড় কড়" করিয়া মেঘ গর্জ্জন হইল, যেন সমস্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, অমনি ভূতুম পেঁচা ভুবনমোহিনীর ঘরের উপর হইতে ডাকিল, "ভূত্‌ ভূতুম।"

ভুবনমোহিনী সেই মুহূর্ত্তে কিছু পশ্চাদপদ হইয়া বলিল, খবরদার, ভাল হবে না বল্‌ছি, যদি আপনার মঙ্গল চান, আপনি এই দণ্ডেই চলে যান। যদি আপনার প্রাণের মমতা চান, এই দণ্ডেই বেরিয়ে যান।

নরেন্দ্রনারায়ণের কর্ণে ভুবনমোহিনীর কথা পৌছিল না, সে তখন ভুবনমোহিনীর রূপে উন্মত্ত। সে অগ্রসর হইয়া ভুবনমোহিনীকে জোর করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া তাহার অধরে একটি চুম্বন বসাইয়া দিল।

ভুবনমোহিনী নরেন্দ্রনারায়ণের বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত বহু চেষ্টা করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনারায়ণ বলশালী, বহু কষ্টে সে নরেন্দ্রনারায়ণের বাহুপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিল, অমনি সে ধাক্কা দিয়া নরেন্দ্রনারায়ণকে কয়েক পা পশ্চাৎপদ করাইয়া দিল। তখন ভুবনমোহিনী জ্ঞানহারা হইয়া গেল, তাহার মনে হইল, সে কলঙ্কিনী হইয়াছে, সে আর তাহাকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না। সে তৎক্ষণাৎ তাহার শয্যার নিম্ন হইতে রামদাও বাহির করিয়া নরেন্দ্রনারায়ণের গলদেশে এক ঘা বসাইয়া দিল। নরেন্দ্রনারায়ণের মস্তক দেহ হইতে চ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন ভুবনমোহিনীর উন্মাদিনী ভৈরবীর বেশ! নরেন্দ্রনারায়ণের মস্তক ছেদনের পর গলদেশ হইতে ভীষণ বেগে রক্ত ছুটিতে লাগিল। ভুবনমোহিনী এক দৃষ্টে সেই রক্তের প্রতি কতকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তখন ভুবনমোহিনীর রণচণ্ডীর মূর্ত্তি, তখনও ভুবনমোহিনীর হস্তে রক্ত মাখা রামদাও। ঐ ভাবে কতকক্ষণ চাহিতে চাহিতে তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। সে অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, হাতের রামদাও দূরে ছুড়িয়া পড়িল। বসন্ত এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতে কোনও সারাশব্দ না পাইয়া সে প্রথমে মনে করিল, নরেন্দ্রবাবু বুঝি ভুবনমোহিনীর রূপ সম্ভোগ করিতেছে, সে তখন তাহার পুরস্কারের মাত্রা কি হইবে তাহা চিন্তা করিল। হাসিতে হাসিতে সে দরজার নিকট আসিল। ঠিক সেই সময়ে আবার ঘরের চালের উপর হইতে ভূতুমপেঁচা ডাক দিল, "ভূতু ভূতুম", তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, তখন তাহার মনে হইল, কোনও অমঙ্গল ত হয় নাই! দরজা খুলিয়া ঘরের ভিতরকার দৃশ্য দেখিয়া সে প্রথমে তাহার চক্ষুকে বিশ্বাসই করিতে পারিল না। চক্ষু ভাল করিয়া মুছিয়া আবার ঘরের ভিতরকার দৃশ্য দেখিল। সে

তখন নরেন্দ্রনারায়ণের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া তথা হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহার বাড়ীর দিকে পলায়ন করিল।

সেই দিবস অতি প্রত্যুষেই রামচন্দ্রের মাতা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই সে ভুবনমোহিনীর খবর নিতে তাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল। গিয়া দেখে, ঘরের দরজা খোলা, ভুবনমোহিনী অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়া, একজন লোক ছিন্ন মস্তকে পড়িয়া রহিয়াছে, সমস্ত ঘর রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। প্রভাতের মৃদু সমীরণ গায় লাগায় খোকা হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে।

রামচন্দ্রের মাতা এসব দৃশ্য দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে ইহার রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে খোকা কাঁদিয়া উঠিল, রামচন্দ্রের মাতার তখন যেন হুঁস হইল। সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভুবনমোহিনীকে ধাক্কা দিতে লাগিল, দেখিল তাহার জ্ঞান হইতেছে না, তখন সে খোকাকে কোলে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সে মৃত ব্যক্তিকে চিনিতে পারিল, তৎপরে দরজাটা বাহির হইতে আটকাইয়া সে খোকাকে নিয়া তাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল।

রামচন্দ্র তখনও নিদ্রিত, তাহাকে তাহার মাতা ঘুম হইতে উঠাইয়া চুপিচুপি ভুবনমোহিনীর বাড়ীর দৃশ্য বর্ণনা করিয়া বলিল,—খোকাকে বউর কাছে দিয়ে আয়, চল্ আমার সাথে, বামন-বৌর জ্ঞান করে তার কাছে সব কথা শুন্‌তে হবে, এসব ঐ বসন্ত মাগির চক্রান্ত। ধন্য আমার মা, সতীত্ব রক্ষা কর্‌তে যেয়ে কি ভীষণ কাণ্ডই করেছে! কাকে কেটেছে জানিস্? আমাদের জমিদার নরেন্দ্র বাবুকে। রক্তমাখা দাখানাও সেখানে আছে। বৌকে আগে জ্ঞান করে শুনব কি হয়েছে, তারপর

তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করব। নরেন্দ্র বাবুর লোকজন কি সহজে ছাড়বে? তারা এর প্রতিশোধ নিতে চাইবেই, হয়ত বৌকে ফাঁসি লট্‌কাতে চাইবে।

খোকাকে তাহার স্ত্রীর কাছে রাখিয়া রামচন্দ্র তাহার মাতাকে সঙ্গে করিয়া অবিলম্বে ভুবনমোহিনীর বাড়ীতে গেল। গিয়া দেখে তখনও কেহ সেখানে আসে নাই। তাহারা ঘরে ঢুকিয়া ভুবনমোহিনীর [illegible] উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহার মাথায় তৈল জল দিয়া বাতাস দিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে ভুবনমোহিনীর জ্ঞান হইল, জ্ঞান হইলেই সে লাফ দিয়া উঠিয়া বসিল। রক্তজবার ন্যায় তাহার চক্ষু, এলোথেলো চুল, সে কটমট করিয়া রামচন্দ্র ও তাহার মাতার দিকে চাহিয়া রহিল। সে যেন তাহাদিগকে চিনিতে পারিতেছে না। তাহার যেন প্রকৃত জ্ঞান নাই। ঐ ভাবে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ সে লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, দাঁড়াইয়া সে তাহার কাপড় মাজার মধ্যে জড়াইয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরেই রামচন্দ্র যেখানে ছিল, সেই দিকে হাত বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—বের হ শীগ্‌গির, তুই জানিস্ সতী নারীর সতীত্ব কি অমূল্য রত্ন? আবার তোরাও বুঝি আমার সতীত্ব হরণ করতে এসেছিস্? দেখ্‌ছিস্ তোদের মনিবকে কি করেছি? তোদেরও সেই দশা হবে! বের হ বল্‌ছি। যাবি না? আচ্ছা দেখ্ তবে। আজ জগৎ সংসার নির্ম্মূল করব।

রামচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—মা, মা, তুমি কি আমাদের চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি যে রামুর মা, ঐ যে আমার রামু।

ভুবনমোহিনী কিছুক্ষণ কটমট্ করিয়া চাহিয়া বলিল,—রেখে দাও রামের মা শ্যামের মা, রাম শ্যাম! ঐ রকম কথাই সকলকে প্রথমে বলে,

তারপরেই সর্ব্বনাশ কর্‌তে চায়, এখন এখান থেকে যাবি কিনা বল্‌? যাবি না? তবে তোদেরও আয়ু শেষ!

ইহা বলিয়াই ভুবনমোহিনী রামচন্দ্রের মাতার বাহু হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিল, রামচন্দ্রের মাতাকে এমন জোরে ধাক্কা মারিল, রামচন্দ্রের মাতা দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গেল। ভুবনমোহিনী সেই মুহূর্ত্তেই রামদাওখানা ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। রামচন্দ্র দেখে, ভুবনমোহিনী একেবারে উন্মত্ত, দা পাইলে মহা অনর্থ ঘটাইবে। সে অমনি ভুবনমোহিনীকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—দিদি, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না? দিদি, আমি যে তোমার রামু।

রামচন্দ্র ভুবনমোহিনীকে ধরা মাত্রই ভুবনমোহিনী রামচন্দ্রের কোলেই আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল। রামচন্দ্র ও তাহার মাতা ভুবনমোহিনীর জ্ঞান উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিছু বেলা হইলেই বসন্ত নরেন্দ্রনারায়ণের খুনের সংবাদ প্রচার করিয়া দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে নরেন্দ্রনারায়ণের খুনের সংবাদ সমস্ত গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সমস্ত গ্রামে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। এমন অভাবনীয় কাণ্ড কেহ কোনও দিন শোনে নাই। নানা লোকে নানা কথা বলিতে বলিতে নিশিকান্তের বাড়ীতে রওনা হইল। সমস্ত গ্রাম যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, দূর হইতে এই ঘটনা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিল না; ঘটনা স্থলে আসিয়া এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল! নিশিকান্তের বাড়ী দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে এই ঘটনা নরেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী হিরণ্ময়ীর নিকটও পৌঁছিল। তিনি অবিলম্বে দেওয়ানজি হরকুমার গুপ্ত মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া নিশিকান্তের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উপস্থিত লোক জন সকলেই সরিয়া গেল।

তখনও ভুবনমোহিনীর জ্ঞান হয় নাই. রামচন্দ্র তাহার মাথার নিকটে বসিয়া তাহাকে বাতাস দিতেছিল। উপস্থিত জনমণ্ডলী এই খুন সম্বন্ধে নানা অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিল।

নরেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী হিরণ্ময়ী ও দেওয়ানজি মহাশয় এই দৃশ্য দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, প্রকৃত ঘটনা কি হইয়াছে। এই ঘটনার প্রকৃত রহস্য তাহাদের বুঝিতে এক বিন্দুও বাকী রহিল না। হিরণ্ময়ী তাহার স্বামীর ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া অটল অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার চক্ষে এক বিন্দুও জল নাই।

দেওয়ানজি মহাশয় হিরণ্ময়ীকে বলিলেন,—মা লক্ষ্মী, এখন তুমি ঘরে ফিরে যাও, তোমার স্বামীর যে এরূপ পরিণাম হবে এ আর বিচিত্র কি ? এ ভীষণ দৃশ্যের নিকট তোমার আর বেশী ক্ষণ থাকা উচিত নয়।

হিরণ্ময়ী তদুত্তরে বলিলেন,—দেওয়ানজি মশায়, এ অবস্থার জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলাম, সেজন্য আমার আপশোষ কর্‌বার কিছুই নাই।

হিরণ্ময়ীর মুখে এই কথা শুনিয়া অনেকেই বিস্মিত হইবেন, স্বামী খুন হইলে স্ত্রী কি প্রকারে এইরূপ অটল অবস্থায় থাকিয়া এরূপ উক্তি করিতে পারে! স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা শুধু নামের মাধুর্য্যে হয় না, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের ভালবাসা উৎপাদন করিতে হইলে, পতির মধ্যে পতিত্বভাব ও স্ত্রীর মধ্যে স্ত্রীত্ব ভাব থাকা চাই। কিন্তু স্বামী শত জঘন্য লম্পট অপদার্থ হইলেও হিন্দুরমণী স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, স্বামীকেই একমাত্র ধ্যান জ্ঞান বলিয়া মানিয়া নেয়, স্বামীর সমস্ত অত্যাচার, অবহেলা নীরবেই সহ্য করিয়া যায়। হিরণ্ময়ীও তাহার স্বামীর অত্যাচার, অবহেলা নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিল। স্বামীর অধঃপতন দেখিয়া সে তাহার স্বামীর ভীষণ পরিণাম দেখিবার জন্ম শক্ত

করিয়াই বুক বাঁধিয়াছিল ; সুতরাং নরেন্দ্রনারায়ণের এবম্প্রকার মৃত্যুতে তাহার হায় আপশোষ করিবার ত কিছুই নাই।

দেওয়ানজি মহাশয় বলিলেন,—মা, আর এ ভীষণ দৃশ্য দেখে ফল কি ? যা হবার হয়ে গেছে ; এখন চল, ঘরে ফিরে যাই।

হিরণ্ময়ী বলিলেন,—সতী নারী কি করে সতীত্ব রাখ্‌তে পারে, আজ জগতকে এক চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখাল। এই সাধ্বীর নিজ মুখে এই ঘটনার যাবতীয় বৃত্তান্ত না শুনে আমি যেতে পারি না। এ অবস্থায় গেলে আমি কিছুতেই শান্তি পাব না।

দেওয়ানজি মহাশয় বলিলেন,—মাতাল ও চরিত্রহীন ব্যক্তির যে এই পরিণাম হবে তার আর বিচিত্র কি ? এ দেখে লোকে শিখুক, মাতাল আর চরিত্রহীনের পরিণাম কি ভীষণ! জগৎকে খুব শিক্ষা দিলে!

ভুবনমোহিনীর ক্রমে ক্রমে যেন আবার জ্ঞান হইতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া যেন সে তখন প্রকৃত অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিল। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে তাহার ঘর, তাহার বাড়ী লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাথায় কাপড় দিয়া সে উঠিয়া বসিল।

তখন রামচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনীকে বলিল,—মা, দেখ্‌ছ ত কি ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে, সব কথা এই লোকদের সাম্‌নে খুলে বল।

ভুবনমোহিনীও বুঝিতে পারিল, এখন আর লজ্জা বা ভয় করিবার সময় নাই। সে জানিত, খুন করিলে খুনির ফাঁসি কাষ্ঠে যাইতে হয়, কিন্তু তাহার যে পুত্রের ভবিষ্যতের দিকে চাহিতে হইবে, সে যদি ফাঁসি কাষ্ঠে যায়, তবে তাহার পুত্রের কি দশা হইবে? পুত্রের কথা স্মরণ হওয়ায় সে কাঁদিয়া ফেলিল।

দেওয়ানজি মহাশয় তখন বলিলেন,—"ভয় কি মা, তুমি সব কথা খুলে বল, সত্যি সত্যি সব বল, যদি তুমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হও, তবে আমরা

তোমাকে রক্ষা করব।" তৎপরে হিরণ্ময়ীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এই যে দেখ্ছ, ইনি হলেন এই মৃত নরেন্দ্রনারায়ণের অভাগিনী পত্নী, ইঁহার স্বামীকে তুমি খুন করে থাক্‌লেও যদি তুমি নির্দ্দোষ হও, তবে ইনিও তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা কর্‌বেন।"

এই কথা শুনিবা মাত্রই ভুবনমোহিনী হিরণ্ময়ীর নিকট যাইয়া তাহার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—আমিই আপনার স্বামিকে খুন করেছি, আমিই আপনার স্বামী-হন্তা, আমিই আপনার সর্ব্বনাশ করেছি।

হিরণ্ময়ী তখন বলিলেন,—আপনি প্রকৃতিস্থ হউন, আপনি বলুন ঘটনা কি হয়েছিল। আমার মৃত স্বামীর চরিত্রের বিষয় আমি সম্পূর্ণ জানি, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, নিজ সতীত্ব রক্ষা কর্‌তে যেয়ে অনুপায় হয়ে আপনি এই কাজ করেছেন। আপনি সব কথা খুলে বলুন।

হিরণ্ময়ীর এই কথায় ভুবনমোহিনীর হৃদয়ে এক নূতন বলের সঞ্চার হইল। সে তখন উচ্চৈঃস্বরে বসন্তের প্রথম দিনের আগমন হইতে নরেন্দ্র-নারায়ণকে হত্যা করা পর্য্যন্ত সব কথা একে একে বর্ণনা করিল।

ভুবনমোহিনীর এই কথা শুনিয়া উপস্থিত জন-মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "সাক্ষাৎ সতী সাবিত্রী, এখনকার দিনে এ রকম বড় দেখা যায় না।" আবার কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "বিশ্বাস হয় না, নিজকে বাঁচাবার জন্য অনেক কথা ছাপিয়ে গেল।" আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "নিজেই দুষ্টা, নিজের দোষ না থাক্‌লে, প্রশ্রয় না পেলে কি কেউ আপনা আপনি কারো ঘরে ঢোকে? সব চালাকি, যাহোক গল্পটি বানিয়েছে ভাল। মাগীর বুদ্ধির বলিহারি যাই।"

হিরণ্ময়ী ভুবনমোহিনীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন,—আমি আপনার সমস্ত কথা বিশ্বাস কর্‌লাম, আমি আপনাকে বাঁচাবার জন্য

চেষ্টা কর্‌ব। আমার স্বামী খুন হয়েছে বলে নির্দ্দোষ লোক শাস্তি পাবে কেন? আপনি কোনও চিন্তা কর্‌বেন না, আজই আপনার স্বামীর নিকট খবর পাঠান হবে, তিনি এসেই সব বিহিত করবেন।

হিরণ্ময়ী দেওয়ানজি প্রভৃতি সকলেই চলিয়া গেল। রামচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনীকে তাহাদের বাড়ীতে নিয়া গেল। বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার সময় ভুবনমোহিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বুঝি বা এ জীবনের মত এই বাড়ীর সঙ্গে এই সম্বন্ধ শেষ!

ভুবনমোহিনী তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া পুত্রের জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে কেবলই বলিতে লাগিল, যদি আমার কোনও সাজা হয়, তবে আমার পুত্রের দশা কি হবে? আমি নিজের জন্য কোনও চিন্তা করি না, যা হয়েছে তার চেয়ে মরা আমার পক্ষে অনেক শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমি মলে খোকার কি হবে? তাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার ভার যে আমার উপরে!

রামচন্দ্র ভুবনমোহিনীকে আশ্বাস দিয়া বলিল,—ভয় কি দিদি, বিপদে কোনও দিন আত্মহারা হতে নাই, বিপদে সাহস আর ধৈর্য্য দুই-ই চাই। আমি কিছু খেয়ে এখন সহরে রওনা হব। আমাদের উকিল ভোলানাথ বাবুর কাছে যাব, তিনি দেবতুল্য লোক। সম্ভব আর কিছুক্ষণ বাদেই পুলিশ এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে, সেজন্য তুমি কিছুই ভয় করো না, তোমাকে সহরে নিয়ে গিয়ে হাজতে রাখবে, মা তোমার সঙ্গেই যাবে। আমি ভোলানাথ বাবুর কাছে যাচ্ছি, আজই তোমাকে জামিনে খালাস করে নিয়ে আসব। কিছু চিন্তা করো না দিদি, এসব ভবিতব্যের নির্ব্বন্ধ, এর উপর কারও হাত নাই।

ভুবনমোহিনী দেখিল, রামচন্দ্র যাহা বলিয়াছে তাহা প্রকৃত। বিপদে ধৈর্য্য ও সাহস চাই। বিলাপ করিয়া বা হতাশ হইয়া ফল কি? যাহা কপালে থাকে, তাহাই হইবে।

দুপ্রহরের পর থানা হইতে পুলিসের দারোগা তদন্তে আসিল। নিশিকান্তের বাড়ীতে আসিয়া নরেন্দ্রনারায়ণের লাস দেখিয়া তাহা

পুলিসের হেপাজতে রাখিল, যে জায়গায় খুন হইয়াছে সেই জায়গার একটা নক্‌সা প্রস্তুত করিল। তৎপরে ভুবনমোহিনীর জবানবন্দি গ্রহণ করিয়া তাহাকে পুলিশের হেপাজতে রাখিয়া রামচন্দ্রের মাতা, বসন্ত, হিরণ্ময়ী ও দেওয়ানজি মহাশয়ের জবানবন্দি গ্রহণ করিল।

দারোগা বাবু একটি নব্য শিক্ষিত যুবক, অতি ভদ্র এবং অমায়িক লোক। ভুবনমোহিনীর কথা শুনিয়া সে তাহার প্রতি বর্ণ বিশ্বাস করিল, তৎপরে অন্যান্য সাক্ষীর জবানবন্দি শুনিয়া এবং তাহাদের মুখে ভুবনমোহিনীর প্রশংসা শুনিয়া তাহার হৃদয় ভুবনমোহিনীর প্রতি সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিল। বসন্ত যতদূর সম্ভব নিজকে বাঁচাইয়া বলিল।

ভুবনমোহিনীকে দারোগা বাবু অতি নম্রভাবে বলিল,—আমাদের কর্ত্তব্য কাজ কর্‌তে যেয়ে অনেক সময়ে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক কষ্টকর কাজ কর্‌তে হয়, আমি আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলে মনে করি এবং আমার বিশ্বাস জগতে সকলেই আপনাকে নির্দ্দোষ মনে কর্‌বে, কিন্তু তবুও যে ঘটনা হয়ে গেছে. আপনাকে আমার গ্রেপ্তার কর্‌তে হলো, আপনাকে এখন আমার থানায় নিয়ে যেতে হবে, সেখান থেকে আমরা সহরে যাব। আপনার জন্য পাল্কী আন্‌তে পাঠিয়েছি, আপনি কোনও ভয় কর্‌বেন না, আপনি খালাস পাবেনই, তবে যে কয়দিন কর্ম্মভোগ আছে ভুগ্‌বেন। আর রামচন্দ্রের মার মুখে শুন্‌লাম, রামচন্দ্র নাকি ভোলানাথ বাবু উকিলের কাছে চলে গেছে, তিনি অতি অমায়িক, পরোপকারী ব্যক্তি। তিনি আপনার কথা শুনে আপনার জন্য প্রাণপণে খাট্‌বেন। আমার যতদূর সাধ্য, আপনাকে এবিষয়ে আমিও সাহায্য করব। আপনি যাতে এ বিপদ থেকে অব্যাহতি পান, সে বিষয়ে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

ভুবনমোহিনী দেখিল, আর তাহার লজ্জা করিবার সময় নাই, সে ত

আর এখন ঘরের বধূ নহে, তাহাকে এখন হাজতে যাইতে হইবে, হয়তো জেলও খাটিতে হইতে পারে, বা ফাঁসি কাষ্ঠেও ঝুলিতে হইতে পারে। সে তখন দারোগা বাবুকে বলিল,—দারোগাবাবু, আমি খোকাকে সঙ্গে নিতে পার্‌ব না? আর যদি রামচন্দ্রের মাকে আমার সঙ্গে যেতে দিন! আমার বড়ই ভয় হচ্ছে।

দারোগাবাবু বলিল,—খোকাকে ত অবশ্যই নিবেন। আর রামচন্দ্রের মার যেতেও আমার কোনও আপত্তি নাই, তাতে আপত্তির কি থাক্‌তে পারে?

পাল্কী আসিল, দারোগাবাবু ভুবনমোহিনীকে পাল্কীতে উঠাইয়া রামচন্দ্রের মাতা ও নরেন্দ্রনারায়ণের লাস সহ সহরে রওনা হইল।

রামচন্দ্রের সহরে পৌঁছিতে দুপ্রহর অতীত হইয়া গেল। রামচন্দ্র কাছারিতে যাইয়া ভোলানাথ বাবুর সহিত দেখা করিয়া, ভুবনমোহিনী—নরেন্দ্রনারায়ণ ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত ভোলানাথ বাবুর নিকট বর্ণনা করিয়া ভোলানাথ বাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—বাবু আপনি গরীবের—অসহায়ের মা বাপ। আমি জাতিতে নাপিত, আমার দিদি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সে আমার মায়ের পেটের বোনের চেয়েও বড়। আপনি যদি তাকে দেখেন, তবে আপনিও বল্‌বেন একালে এমন মেয়ে হতে নাই। আমার বোনকে বাঁচান।

রামচন্দ্রের মুখে ভুবনমোহিনীর আদর্শ চরিত্রের কথা শুনিয়াই ভোলানাথ বাবুর হৃদয় ভুবনমোহিনীর দুঃখে ভরিয়া গেল, তার উপর ভুবনমোহিনীর প্রতি রামচন্দ্রের অগাধ ভক্তি ও ভালবাসা দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়া গেলেন। তিনি রামচন্দ্রকে উঠাইয়া বলিলেন, তোমার এত বল্‌তে হবে না, আমি আমার যথাসাধ্য তার জন্য খাটব। এখন তোমাদের বরাত, আমার হাত যশ

ভুবনমোহিনীকে হাজতে আনা মাত্রই ভোলানাথবাবু ভুবনমোহিনীর জামিনের জন্য দরখাস্তের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেইদিন সমস্ত বিষয় ঠিকঠাক করিতে করিতে ভোলানাথবাবু আর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট জামিনের দরখাস্ত দিতে পারিলেন না, সুতরাং ভুবনমোহিনী সেই রাত্রির জন্য হাজতেই রহিয়া গেল, রামচন্দ্রের মাতা হাজতের দরজার বাহিরে সমস্ত রাত্রি শয়ন করিয়া রহিল। তৎপর দিবস অতি প্রত্যুষে ভোলানাথবাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ীতে যাইয়া ভুবনমোহিনীর জামিনের দরখাস্ত মঞ্জুর করাইয়া আনিয়া, ভুবনমোহিনীকে হাজত হইতে তাহার বাসায় নিয়া আসলেন।

ভোলানাথবাবু ভুবনমোহিনীকে বলিলেন,—মা, যতদিন পর্য্যন্ত তোমার মোকদ্দমা শেষ না হয়, তুমি এ ছেলের বাসায়ই থাকবে। দারোগার রিপোট দেখ্‌লাম, সে তোমার পক্ষেই রিপোর্ট দিয়েছে, কোনও ভয় নাই, তুমি খালাস পাবেই। তোমার স্বামীর কাছেও এ বিষয় সব বিস্তারিত লিখে চিঠি লেখা হয়েছে, তিনি এসে পড়লেন বলে। মোকদ্দমা শেষ হলে তুমি স্বামীর কাছে চলে যেয়ো।

ভোলানাথ বাবুর বয়স অনুমান পঞ্চান্ন বৎসর। তিনি প্রকৃত পক্ষেই অতি অমায়িক লোক। উকিলগণের মধ্যে তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বভাবের বেশ নাম আছে।

ভুবনমোহিনী ভোলানাথ বাবুর কথায় যেন মুগ্ধ হইয়া গেল; সে দেখিতে পারিল, ভোলানাথ বাবুর বিরাট প্রশান্ত মূর্ত্তি; তাহার হৃদয় ভোলানাথ বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে বলিল, আমি আপনাকে আর কি বলব। আপনি আমার পিতা, আমি আপনার কন্যা, আমার নিজের পিতা থাকলেও তিনি এ বিপদে এত কর্‌তেন না।

ভোলানাথ বাবু বলিলেন, কি বল্‌লি মা,আমি তোর বাপ, তুই আমার

মেয়ে, আচ্ছা আজ থেকে তাই হলো, ভুলিস্ না কিন্তু। থাক্, অন্য কথা আর তুলিস্ না, এ কয়টা দিন তোর ধৈর্য্য থাক্‌তেই হবে।

রামচন্দ্রের কথায়ই ভুবনমোহিনীর প্রতি ভোলানাথ বাবুর হৃদয় শ্রদ্ধায় ভরিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে ভুবনমোহিনীর নির্ম্মল, সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার হৃদয় তাহার প্রতি অপত্য স্নেহে ভরিয়া গেল। তাহার মনে হইল, এ মূর্ত্তিতে ত মলিনতার লেশ মাত্রই নাই, এমন সুন্দর, রমণীয় মূর্ত্তি যেন তিনি জীবনে আর দেখেন নাই। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, চাঁদেরও কলঙ্ক থাকিতে পারে, কিন্তু এ হৃদয়ে কোনও কলঙ্ক থাকিতে পারে না। এ নারীর চরিত্রের চতুঃসীমায় কলঙ্কের কোনও রেখা আনাও ঘোরতর পাপকার্য্য হইবে। ভুবনমোহিনীর কথার প্রতি শব্দ যেন তাহার প্রাণে বীণার ঝঙ্কারের মত বাজিতে লাগিল, তাহার হৃদয়ে যেন অপত্য স্নেহের বন্যা বহিয়া গেল। এমন সুমধুর মিষ্টি স্বরও তিনি বুঝি কোনও দিনই শোনেন নাই।

ভুবনমোহিনী বলিল,—না বাবা,আমি এ জীবনে ভুল্‌বো না, বাপকে কি মেয়ে কখনও ভুল্‌তে পারে?

রামচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনীকে ভোলানাথ বাবুর বাসায় রাখিয়া তাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল। নরেন্দ্রনারায়ণের আমলাগণ মধ্যে কেহ কেহ ভুবনমোহিনীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না, তাহারা ভুবনমোহিনীর উপর প্রতিহিংসা নিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দেওয়ান-জীর নিকট ভুবনমোহিনীর বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে লাগিল, তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস নরেন্দ্রনারায়ণকে ভুবনমোহিনীই ভুলাইয়া নিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ভুবনমোহিনী দুশ্চরিত্রা, ভুবনমোহিনীর শাস্তি হওয়াই উচিত। দেওয়ানজী মহাশয় প্রথম প্রথম তাহাদের কথায় কর্ণপাতই করিলেন না, কারণ তাহারও বিশ্বাস ভুবনমোহিনীর নরেন্দ্র-

নারায়ণের হত্যা সম্বন্ধে কোনও অপরাধ নাই, কিন্তু আমলাগণের বারংবার উক্তিতে এবং তাহাদের প্ররোচনায় ভুবনমোহিনীর প্রতি তাহারও ক্রমে অবিশ্বাস জন্মিল। তখন তাহার মনে হইতে লাগিল, সম্ভব ভুবনমোহিনী একেবারে নির্দ্দোষ নহে, এ বিষয়ে তাহার যথাযথ বিচার হওয়াই কর্ত্তব্য। যতই দিন যাইতে লাগিল, ভুবনমোহিনীর চরিত্র সম্বন্ধে যেন তাহার বিশ্বাস ততই শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী এখন জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, সুতরং তাহার সম্মতি এবং অভিমত না নিয়া কোনও কাজই হইতে পারে না। দেওয়ানজি মহাশয় ভুবনমোহিনীর যথাযথ বিচার হওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া হিরণ্ময়ীর নিকট যাইয়া ভুবনমোহিনীর চরিত্রের বিরুদ্ধে কতক অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—তুমি মা বল, আমি একবার এ বিষয় দেখেনি, আমার বাস্তবিকই এখন মনে হচ্ছে, এ বিষয়ে নিশিকান্তের স্ত্রী একেবারে নির্দ্দোষ নয়।

হিরণ্ময়ী দেওয়ানজির কথা শুনিয়াই যেন জ্বলিয়া উঠিলেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "দেওয়ানজি মশায়, আপনি বুড়ো হয়েছেন, এখনও এ জগতের হাব ভাব কিছুই বুঝ্‌লেন না? কার চরিত্রের বিরুদ্ধে আপনি দোষারোপ কচ্ছেন! আমিও নারী, নারী সৎ কি অসৎ আমি বুঝি না? আমারই স্বামী হত হয়েছে, যদি বুঝ্‌তাম এ হত্যায় নিশিবাবুর স্ত্রীর বিন্দুমাত্রও অপরাধ আছে, তবে কি আমি নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকতাম? আমার সর্ব্বনাশের মত কার সর্ব্বনাশ হয়েছে? স্বামী শত দুশ্চরিত্র হউক, শত জঘন্য হউক, আমার নিকট তিনি স্বামীই ছিলেন। বেঁচে যতদিন ছিলেন, আশা ছিল একদিন তিনি আমার হবেনই, আজ আমার সে আশা কৈ? আমি যে বড় আশায় দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার ধ্রুব বিশ্বাস কি জানেন দেওয়ানজি মশায়? যদি আমি সতী হয়ে থাকি, তবে সেও সতী।

আমার স্বামীরই সম্পূর্ণ অপরাধ ছিল। একজন নির্দ্দোষ সতী নারীকে শাস্তি দিলে ত আমার মৃত স্বামীকে ফিরে পাব না? আমার কাছে আর সে বিষয়ে কিছু বল্‌বেন না।" হিরণ্ময়ী এ কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দেওয়ানজি মহাশয় বলিলেন,—মা, তুমি যা ভাল বোঝ কর। তোমাকে ত আর আমি বুঝিয়ে কিছু কর্‌তে পার্‌ব না।

না, দেওয়ানজি মশায়, সে শোকের কাহিনী আমার কাছে আর উল্লেখ করবেন না, যত দিন বেঁচে থাক্‌ব এ শোকাবহ স্মৃতি আমাকে পলে পলে দগ্ধ কর্‌বে।

দেওয়ানজি মহাশয়ের এবং অন্যান্য কতক আমলাবৃন্দের শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হিরণ্ময়ীর অভিমতের বিরুদ্ধে ভুবনমোহিনীর বিরুদ্ধে কিছু করিতে সাহস হইল না।

ভোলানাথ বাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও সৎ উকিল। বারলাইব্রেরীর চীৎকার ধ্বনি তিনি একেবারেই ভালবাসিতেন না, বা শুধু গল্প করা বা পরের নিন্দা বা কুৎসা করা, বা কথায় কথায় রাজনৈতিক, সামাজিক বা জাতীয় কূট প্রশ্নের মীমাংসা করা, তিনি একেবারেই ভালবাসিতেন না। তিনি একটু নিরিবিলি থাকিতেই ভালবাসিতেন। তিনি দুপ্রহরের অবসর সময়ে বসিবার জন্য কাছারির নিকটেই একটি প্রকোষ্ঠ ভাড়া করিয়াছিলেন, তাহাকে চেম্বার কহিত, তিনি তাহাতেই উপবেশন করিতেন। সেই চেম্বারের দুইটি প্রকোষ্ঠ, একটি সম্মুখ ভাগে আর একটি পশ্চাৎ ভাগে।

ভোলানাথ বাবুর দুইটী পুত্র। বড়টির নাম অতুল, সে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া এখন আইন পড়িতেছে, তাহার ইচ্ছা এম.এ.বি.এল্. হইয়া পিতার নিকটই ওকালতিতে বসিবে। সে একটু গম্ভীর গোছের ছেলে, মুখে বড় বেশী কথা কহে না, চোখে চশমা আটে, দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করিয়া সেও দার্শনিকগণের ন্যায় একটু চিন্তাশীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এম এ. পাশ করার পর ভোলানাথ বাবুর ইচ্ছা হইল, তাহাকে এখন বিবাহ করায়। সে তাহা শুনিয়া কথায় কথায় মাতার নিকট প্রকাশ করিল, ছাত্রজীবনে বিবাহ করার চাইতে মূর্খতার কাজ আর জগতে নাই, ছাত্রজীবনে বিবাহই আজ ভারতবাসীর এই অধঃপতনের কারণ।

ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী অতুলচন্দ্রের অত উচ্চ আদর্শের মহিমা না বুঝিয়া বলিলেন,—বাবা, তোর বয়স ত হয়েছে, যেটের কোলে চব্বিশে

পড়েছিস্, এম. এ.ও পাশ করেছিস্ এখন বল্‌তে গেলে, তুই আর ছাত্র নস্।

না মা, যত দিন পাঠ কর্‌ব ততদিন পর্য্যন্ত ছাত্র। বল্‌লে তুমি বিশ্বাস যাবে না, আমার বিয়ের নাম শুন্‌লেই প্রাণ কেঁপে উঠে, আমি সারা জীবনই ছাত্র থাক্‌ব। যদি স্বভাব চরিত্র ভাল রাখতে পারি, বিয়ের ত কোনও প্রয়োজন দেখি না।

বলিস্ কি? তা হলে তুই সারাজীবন আইবুড় থাক্‌বি নাকি?

না, আমি কি তা বল্‌ছি? আগে উপার্জ্জন করি, তার পরে বরং বিয়ের চিন্তা করা যাবে। এখন ত তার কোনও প্রয়োজন দেখ্‌ছি না।

সুতরাং পিতামাতা অতুলের বিবাহ সম্বন্ধে আর কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন না। ভোলানাথ বাবুর অপর পুত্র ছোট, বয়স ১১।১২, নাম ননী, দেখিতেও ননীর পুতুল, বেশ সুন্দর।

ভোলানাথ বাবুর বাড়ীটি ছোট, এক তালা দালান, মাত্র ৫টী প্রকোষ্ঠ। একটি প্রকোষ্ঠে তিনি নিজে থাকিতেন, এক প্রকোষ্ঠ ভাড়ার ঘর রূপে পরিণত ছিল, এক প্রকোষ্ঠে ভোলানাথ বাবুর বৈঠকখানা ছিল, এক প্রকোষ্ঠে অতুল থাকিত, অন্য প্রকোষ্ঠে ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী ও ননী থাকিত। ভুবনমোহিনী এ বাসায় আসার পর তাহার জন্য এক খানা প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ভুবনমোহিনীর জন্য যে ঘর নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা অতুলের ঘরের পাশাপাশি। উভয় প্রকোষ্ঠের মধ্যে যে দরজা ছিল, তাহা একটু ভাঙ্গা, সেই জন্য সেই ঘর মধ্য দিয়া বন্ধ করা যাইত না।

ভুবনমোহিনী আজ দশ দিন যাবৎ ভোলানাথ বাবুর বাসায় আসিয়াছে। নিশিকান্ত ভুবনমোহিনী কিংবা তাহার পুত্রের কোনও খবরই নেয় না। ভুবনমোহিনী সর্ব্বদাই ভাবিত, এসময়েও কি তাহার

স্বামী তাহার কোনও খবর নিবেন না? তিনি কি এসব বিষয়ের এখনও কিছু জানেন না? এও কি সম্ভব? নরেন্দ্র বাবুর স্ত্রী বলিয়াছিলেন, তাহারা তাহার কাছে এবিষয় খবর পাঠাইবেন। ভোলানাথ বাবু বলিলেন, তিনিও নাকি তাহার কাছে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার উত্তরও আসিয়াছে, তিনি নাকি শীঘ্রই আসিবেন, তবে তিনি আসেন না কেন? এ বিপদের সময়ও কি তিনি একবার দেখা দিবেন না?

ভোলানাথ বাবু হওয়ার দিন দুই পরে একদিন ভুবনমোহিনীকে বলিলেন, নিশি বাবু এখনও এলেন না কেন বুঝি না। তিনি ত লিখেছিলেন তিনি শীগ্‌গিরই আস্‌বেন। আবার এও শুন্‌লাম, তিনি নাকি বাড়ী এসেছেন। কি জানি মা, এ বয়সে এ ব্যবসায়ে এসে নানা প্রকৃতির লোকের সাথে দেখা হয়েছে, নানা ঘটনা দেখেছি। এ আবার কোন্ রহস্য কে জানে? নিশি বাবুর ব্যাভার ত আমার কাছে বড়ই অদ্ভুত লাগে। তুমিও মা তার কাছে একখানা চিঠি লিখে দাও।

ভোলানাথ বাবুর কথা শুনিয়া ভুবনমোহিনী চুপ করিয়া রহিল, ভোলানাথ বাবুর কথায় তাহার মনের মধ্যে এক ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল। নিশিকান্তের অনুপস্থিতির কারণ তাহার নিকট যেন ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। সে বহু চিন্তা করিয়া ধারণা করিল, বোধ হয় স্বামী তাহাকে কলঙ্কিনী মনে করিয়াছেন, তাই তিনি আসিতেছেন না। আবার তখনই তাহার মনে হইল, এও কি সম্ভব? তিনি গ্রামে আসিয়া কি শুনিয়াছেন যে তাহাতে তাহাকে কলঙ্কিনী মনে করিবেন? হয় ত তাহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিয়া থাকিবে, হয় ত বসন্তই তাহার নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া থাকিবে। তিনি কি তাহাই বিশ্বাস করিবেন? তিনি কি তাহার কাছে একবার এই ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও করিবেন না? দেখা

হইলে, সে তাহার কাছে সমস্ত কথা পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিত, তাহা হইলেও তাহার সন্দেহ দূর হইত না? তাহার কথা কি তিনি বিশ্বাস করিতেন না? সকলে বিশ্বাস করিতে পারে, তিনি বিশ্বাস করিতেন না? যাহাদের সাথে তাহার কোনও কালের পরিচয় ছিল না, তাহারা তাহার কথা বিশ্বাস করিল, এমন কি, পুলিসের দারোগা পর্য্যন্ত তাহার কথা বিশ্বাস করিল, তাহার স্বামী তাহাকে এতদিন যাবৎ চিনেন, তিনি বিশ্বাস করিতেন না? বহুক্ষণ মনে মনে এই প্রকার আলোচনা করিয়া সে ঠিক করিল, তাহার স্বামী তাহাকে নিশ্চয়ই কলঙ্কিনী মনে করিয়া ত্যাগই করিয়াছেন, নচেৎ তিনি আসেন না কেন?

তখন যেন তাহার নিজের জীবনের উপর একটা ধিক্কার জন্মিয়া গেল, তাহার বাঁচিয়া থাকিয়াই বা ফল কি? সে কি কলঙ্কিনী রূপে জীবন অতিবাহিত করিবে? আবার তখনই তাহার মনে হইল,—কেন, স্বামী তাহাকে কলঙ্কিনী মনে করিল দেখিয়াই কি সে কলঙ্কিনী হইয়া গেল? আবার তাহার মনে হইল,—না, এ জীবন আর সে রাখিবে না। মোকদ্দমার সময় প্রকৃত কথা গোপন করিয়া সে বলিবে, সে দোষী। স্বামী যদি তাহাকে কলঙ্কিনী বলিয়া ত্যাগ করিল, তবে আজ না হউক, দুইদিন পরে সকলেই তাহাকে কলঙ্কিনী মনে করিবে। সে ইহাই মনে মনে ধ্রুব সংকল্প করিল, আবার সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইল,— না, তাহা ত হইতে পারে না, স্বামী তাহাকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করিলেন বলিয়া, জগৎ সমক্ষে সে কেন কলঙ্কিনী হইবে? তখনই তাহার আবার পুত্রের কথা মনে হইল; না, তাহার ত পুত্রের জন্যও মৃত্যু এখন বাঞ্ছনীয় নহে; যদি সে এখন ফাঁসিকাষ্ঠে যায়, তবে যে খোকা এককালে পিতৃমাতৃহীন হইবে। তখন সে আবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল,— না, মোকদ্দমার সময় সে সত্য কথাই বলিবে, পরিণামে যাহা হইবার

তাহাই হইবে। যদি সে বাঁচিয়া থাকে, তবে সে খোকাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবেই।

নিশিকান্ত জমিদার ভবন হইতে নরেন্দ্রনারায়ণের বিষয় খবর পাইয়া বাড়ীতে আসিল। বাড়ী আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের নিকট এই ঘটনা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস শুনিতে লাগিল। নিশিকান্তের মনে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইতে লাগিল,—তাহার স্ত্রী সতী কি অসতী। স্ত্রী অসতী, একথা মনে উদয় হওয়ামাত্রই তাহার হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে লাগিল। সে যে এত দুশ্চরিত্র, তাহার দুশ্চরিত্রের জন্য স্ত্রীর মনে কোনও বেদনা হইতে পারে কিনা, তাহা তাহার ধারণাতে কোন দিনই আসে নাই বা আসিবার কারণ ঘটে নাই, কারণ পুরুষেরা মনে করে তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকদের স্বামীকেই একমাত্র আরাধ্য দেবতা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী, একথা হৃদয়ে উপস্থিত হইলেই সে বৃশ্চিক দংশনবৎ যন্ত্রণা বোধ করিতে থাকে। নিশিকান্তের অবস্থাও তাহাই হইল, তাহার নিজের দোষে যে সে এই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, একথা তাহার মনে একবারও উদয় হইল না।

নিশিকান্ত এ বিষয়ের সত্যাসত্য অনুসন্ধানের জন্য বসন্তের নিকট যাইয়া সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিল। বসন্ত অনেক ভণিতা করিয়া নিশিকান্তের দুঃখে অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল,—আর বাবু, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে ফল কি? তুমি ত থাক্‌তে বিদেশে পড়ে, তার ত ভরা যৌবন, আর টাকার যে ছড়াছড়ি, এতে মন না টলে কার? তুমি বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার পর থেকেই নরেন বাবু তার পেছনে লাগ্‌ল, আমি তাকে বোঝালাম, তোমার স্ত্রীকেও বা কত বোঝালাম, কিন্তু তাদের আনাগোনা ঠেকাতে পার্‌লাম কৈ? আমি যদি এর বিন্দুবিসর্গও

আগে জান্‌তে পারি? মাঝে মাঝে তোমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছি,—বলি, দাদাঠাকুর ত টাকা পাঠায় না, এঁত খাওয়া পড়ার ধূম কি দিয়ে? সে তার উত্তর না দিয়ে কেবল হাস্‌ত। আমি কি আর বুঝ্‌তে বাকী রেখেছিলাম? আমার কি, যার যা ইচ্ছা করুক। তারপর হঠাৎ এই কাণ্ড! জান্‌বে, এসব কাজে মনের মিল হতেও বেশী দিন লাগে না, মনের বেমিল হতেও বেশী দিন লাগে না। তাদের মধ্যে এক কথায় দু কথায় ঝগড়া, দুদিন আগ থেকে তাদের কথা বন্ধ, তারপর আর কি? যা হয়েছে তাত জান্‌তেই পেরেছ। এখন কপাল ঠুকে মর।

আচ্ছা বসন্ত, তুমি ত এসং জান্‌তে, তবে আমায় একখানা চিঠি দিলে না কেন?

তুমি থাক্‌তে বিদেশে, সঙ্গিনীর ত সেখানে অন্ত ছিল না, আর তোমার বউ বুঝি বাড়ীতে উপোসে কপাল চাপড়িয়ে মর্‌বে? তার বুঝি আর রূপ যৌবন ভোগ কর্‌বার বাসনা হয় না? পেট আপনি চলে যাবে?

বসন্তকে ভুবনমোহিনীর সম্পর্কে নিশিকান্তের আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা হইল না। নিশিকান্ত স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, বসন্তের চক্রান্তেই তাহার স্ত্রী নরেন্দ্রনারায়ণের গণিকা হইয়াছিল, একবার ইচ্ছা হইল বসন্তকে সেই দণ্ডেই দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে, কিন্তু সেই দণ্ডেই আবার মনের রাগ মনেই দমন করিয়া ফেলিল, বসন্তকে শাস্তি দিবার তাহারত কোনও সাধ্য নাই। সে রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

বাড়ীতে আসিয়া বসন্ত হইতে ভুবনমোহিনী সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিল, তাহা সে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। বসন্ত হইতে যাহা সে শুনিয়াছে তাহা কি সত্য? একবার তাহার মনে হইল, তাহা ঠিক না হইলেই যেন সে অধিকতর সুখী হয়, আবার তখনই তাহার মনে হইল,

না, তাহা হইতে পারে না, বসন্তের কথাই ঠিক। ভুবনমোহিনীর সম্মতি না পাইলে নরেন্দ্রনারায়ণ তাহার ঘরে প্রবেশ করিল কেমন করিয়া? ভুবনমোহিনীর সহিত পূর্ব্বে কোনও কথাবার্ত্তা না হইলে সে অত রাত্রিতে অত টাকা নিয়া প্রবেশ করিবে কেন? নরেন্দ্রনারায়ণ হইতে সে টাকা না পাইলে অত দিন পর্য্যন্ত সে কেমন করিয়া খরচ-পত্র চালাইত? সে ত বাড়ীতে প্রায় বৎসরু কাল যাবৎ এক পয়সাও পাঠায় নাই? ভুবন-মোহিনী সুন্দরী, যুবতী,—নরেন্দ্রনারায়ণ সুপুরুষ, যুবক, অর্থশালী, তাহাদের মধ্যে চরিত্র দোষ হওয়া ত কিছুই অসম্ভব নয়। যতই সে মনে মনে ভুবনমোহিনীর সম্পর্কে আলোচনা করিতে লাগিল, ভুবনমোহিনীর গুণরাশি তাহার মন হইতে একেবারে অদৃশ্য হইল, সে তাহার হৃদয়ে কালসর্প রূপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সে তখন প্রতিজ্ঞা করিল,—আর না, এমন স্ত্রীর চিন্তা আর সে মনেও আনিবে না; কলঙ্কিনী, কাল-নাগিনীকে সে চিরজীবনের জন্য হৃদয় হইতে বিদায় করিল। একবার তাহার পুত্রের কথা মনে পড়িল, অমনি আবার স্ত্রীর কথা মনে পড়িল, সেই দণ্ডেই পুত্রকে দেখিবার আশাও সে মন হইতে দূর করিল, কারণ পুত্রকে দেখিতে হইলে তাহার স্ত্রীর মুখদর্শন করিতে হয়, সুতরাং সারাজীবনের জন্য স্ত্রী ও পুত্রকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিল। ভুবনমোহিনীকে এ বিষয়ে একবার জিজ্ঞাসা করাও সে প্রয়োজন বোধ করিল না।

আজ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ভুবনমোহিনীর মোকদ্দমা হইবে। সে দিন ভোর বেলা ভোলানাথ বাবু ভুবনমোহিনীকে বলিলেন,—মা, আজ ত তোর মোকদ্দমার দিন, তুই কিন্তু নির্ভয়ে বিনা সঙ্কোচে সমস্ত কথা পরিষ্কার করে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বল্‌বি, কোনও লজ্জা বা ভয় করিস্ না মা, এর উপরই কিন্তু তোর সব ভবিষ্যৎ নির্ভর করে; এই

মোকদ্দমার গুরুত্ব বুঝে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে এই মোকদ্দমা তার কাছে রেখেছেন।

ভুবনমোহিনী দেখিল, ভোলানাথ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত; আজ তাহার জীবন-নাটকের এক অঙ্ক অভিনীত হইবে, তাহাকে উত্তম নায়িকার ন্যায় তাহার কাহিনী বিবৃত করিতে হইবে। সে এই সব বিবেচনা করিয়া অতি ধীরে ধীরে বলিল,—বাবা, আপনি একটু কাজ কর্‌লে বড়ই ভাল হয়। আদালতে যেয়ে আমার লজ্জা বা ভয় আস্‌তে পারে, আমি শত হলেও গেরস্থের মেয়ে, গেরস্থের বৌ—আমি ত আদালতের চতুঃসীমাও কখন মারাই নাই, তাই আমার জবানবন্দির সময় ভয় ও লজ্জা আস্‌তে পারে। আমি যে সময় জবানবন্দি দেবো, সেই সময় যদি আপনার ঝিকে দিয়ে আমার খোকাকে নিয়ে আসেন, আপনার ঝি যদি আমার খোকাকে কোলে করে আমার সাম্‌নে দাঁড়ায়, তার মুখ দেখ্‌লে, আমার ছেলের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা মনে হলে আমার লজ্জা ভয় কিছুই আস্‌বে না।

ভোলানাথ বাবু বলিলেন, "আচ্ছা মা, তাই করব। আজ পর্য্যন্তও নিশিবাবু এলো না, বড়ই আশ্চর্য্য!" ভুবনমোহিনী তখন স্বামীর আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া মনকে দৃঢ় করিয়াছিল; সে বলিল,—আশ্চর্য্য কিছুই নয়, যাক্ সে কথা।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভুবনমোহিনী হঠাৎ বলিয়া ফেলিল,—বাবা, আপনিও কি আমাকে কলঙ্কিনী মনে করেন?

ভুবনমোহিনার প্রশ্নে যেন ভোলানাথ বাবুর নিশিকান্ত সম্পর্কে প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল। ভুবনমোহিনীকে এই ঘটনা সম্পর্কে যে কেহ কলঙ্কিনী মনে করিতে পারে, তাহাই ভোলানাথ বাবুর ধারণা ছিল না, নিশিকান্ত ত দূরের কথা! এখন তিনি পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিলেন, কেন নিশিকান্ত ভুবনমোহিনীর কোনও খোজ খবর নেয় না।

ভোলানাথ বাবু ভুবনমোহিনীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—মা, বিশ্বাস করবি ? আমি যা বল্‌ব তা বিশ্বাস করবি ? যদি কেউ এসে আমাকে বলে চন্দ্রসূর্য্য এখন পশ্চিম দিক হতে উদয় হচ্ছে, যদি কেউ এসে বলে নদীর জল এখন উচু নীচু হয়ে চল্‌ছে, যদি কেহ এসে বলে হিমাচল অতল জলধি জলে নিমজ্জিত হয়ে গেছে, তাও বরং আমি বিশ্বাস করতে পারি,—বুঝি বা তা হলেও হতে পারে ; কিন্তু মা, তুই কলঙ্কিনী তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। এই ঘটনা সম্পর্কে তুই যা করেছিস্ মা, তাতে তুই একালেও জগতকে দেখিয়েছিস্, সতী নারী কি করে সতীত্ব রাখ্‌তে পারে। কিন্তু একটা কথা না বলে পারি না, তুই রাগ করিস্ না মা! শুনেছি নিশি বাবু মাতাল, বেশ্যাসক্ত, এসব লোকের পক্ষে সব সম্ভব। তোর মত স্ত্রীর সাথে এ ব্যাভার করলে! এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের এই পুরস্কার !

একথা বলিতে বলিতে যেন ভোলানাথ বাবুর চক্ষে জল আসিল। ভোলানাথ বাবুর কথায় ভুবনমোহিনী আত্মহারা হইয়া গেল, সে ভোলানাথ বাবুর পদপ্রান্তে পতিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—বাবা, আমি শৈশবে পিতৃহীনা, বহু পুণ্যবলে আপনাকে আবার পিতাস্বরূপ পেয়েছি। আমি আমার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বল্‌ছি, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী, আমি এক বর্ণও মিথ্যা বলি নাই। পৃথিবীতে যদি আমার কথা কেউ বিশ্বাস না করে না করুক, আপনি যে বলেছেন, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন, এই যথেষ্ট। আমার আর দুঃখ, লজ্জা নাই, আমার ছেলের দিকে চেয়ে আদালতে যেয়ে আমি নির্ভয়ে সব কথা খুলে বল্‌তে পারব।

মা, ছেলের মাথায় হাত দিয়ে ত কোনও শপথ করবার দরকার ছিল না। শুধু আমি কেন, যার হৃদয় আছে, যার চোখ কাণ আছে সে-ই

তোমাকে নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা বল্‌বে, সেই তোমাকে সতী সাধ্বী বল্‌বে। নিশি বাবু সম্ভব কাছারিতে আসতে পারেন, আমি রামচন্দ্রকে বলে রেখেছি তাকে খোঁজ করতে। তাকে পেলে আমার কাছে সে নিয়ে আস্‌বে, তা হলে তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা করিয়ে দেবো, একবার শেষ বুঝাপড়া কর্‌তে হবে। তা হলে মা সকাল সকাল তৈরী হয়ে থেকো।

যথাসময়ে একখানা গাড়ী করিয়া ভোলানাথ বাবু ভুবনমোহিনীকে কাছারিতে নিয়া গেলেন। ভুবনমোহিনী-নরেন্দ্রনারায়ণ ঘটিত ঘটনা সমস্ত সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। বেলা বার ঘটিকার-সময় মোকদ্দমা আরম্ভ হইবে, ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালত লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

ভুবনমোহিনীর মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। কোনও সাক্ষীর জবানবন্দি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন,—তিনি আসামীর মুখে সব কথা শুনিতে চান। ভোলানাথ বাবুর ঝি খোকাকে কোলে করিয়া ভুবনমোহিনীর নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। ভুবনমোহিনী দণ্ডায়মান হইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্পষ্ট ভাষায় নরেন্দ্রনারায়ণের খুনের বিষয়, নিশিকান্তের বাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়ার পরে বসন্তের আগমন হইতে নরেন্দ্রনারায়ণের মস্তক ছেদন পর্য্যন্ত সমস্ত কথা একে একে বিবৃত করিল।

ভুবনমোহিনীর উক্তি শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে পুলিসের রিপোর্ট উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেন, তৎপরে সরকারি উকিল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই মোকদ্দমা সম্পর্কে আপনার মত কি?

সরকারি উকিল বাবু বলিলেন,—আমি আসামীর উক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আসামী নিজ সতীত্ব রক্ষা কর্‌তেই নরেন্দ্রবাবুকে খুন করেছিলেন। তাকে আত্মরক্ষার বিধান মতে খালাস দেওয়া উচিত।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "আমারও সেই মত।" তৎপরে ভুবন-মোহিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনাকে মুক্তি দিলাম। আপনি নির্দোষ, সরকার বাহাদুর এই মোকদ্দমা আপনার বিরুদ্ধে চালাইতে চাহেন না।"

মোকদ্দমা হইয়া গেলে ভোলানাথ বাবু ভুবনমোহিনীকে তাহার চেম্বারে নিয়া আসিলেন। তাহাদের পেছনে পেছনে বহু লোক আসিল। ভোলানাথ বাবু তাহার ঘরের মধ্যে কাহাকেও আসিতে দিলেন না।

আদালত গৃহে রামচন্দ্রও উপস্থিত ছিল, সে নিশিকান্তের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ভুবনমোহিনীর মোকদ্দমায় কি হয় তাহা দেখিবার জন্য নিশিকান্ত ফৌজদারী আদালতে আসিয়াছিল। রামচন্দ্র তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। রামচন্দ্র নিশিকান্তকে ভোলানাথ বাবুর চেম্বারে নিয়া আসিল।

ভুবনমোহিনীকে ভোলানাথ বাবু তাহার চেম্বারের সম্মুখের ঘরে বসাইলেন, তাহার ইচ্ছা আগে নিশিকান্তের সহিত আলাপ করিয়া তাহার ভাবগতিক বুঝিয়া নিবেন, পরে ভুবনমোহিনীকে ডাক দিবেন।

ভোলানাথ বাবুর সহিত রামচন্দ্র নিশিকান্তের পরিচয় করাইয়া দিলেন। নিশিকান্ত উপবেশন করিলে ভোলানাথ বাবু নিশিকান্তকে হাসিয়া বলিলেন, —মশায়, আপনি ত অতি অদ্ভুত লোক দেখ্‌ছি, আপনি আপনার স্ত্রীর কোনও খবরই রাখেন না? যাক্, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে দেশে যান। আপনি পরম ভাগ্যবান, এমন স্ত্রী রত্ন পেয়েছেন।

নিশিকান্তের রুক্ষ চেহারা, চক্ষু কোটরগত, দেখিলেই মনে হয় লম্পটের আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি। সে ভোলানাথ বাবুর কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল

বিবেচনা না করিয়াই বলিয়া ফেলিল,—আমি এ স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় যাব? আমার জাত মান নাই?

ভোলানাথ বাবু নিশিকান্তের কথা শুনিয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন, তিনি যেন নিশিকান্তের কথার মর্ম্ম উপলব্ধিই করিতে পারিলেন না। তিনি নিশিকান্তের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—সে কি রকম কথা মশায়? আপনার স্ত্রীর সঙ্গে জাতমানের কি সম্পর্ক?

নিশিকান্ত আবার পূর্ব্ব স্বরেই বলিয়া ফেলিল,—সমস্ত জগৎ বিশ্বাস করতে পারে, আমার স্ত্রী নির্দ্দোষ, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সে দোষী। আমি আমার স্ত্রীকে গ্রহণ করব না, তাকে আমি চিরকালের জন্য ত্যাগ করেছি।

ভোলানাথ বাবু নিশিকান্তের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; একবার ভাবিলেন, নিশিকান্তকে দুকথা শুনাইয়া দেন, আবার ভাবিলেন, নিশিকান্তকে বুঝাইয়া দেখিবেন, হয়ত সে পরের কথায় স্ত্রীর প্রতি অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিবে, প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলেই সে স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে। তিনি ইহাও জানিতেন, যে নিজে অসৎ সে অপরকেও অতি সহজেই অসৎ বলিয়া মনে করিতে পারে, আবার তখনই তাহার মনে হইল,—এ ব্যাপার ত বুঝাইবার জিনিষ নয়, এ যে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের কথা, এ যে স্বামীর স্ত্রীর উপর বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা। স্ত্রীর উপর স্বামীর অবিশ্বাস হইলে তাহা ত যুক্তিতর্কের দ্বারা দূর হয় না, এ যে একপ্রকার ব্যাধি বিশেষ। আর তাহাকে কটু কথা শুনাইবার তিনি কে? তাহার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে তাহারই একমাত্র অধিকার। এই সব বিবেচনা করিয়া তিনি বলিলেন,—আপনি কি প্রমাণের উপর আপনার স্ত্রীর উপর এই শাস্তির বিধান করলেন জানতে পারি?

নিশিকান্তের উত্তর বরাবরই চোখা চোখা, সে অমনি বলিয়া ফেলিল,—প্রমাণ আবার আপনার কাছে আওড়াতে যাব নাকি? প্রমাণ না পেলে কি কেউ আর সাধ করে নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে?

আপনি আপনার স্ত্রীর মুখে ঘটনাটা একবার শুন্‌বেনও না?

না, শুন্‌বার ত কোনও প্রয়োজন দেখি না; আমি যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি, আমার স্ত্রী কলঙ্কিনী। আমি এখন যেতে পারি?

ভুবনমোহিনী আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, তাহার কক্ষ হইতে সে আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসিল। সে নিশিকান্তের পায়ের ধূলা মাথায় নিয়া বলিল,—তুমি বল্‌লে, যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছ আমি কলঙ্কিনী; কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌ছি, আমি কলঙ্কিনী নই, চাঁদেরও কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমার সতীত্বের উপর কেউ কোনও কলঙ্ক আরোপ করতে পার্‌বে না; তুমি যদি আমার বিরুদ্ধে কিছু শুনে থাক, তবে তা সব মিথ্যা। তুমি বল্লে, তুমি আমায় ত্যাগ করেছ, বিনা দোষে আমায় ত্যাগ কর্‌বে কেন? তুমি আমায় ত্যাগ কর্‌লে আমি দাঁড়াব কোথায়? আমি সারা জীবন থাব কি করে? আমি কার আশ্রয়ে থাক্‌ব?

নিশিকান্ত ভুবনমোহিনীকে ঐ অবস্থায় দেখিবার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। ভুবনমোহিনীকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া প্রথমে সে একটু থতমত খাইল, কিছুক্ষণ পরেই নিজকে সে সামলাইয়া লইয়া তাহার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল, সে বলিল,—বক্তৃতার জন্য তুমি চিরকালই প্রসিদ্ধ। তোমার বক্তৃতা ত অনেককাল শুনেছি, আমি জানি তাতে তুমি বেশ্ পটু। যা করেছ করেছ, সে বিষয়ে আলোচনা করে আর আমি বৃথা সময় নষ্ট কর্‌তে চাই না। তুমি তোমার মনে থাক, আমি আমার মনে থাকি। তোমার মুখ আমি আর দেখ্‌তে চাই না, তোমার যেখানে ইচ্ছা

সেখানে যেতে পার। তুমি আমার মুখে যে চুণকালি দিয়েছ, তা আর এ জীবনে মুছ্‌বে না।

স্বামীর কথা শুনিয়া ভুবনমোহিনীর হৃদয় বিদ্ধ হইয়া যাইতেছিল। সে দেখিতে পাইল, এহেন স্বামীর নিকট তাহার নিজের বিষয়ে কোনও সহানুভূতি পাওয়া অসম্ভব, সে তখন তাহার পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিল, "আমি দোষ করেছি বলে আমাকে যেন ত্যাগ করলে, তোমার ছেলেকে তুমি গ্রহণ কর, সে ত কোনও দোষ করে নাই।" এই কথা বলিয়াই সে তাহার শিশুপুত্রকে নিশিকান্তের পদপ্রান্তে রাখিল। নিশিকান্ত পুত্রের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না, বলিল, 'আর নেকামি করো না, পুত্রের মুখ দেখায়ে আমাকে ভুলাতে পারবে না। তুমি যে অতি সুচতুরা স্ত্রীলোক তা আমি জানি, খুব ফন্দি বের করেচ যা হোক্, ভেবেছ পুত্রের ভার নিতে হলেই তোমাকে গ্রহণ করতে হবে! আমি এই জারজপুত্রের সাথেও কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমি চল্লেম, এ জন্মে আর তোমাদের মুখ দেখ্‌তে চাই না।" ইহা বলিয়াই নিশিকান্ত চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। ভুবনমোহিনী অমনি নিশিকান্তকে বলিল, "তুমি যাওয়ার আগে বলে যাও, আমি সারাজীবন কি করে খাব? আর ছেলেকেই বা কেমন করে বাঁচাব?"

আবার সেই কথা! এর উত্তর আমার থেকে না নিলেও হতো। তুমি উত্তর শুনতেই চাও, তবে শোন। এতদিন যেমন বেশ্যাবৃত্তি করে জীবনযাপন করতে তেমন ভাবেই জীবনযাপন করবে। এখন আমি যেতে পারি ভোলানাথ বাবু?

ভুবনমোহিনী নিশিকান্তের পায়ের ধুলা মাথায় নিয়া বলিল,– তুমি আমায় ত্যাগ করলে, কিন্তু আমি তোমার মূর্ত্তি মনে মনে অঙ্কিত করে সারাজীবন ধ্যান করব। আমি আবারও বলি, যদি আমি সতী নারী

হই, তবে দেখ্‌বে তুমি তোমার ভুল বুঝবে, পরে তোমার পরিতাপ হবে। আমিও তোমার আবার দেখা পাব, আমাকে আবার পত্নী বলে তুমি গ্রহণ কর্‌বে।

এই কথা বলিবার পর নিশিকান্তের পায়ের ধূলা নিয়া সে খোকার মাথায় দিয়া বলিল,—খোকাকে আশীর্ব্বাদ করে যাও, ও যেন মানুষ হয়। আমি তোমার কাছে কোনও দোষ কর্‌লেও কর্‌তে পারি, কিন্তু ও যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ! এ কথাগুলি বলিতে যেন ভুবনমোহিনীর বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার মনকে শত বুঝ-প্রবোধ দিয়া দৃঢ় করিলেও এ করুণ দৃশ্যের জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। নারীর স্বাভাবিক হৃদয়ের দুর্ব্বলতা সে দূর করিবে কেমন করিয়া? এদৃশ্য যে তাহার নিকট বড় মর্ম্ম-বিদারক। বহুকষ্টে সে এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজকে দমন করিয়া রাখিয়াছিল, এখন সে আর নিজকে সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না. সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল, তাহার মাথা যেন ঘুরিতেছিল। নিশিকান্ত সেই সময় বলিয়া উঠিল, "এ যে দেখ্‌ছি রীতিমত নাটকের অভিনয় আরম্ভ কর্‌লে, দেখ্‌ছি আর কোনও উপায়ে পয়সা রোজগার না হলে থিয়েটারে যেয়েও বেশ দু পয়সা উপায় হবে, রূপও আছে বয়সও আছে।"

ভুবনমোহিনী নিশিকান্তের কথার আর উত্তর দিতে পারিল না, সে অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ভোলানাথ বাবু নিশিকান্ত ও ভুবনমোহিনীর আলাপ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। ভুবনমোহিনী কত শ্রেষ্ঠা আর নিশিকান্ত কত নীচ! তাহার বারবারই মনে হইতেছিল, এ অদ্ভুত মিলনে ভগবানের কি অভিপ্রায় আছে? এহেন মুক্তা কি এহেন বানরের গলায় শোভা পায়? জহুরি না হইলে হীরার আদর কি বুঝিবে? সাধারণ লোক ত তাহা কাচ ভ্রমে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিবে।

এই রত্ন যদি উপযুক্ত হাতে পড়িত, তবে আজ কি একটি সুন্দর সংসার হইত! যেমন রূপে রূপবতী, তেমনই গুণে গুণবতী, যেন মণিকাঞ্চনের যোগ! অপাত্রে পড়িয়া সব গুণ জলে ভাসিয়া গেল। ভুবনমোহিনীর মাটিতে পড়ার শব্দ শুনিয়া যেন তাহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি যেন এক কল্পনার রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন, নিশিকান্তের প্রত্যেক বর্ণ তাহার কর্ণে বিষবৎ বাজিতে লাগিল। তিনি এতক্ষণ তাহার রাগ দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন, আর পারিলেন না, ভুবনমোহিনীর অজ্ঞানাবস্থা তাহাকে জ্ঞানহারা করিয়া ফেলিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—নিশি বাবু, আপনার স্ত্রী বলেই আপনি যা মুখে আসে তা বল্‌বেন না, জান্‌বেন—স্ত্রী হলেই আপনার যা তা বলবার অধিকার নাই। আপনি আজ যে রমণীকে অভদ্রোচিত, অশ্রাব্য ভাষায় যা তা বল্‌লেন তাকে আমি মা বলে সম্বোধন করি, আমি তাকে আমার মেয়ের মত দেখি, সেও আমাকে তার পিতার ন্যায়ই দেখে। আপনি নিতান্ত কুষ্মাণ্ড, মদখোর মাতাল, বেশ্যাসক্ত, আপনি এ রমণীর মূল্য কি বুঝ্‌বেন? এই রমণীর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝ্‌বার আপনার শক্তি কি? পূর্ব্বজন্মে সম্ভব অনেক পুণ্য করেছিলেন, তাই এ জন্মে এ রমণীরত্নকে স্ত্রীরূপে পেয়েছিলেন, আর এ রমণী সম্ভব পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপ করেছিল তাই এ জন্মে আপনার মত স্বামী পেয়েছিল। আপনাকে আর কি বল্‌ব। এ সবই অদৃষ্টলিপি, তা খণ্ডাবে কার সাধ্য? আপনি জান্‌বেন, আপনার স্ত্রী সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্কচরিত্রা। আপনার মত বেশ্যাসক্ত মাতালের পক্ষে সবই সম্ভব, আপনি আপনার উপযুক্ত কাজই করেছেন! আপনার পরিণাম অতি ভীষণ হবে, আমি দিব্য চক্ষুতে দেখ্‌তে পাচ্ছি। মার আমার ভরণপোষণের কোনও কষ্ট হবে না, যতদিন এ ছেলে বেঁচে থাক্‌বে, ততদিন সে-ই মার ভরণপোষণ কর্‌বে।

নিশিকান্ত ভোলানাথ বাবুকে আর কথা বলিতে না দিয়া বলিল,—

আমাকে ডেকে এনে অপমান করার কি দরকার ছিল? এটা বুঝি ওকালতি ভদ্রতা?

ভোলানাথ বাবু নিশিকান্তের কথার আর উত্তর না দিয়া ভুবন-মোহিনীর জ্ঞান উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। নিশিকান্ত আর উচ্চবাচ্য না করিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ভুবনমোহিনীকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিলেন,—মা আমার, চল মা এ ছেলের বাড়ীতে। যতদিন এ ছেলে বেঁচে আছে, ততদিন তোর আর তোর ছেলের ভরণপোষণের কোনই অভাব হবে না, তুই সেখানে নিরাপদে থাক্‌বি। নিজের বাপের বাড়ীর মতই থাক্‌বি।

ভুবনমোহিনী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ভোলানাথ বাবুর সহিত তাহার বাসায় চলিয়া গেল। তাহার চতুর্দ্দিকই যেন শূন্য শূন্য বোধ হইতে লাগিল।

কেদারনাথের চাকরির বৎসর দুই চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে ঐ আফিসেই আশি মুদ্রা বেতনে একটি চাকরি খালি হওয়ায় কেদারনাথ কর্ম্মঠ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী বলিয়া সেই চাকরি পাইয়াছে। তাহার মাতা কোনও মতে জীবন ধারণ করিতেছে, কিন্তু একেবারে প্রায় চলৎ-শক্তি রহিতা। একজন ধরিলে কোন মতে চলাফিরা করিতে পারেন। কেদারনাথই পূর্ব্ববৎ মাতার পাক করিয়া দেয়, এখন আর সকালে তাহার আফিসে যাইতে হয় না। তাহার বেতন বৃদ্ধির পর তাহার মাতা তাহাকে বলিয়াছিলেন, বাবা, এত পরিশ্রম তোমার শরীরে আর কতদিন সইবে? এখান থেকে হেটে তোমার রোজ হাবড়া যেতে হয়, তার উপর আবার গঙ্গার ঘাট থেকে জল এনে তোমার রোজ রান্না করতে হয়, আবার তার উপর আমার সেবা শুশ্রূষা করতে হয়, এত ত সইবে না, শরীর ত আর লোহার নয়, রক্ত মাংসেরই! এখন ত তোমার মাইনে বেড়েছে, একজন ব্রাহ্মণী রাখ, গঙ্গার ঘাট থেকে জলও আন্‌তে পার্‌বে, আমাদের পাকও করবে। তোমার খাটুনী অনেক কমে যাবে। রান্না বান্না কি পুরুষের কাজ! তৎপরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আমি যেন লোহার খুঁটি হয়ে এসেছিলাম, আমার যেন যম নাই, আমি গেলে তুইও অনেক শান্তি পেতি, আমিও বাঁচ্‌তাম।

কেদার বলিল,—মা, কি বল্‌ছ তুমি? তুমি গেলে আমি শান্তি পেতাম? মা এমন মধুর জিনিষ, এ হারালে কি আর তা পাওয়া যায়? এই যে সারা দিন আফিস থেকে খেটে খুটে আসি, তোমার মুখখানা দেখ্‌লেই

যেন সব পরিশ্রম দূর হয়ে যায়। তোমার কাছে যখন রাত্রিতে শুয়ে থাকি, তখন যেন মনে হয়, এমন আরাম আর কত দিন পাব। আমার মনে হয়, মা, আমি যেন তোমার সেই খোকাই আছি। তবে মা তোমার কষ্টের কথা বল্‌ছ, তা যদি আমি দূর কর্‌তে পার্‌তাম, আমার নিজের প্রাণ দিয়েও বুঝি তা দূর কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তাম। এ মা তোমার কর্ম্মভোগ, যতদিন ভুগ্‌বার ততদিন ভুগ্‌বে।

স্বর্ণময়ী কেদার ও তাহার মাতার গুণে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে কেদারকে তাহার ছোট ভাইয়ের মত দেখিত, কেদার তাহাকে স্বর্ণ দিদি বলিয়া ডাকিত। স্বর্ণময়ী সদা সর্ব্বদাই কেদারের মাতার সেবা শুশ্রূষা করিত, তত্ত্বতালাপি নিত। তাহার ও কেদারের শুশ্রূষার গুণে কেদারের মাতার কোনই অসুবিধা হইত না। বেলা ৯ ঘটিকার সময় আহার করিয়া কেদার হাবড়া অভিমুখে রওনা হইয়া যাইত, মাতার ভাত যত্ন মতে মাতার প্রকোষ্ঠে রাখিয়া যাইত, কেদারের মাতা স্বর্ণময়ীর সাহায্যে দ্বিপ্রহরের সময় স্নান করিয়া আহার করিতেন। কেদার বেলা পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত আফিসে কাজ করিত, তাহার এক মিনিট পূর্ব্বেও সে কোনও দিন আফিস পরিত্যাগ করিত না, নিজের মনে কর্ত্তব্য কাজ করিয়া যাইত। পাঁচ ঘটিকার পর ধীরে ধীরে সে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিত। রাত্রিতে হয় কোনও দিন ভাত ব্যঞ্জনাদি রান্না করিয়া নিত, কোনও দিন মধ্যাহ্নের প্রস্তুত ব্যঞ্জন থাকিত, শুধু ভাত পাক করিয়া নিত। এমনি ভাবে কেদারের জীবন অতিবাহিত হইতেছিল। বহু ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা তাহার মাতার চিকিৎসা করাইল, কিন্তু তাহার মাতার ব্যারামের কোনও উপশম হইল না। তাহার মাতা দিন দিনই রুগ্না হইয়া আসিতে লাগিলেন। রমেশ বাবুর পরিবারবর্গ আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইত।

কেদারের মাতা বলিলেন,—তা ত বুঝি বাবা, আমি গেলে যে তুই এসংসারে একা ভাস্‌বি। কিন্তু আমি থেকে তোর কোনও সাহায্য কর্‌তে পারি না, বরং তোর কষ্টই বৃদ্ধি কর্‌ছি।

তাও মা যত দিন আছ, আমি গাছের ছায়ায় আছি। এখনও যদি কোনও বিপদে পড়ি, তোমার উপদেশ পাব, এখনও যদি তেমন কোনও পীড়া হয়, তখন তোমার আশ্বাসবাণী শুন্‌তে পাব। না মা, তুমি যতদিন থাকো, আমারই মঙ্গল।

আচ্ছা, তা যেন হলো, কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণী রেখে নেও, তাহলেও তোমার কষ্টের অনেক লাঘব হবে।

মা, সত্যি বল্‌বে? ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর হাতে তুমি শুদ্ধ মনে বিনা সংকোচে খেতে পারবে?

তাকি আর হয় বাবা? এখানকার ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, তা কেমন কে জানে? তাদের ত আর পরিচয় জানি না? তাদের হাতে খেতে কি আর তেমন প্রবৃত্তি হবে? তবে প্রবৃত্তি না হয়ে কি করি। তোমার শরীরের দিকে ত দেখ্‌তে হবে।

মা, জোর করে রুচি বা প্রবৃত্তি সৃষ্টি কর্‌বার এখন পর্য্যন্ত কোনও প্রয়োজন হয় নাই। দেখ্‌ছ ত মা, আমি এমনি ভাবে বছরের উপর চালিয়ে দিলাম, এক দিনের জন্যও কি আমার অসুখ করেছে? মা, তোমার সেবা করতে আমার অসুখ হবে না, সম্ভবতঃ তা না কর্‌তে পার্‌লেই আমার অসুখ কর্‌বে। আর ও কথা এখন উঠিয়ে কাজ নাই, যেম্‌নি ভাবে দিন চলছে তেম্‌নি ভাবে দিন চলবে। তৎপরে হাসিয়া বলিল, "আর দেখ্‌ছি মা, আমার এখন বেশ টাকা জম্‌ছে। প্রতি মাসেই ৩০। ৩৫ টাকা করে জমে। আমি দেখ্‌ছি বড় লোক হয়ে যাব।"

তা ভালই ত, হাতে ত কিছু টাকা থাকাই দরকার। সময় অসময়

ত সকলেরই আছে। যদি তোমার শরীর খারাপ হয়ে পড়ে, তখন তুমি টাকা কোথায় পাবে? তোমার ত ত্রিসংসারে সাহায্য করবার কেউ নাই।

তা হলে মা, সে হিসাবেও এখন ব্রাহ্মণী না রাখা দরকার। যতদিন আমি পারি চালাই, যখন না পারি এক জন ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণী রেখে নেব এখন। কেদারের মাতা ব্রাহ্মণী রাখা সম্বন্ধে কেদারের সাথে আর কোনও আলাপ করিলেন না।

অনিতা পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সে এবার দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইল। রমেশ বাবুর ইচ্ছা, ম্যাট্রিক পাশ করিলে তিনি অনিতার বিবাহের চেষ্টা করিবেন। চেষ্টা আর করিবেনই বা কি। কেদারের সহিত যতই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, রমেশ বাবু, তাহার স্ত্রী, অনিতা ততই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। রমেশ বাবু, অনিতা কেদারের গুণে যেন মুগ্ধ হইয়া রহিল। রমেশ বাবুর মনে হইত, এমন একটি সচ্চরিত্র কর্ত্তব্যপরায়ণ যুবক আজ পর্য্যন্ত তাহার চক্ষে দৃষ্ট হয় নাই। তিনি কেদারকেই অনিতার ভাবী স্বামীরূপে মনে মনে নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রমেশ বাবুর স্ত্রীও কেদারের গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাহারও মনে হইত, কেদারের সঙ্গে অনিতার বিবাহ দিলে মন্দ হয় না; আবার মনে করিতেন, কেদারের অবস্থা নিতান্ত খারাপ, সংসারে বলিতে গেলে তাহার কেহই নাই, এ কুটুম্বিতা করিয়া কি আর সুখ হইবে? সংসারে দশ জন থাকিবে, এক মেয়ে বই ত নয়, বিবাহে দশ জন কুটুম্ব আসিবে, বেশ ঝম্‌ঝমে কম্‌কমে বিবাহ হইবে, আমোদ আহ্লাদের ধুম পড়িয়া যাইবে। সুতরাং, কেদারের সঙ্গে অনিতার বিবাহের কথা মনে হইলে এই সব দশ রকম আপত্তি আসিয়া তাহার মনে উদয় হইত, কিন্তু কেদারের গুণটা আবার সময় সময়

তাহার দারিদ্র্য প্রভৃতি দোষকে ছাপাইয়া অনেক উপরে উঠিত। তখন তিনি মনে করিতেন,—না, কেদারের কাছে অনিতাকে দিলেই অনিতা সুখী হইবে।

অনিতা কিন্তু তাহার বিবাহের কথা একদিনও ভাবে নাই। সে পূর্ব্ববৎ সদা হাস্যময়ী, সদা চঞ্চলা, সদা প্রফুল্লময়া। কেদার আসিলেই সে তাহার নিকট অঙ্ক কষিতে বসিত। সে অন্যান্য পড়ায় বেশ মেধাবী ছিল, কিন্তু অঙ্কটা তেমন বুঝিয়া উঠিত না। কেদার প্রায় প্রতি রবিবারই রমেশ বাবুর বাসায় যাইত, আবার মাঝে মাঝে অফিস বন্ধ থাকিলেও যাইত; তখন অনিতা কেদারের নিকট অঙ্ক বুঝিতে বসিয়া যাইত। কেদারের অঙ্ক শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। কেদার আত সহজ ভাবে অনিতাকে অঙ্ক বুঝাইয়া দিত।

কেদারও অতি সরল-প্রাণ যুবক; সেও অনিতাকে দেখিয়া কোনও সংকোচ বোধ করিত না। অনিতার লেখা পড়ার যত্ন নেওয়া কেদারের একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। সে তাহা কর্ত্তব্য কাজ বলিয়াই বোধ করিত।

রমেশ বাবু একদিন অনিতাকে হাসিয়া বলিলেন,—অনু, তোর অঙ্কের জন্য না হয় একজন মাষ্টার রেখে নে। কেদার ছয় দিন আফিসে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, রবিবার একটু বিশ্রাম করবে, না সেই দিনও তুই তাকে আফিসের খাটুনির চেয়েও বেশী খাটিয়ে নিস্। তাকে তুই আর জিরাতে দিবি না? তুই ত দেখছি তার এক মহা উপকারী বন্ধু!

অনিতা একথা শুনিয়া গাল ফুলাইয়া বলিল,—আচ্ছা থাক্, আমার কোনও মাষ্টারের কাজ নাই। যার মাথা তার মাথা-ব্যথা নাই, অন্যের মাথা-ব্যথা। তোমরা দুজন ত রাত দিন আমার পেছনে লেগেই আছ। আমি জিদ করে বল্‌তে পারি, কেদার দার মত অত সহজ, সরলভাবে পড়া

বুঝিয়ে দিতে পারে, এমন মাষ্টার এম. এ.তে প্রথম হলেও হবে না। আচ্ছা, তুমি ত বল্লে, আমি কেদার দাকে জিজ্ঞাসা করি, তার কোনও কষ্ট হয় কিনা?

অনিতা অমনি কেদারের গলা ধরিয়া হাসিয়া বলিল,—কেদার দা, ঠিক বল ত, তুমি যে আমাকে পড়া বুঝিয়ে দাও, অঙ্ক বুঝিয়ে দাও, এতে তোমার কোনও কষ্ট হয়? ঠিক বোলো, মিথ্যা বোলো না কিন্তু!

কেদারের মুখে হাসি বই বিষাদের রেখা কেহ বড় কোনও দিন দেখে নাই। সে অনিতার গালে এক ঠোংনা মারিয়া হাসিয়া বলিল,—পাগ্‌লি, তোমাকে পড়িয়ে কষ্ট হবে? বল্‌লে তোমার বিশ্বাস হবে? সাত দিনের মধ্যে যদি আমার কোনও সময় সুখে যায়, তবে আমার সেই সময়টুকু যে সময়টুকু তোমাকে পড়াই। এই ছয় দিন ত আফিসের ঐ একঘেয়ে কাজ নিয়েই থাকি, তাতে না লাগে বিদ্যা, না লাগে বুদ্ধি, তোমাকে পড়ার উছলায় বরং একটু লেখাপড়ার চর্চ্চা হয়। আমার ভাগ্যে ত আর বেশী লেখাপড়ার সুযোগ ঘটল না, মোটে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত বিদ্যা। তুমি যদি ম্যাট্রিক পাশ করে আই. এ. পড়, তবে তোমার কল্যাণে আমিও নূতন নূতন কয়েকখানা বই দেখ্‌বার সুযোগ পাব। দিদি, তোমাকে পড়িয়ে আবার আমার কষ্ট হবে? যদি তোমাকে পড়াতে না দেও, তবেই বরং আমার কষ্ট হবে। তবে একটা কথা বলি, তুমি অঙ্কগুলো বড় তাড়াতাড়ি কসে ফেল, তাতেই তোমার ভুল হয়ে যায়, তাতে আমার কষ্ট হয়। আর আমার কথা যা তোমার বাবা বলেছেন, তা শুধু তোমার মন বুঝ্‌বার জন্য বলেছেন।

অনিতা এবার রমেশ বাবুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—কেমন বাবা! শুন্‌লে কেদার দার কথা? দেখ্‌লে ত আমি বরং তার উপকারই করি।

রমেশ বাবু হাসিয়া বলিলেন,—অনু, তোর বয়স হতে চল্‌ল, বুদ্ধি আর

থাক্‌বে না। কেদার কি আর নিজে বল্‌বে, তার কষ্ট হয়? কেদার কি তেমন ছেলে?

অনিতা হাসিয়া বলিল,—বুদ্ধি খুব পেকেছে বাবা, আর পাকবার দরকার নাই, আর পাকলে ত পচেই যাবে। আর তোমাকে একটা কথা না বলে পারি না। বাবা হয়ে তুমি একটা ভারি অন্যায় কাজ করলে। তুমি কেদার দাকে প্রবঞ্চক বল্লে, সে মনে এক মুখে আর এক। তুমি তবে তাকে আজ পর্য্যন্তও চিন নাই, সে মনেও যা মুখেও তা। সে যে সত্যের আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি। এমন লোক এখনকার দিনে কোথায় পাবে?

রমেশ বাবু কেদারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—দেখ্‌লে কেদার, অনু তোমাকে কোন স্থানে বসিয়েছে? অনু, তুই যে কেদারকে মাথায় তুলে ফেল্লি।

অনিতা হাসিয়া সরল ভাবেই বলিল,—মাথায় তুলে রাখ্‌বার লোকই বটে।

কেদার হাসিয়া বলিল,—অনুদিদি, আমায় মাথায় তুলে রাখতে পার্‌বে? দেখো আবার কোন দিন রাগ করে ধপাৎ করে মাটিতে ফেলে দেও, তা হলেই আমার প্রাণ শেষ।

অনিতা হাসিয়া বলিল,—কেদার দা, জিদ করে বল্‌তে পারি এ জীবনে তোমাকে মাথায় রাখা বই মাটিতে ফেল্‌ব না, সেই বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পার।

কেদার বলিল,—যাক্, অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম, শরীরের ঘাম ছেড়ে বাঁচলাম, আমার ত ভয়ই হয়েছিল কোন্ দিন না জানি হঠাৎ মাটিতে পড়ে অকালমৃত্যু হয়। যা হোক আজ থেকে বাস্তবিকই আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারব।

কেদার অনিতা হাসিয়া হাসিয়া গল্পচ্ছলে কথা বলিতেছিল, গল্প বই ইহার গভীরতা যে আর কতদূর আছে, তাহা তাহারা ধারণাতেই আনে নাই, বা তাহাদের উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাই ছিল না। উভয়ের মধ্যে গল্পচ্ছলে কতক হাসি ঠাট্টা হইয়া গেল, এইমাত্র, ইহার রেখাও তাহাদের মনে রহিল না, এইখানেই ইহার পরিশিষ্ট, ইহা হইতে অধিক কিছু ভাবিবার বা বুঝিবার ইহার মধ্যে আছে কিনা তাহা তাহাদের ধারণাতেই আসিল না। উভয়েরই সরল মন, বাল্যসুলভ চপলতা উভয়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ বিদ্যমান, উভয়েই পূর্ব্ববৎ তেমনি ভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিল।

রমেশ বাবু কিন্তু তাহাদের কথা শুনিয়া, তাহাদের হাসি ঠাট্টা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহাদের উভয়ের প্রাণ তাহাদের অজ্ঞাতসারে একে অন্যের দিকে ধাবিত হইতেছে, উভয়ের প্রাণ যেন সমসূত্রে গাঁথা হইয়া যাইতেছে; তাহা সম্ভব এখন ছিন্ন করা অসম্ভব হইবে। পুষ্পবৃক্ষ হইতে একটি পুষ্প বৃন্তচ্যুত করিলে, তখন অপরটি আপনা আপনিই যেমন বৃন্তচ্যুত হইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়ে, তেমন কেদার-অনিতার প্রাণ হইতে একটি প্রাণ স্থানান্তরিত করিলে অপর প্রাণ আপনা আপনি শোক-ভরে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িবে। রমেশ বাবু সেই দিন হইতে কৃতসংকল্প হইলেন, তাহাদের পরস্পর মিলন ঘটাইতে হইবে, তাহারা একে অন্যের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মিলন দেব-বাঞ্ছিত। কিন্তু কেদার-অনিতা এখনও বালক বালিকা। পৃথিবীতে তাঁহারা আরও উন্নতি লাভ করুক, তখনও যদি তাহাদের মন এমুনি থাকে, তখন দুই জনকে একসূত্রে গাঁথিয়া দেওয়া যাইবে। সংসার-সমুদ্র বড় জটিল। সংসার তরণী চালাইয়া নিতে এখনও তাহারা পটু হইবে না, উপযুক্ত হইলে তাহাদের মিলন ঘটাইতে হইবে।

রমেশ বাবু অনিতাকে বলিলেন, "যা হোক তোদের ত বেশ মিটমাট হয়ে গেল। এখন তোর মাষ্টারের গুরুদক্ষিণা দে, আর আমার খাওয়ার বন্দোবস্ত কর।" তৎপরে কেদারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তোমার মার আর কিছুতেই উপকার হলো না। আমি যে সেদিন তাকে দেখে আস্‌লাম, তাতে মনে হল এ যাত্রা বুঝি আর তার রক্ষা নাই।

কেদার বলিল,—না, মাকে আর বাঁচাতে পার্‌ব না। দিন দিন তিনি শক্তিহীনা হয়ে আসছেন। চেষ্টা ত করে দেখ্‌লাম, আর না বাঁচ্‌লে কি কর্‌ব, এর উপর ত আর কারও হাত নাই: আয়ু যতদিন থাক্‌বে তিনি ততদিন থাক্‌বেন, আমি বিপদের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হয়ে আছি।

বাবা, এই ত মানুষের মতন কথা! অবোধ মনকে যে আমরা বুঝাতে পারি না, এই ত দুঃখ। যা বলেছ তা ঠিক, চেষ্টা ত আর কম কর্‌লে না। এখন পরমায়ু যতদিন আছে তিনি থাক্‌বেন।

কেদারের মাতার পরমায়ু প্রকৃত পক্ষেই অতি সংকীর্ণ হইয়া আসিতে-ছিল। এ কয় দিন হইতে তিনি আর বিছানা হইতে এক প্রকার উঠিতেই পারেন না। স্বর্ণময়ী দিন রাত্রি প্রায় তাহার কাছে থাকে, কেদারের আফিসের সময় ব্যতীত আর সব সময়েই সে তাহার মাতার নিকট থাকে।

ভুবনমোহিনী আজ তিন মাস যাবৎ ভোলানাথ বাবুর বাসায় আছে। ইতিমধ্যে খোকার একটু অসুখ হওয়ায় ভুবনমোহিনী সেবিন্সব্যাঙ্কের বহি হইতে একশ টাকা ভোলানাথ বাবুর দ্বারা আনাইল, তাহা দিয়া কিছু আবশ্যকীয় জিনিষ কিনিয়া বাকী আশি টাকা রাখিয়া দিল।

যেই দিন নিশকান্ত ভুবনমোহিনীকে ত্যাগ করিয়া গেল, সেই দিন হইতে ভুবনমোহিনী আবার তাহাকে যেন এ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা বোধ করিতে লাগিল। এতদিন তাহার মনে মাঝে মাঝে ক্ষীণ আশার রেখা উদয় হইত, বুঝিবা স্বামী আসিলেও আসিতে পারেন; কিন্তু যখন স্বামীর মুখে ঐ নিদারুণ বাণী শুনিল, তখন তাহার সেই ক্ষীণ আশাটুকুও ধুলিসাৎ হইয়া গেল। সে এমন করিয়া নিজকে কোনও দিন একা বোধ করে নাই। কিন্তু কাল-স্রোতে সমস্ত অবস্থাই সহিয়া যায়। ভুবনমোহিনী বর্ত্তমান অবস্থাকে বিধির লিখন মনে করিয়া অবনত শিরে ধারণ করিল।

স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কিছু দিন পরে তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যে স্বামী হইতে গোপন করিয়া এক হাজার টাকা রাখিয়াছিল, তাহা তাহার রাখা কি কর্ত্তব্য? একবার তাহার মনে হইল, তাহা তাহার স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই টাকাতে তাহার অধিকার কি, স্বামী যখন তাহার পুত্র সহ তাহার বাড়ী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছেন, তখন তাহার শ্বশুর-কুলের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তখন আর তাহার শ্বশুর-কুলের ধনের অধিকার কি? সেই টাকা তাহার স্বামীরই ন্যায্য

প্রাপ্য, তাহার কিংবা তাহার পুত্রের তাহাতে কোনই অধিকার নাই। আবার তাহার মনে হইতে লাগিল, স্বামী তাহাকে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া তাহার এবং তাহার পুত্রের ভবিষ্যৎ আহারের সংস্থান করিবার আদেশ দিয়াছেন। সেই কথা মনে হওয়ামাত্রই যেন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক বলিয়া কি তাহারা এতই অধম! স্ত্রীলোক অবলা, এতই কি অবলা! সে কি নিজে উপার্জ্জন করিয়া তাহার এবং তাহার পুত্রের ভরণপোষণ করিতে পারে না? সে স্বামীকে কিংবা জগৎকে কি দেখাইতে পারে না যে স্বামী ত্যাগ করিলেও স্ত্রীলোক স্বাবলম্বন করিয়া সসম্মানে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে? এইরূপ নানা আলোচনা করিয়া সে ঠিক করিল,—না, স্বামীর ন্যায্য টাকা সে আর রাখিবে না। যখন শ্বশুর-কুলের সহিত সমস্ত সম্পর্ক তাহার ঘুচিয়া গেল, তখন সেই টাকা আর সে রাখে কেন? তাহা সে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিবে। আবার কিছুক্ষণ পরেই তাহার মনে হইল,—কি উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে, সে ত এমন কোনও কাজ জানে না, বা তাহার এমন কোনও বিদ্যা নাই, যাহাতে তাহার মান, সম্ভ্রম, ইজ্জত বজায় রাখিয়া সে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে? তখন সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। সে যেন তাহার প্রতি পদে পদে বিপদ দেখিতে লাগিল। তখন আবার তাহার মনে হইতে লাগিল,—না, এখন টাকা পাঠাইয়া কাজ নাই, দেখি অদৃষ্টে কি আছে। যদি বর্ত্তমান অবস্থা হইতে আরও দুরবস্থা হয়, তাহার ত নিজের ও শিশুপুত্রের ভরণপোষণ করিতে হইবে। এখন যেন ভোলানাথ বাবুর আশ্রয়ে আছে, সে আশ্রয় কতকাল থাকিবে কে জানে? যদি এই আশ্রয় হইতে সে বঞ্চিতা হয়, তবে ত তাহার সামান্য আহার সংস্থানের জন্যও টাকার দরকার হইতে পারে। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া সে টাকা সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিল

না। সে ভোলানাথ বাবুর পরিবারস্থ সকল লোকের মন যোগাইয়া চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরেই সে বুঝিতে পারিল, ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী তাহার উপরে বড় প্রীত নহেন। সে তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহার নিকট প্রস্তাব করিল, "মা, আপনি ঠাকুরকে উঠিয়ে দিন না, আমিই দুবেলা পাক চালাব। আমার ত এখানে কোনও কাজ নাই, এম্নি ভাবে জীবন কাটান বড় কষ্ট।"

ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী আর ভোলানাথ বাবু সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। ভোলানাথ বাবুর যেমন সাদা মন, মহৎ অন্তঃকরণ, ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী তেমন সঙ্কীর্ণ-আত্মা, কলহপ্রিয়, অহঙ্কারী। জগতে তিনি তাহাকেও বড় ভাল দেখিতেন না। ভুবনমোহিনীর কথা শুনিয়া তিনি ঠিক করিলেন, সে নিশ্চয়ই চরিত্রহীনা। যেদিন মোকদ্দমা শেষ হওয়ার পর ভোলানাথ বাবু স্থায়ীরূপে ভুবনমোহিনীকে তাহার বাসায় নিয়া আসিলেন, ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী তাহা জানিয়া ভোলানাথ বাবুকে বলিলেন,—তুমি ত এক ভেবা চেগা গঙ্গারাম, তোমার কি আক্কেল পছন্দ আছে? তুমি এমন জেনেও এম্নি সুন্দরী মাগীকে আমার এই ছেলেপিলের সংসারে আন্‌লে কেন? এসব দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের হাড়ে হাড়ে বুদ্ধি, তাদের কথা, ভাবভঙ্গি এক, মনে সম্পূর্ণ আর এক। এসব লোক কি ভদ্রলোকের পরিবারে আন্‌তে হয়? এখনই একে এখান থেকে দূর কর। তার স্বামী তাকে দোষী মনে করে ত্যাগ করে গেল, আর উনি তাকে ইষ্টদেবতা ঠাকুরের মত মাথায় করে নিয়ে এলেন, আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও কর্‌লেন না!

ভোলানাথ বাবু বলিলেন,—বল্‌ছ কি, কাকে তুমি কি বল্‌ছ? এ যে আমার মেয়ে, আমি যে তার বাপ। এ যে আমার মা, আমি যে তার ছেলে। মার স্বভাব ভাল কি খারাপ তাকি ছেলে বিচার করতে পারে? গিন্নি, তোমার থেকে সংসার আমি অনেক বেশী দেখেছি, আমার মা সতী

সাধ্বী, কলিকালের সাবিত্রী, দময়ন্তী। তুমি ওকে চিন্‌তে পারনি গিন্নি, একবার চোখ খুলে ভাল করে দেখ, চিন্‌তে পারবে। তুমি ওর চরিত্রের বিরুদ্ধে কোনও কলঙ্কের কথা বোলো না, ওর চরিত্রের বিরুদ্ধে মনে কোনও কলঙ্কের রেখা আনাও পাপ হবে, এ সব কথা শুন্‌লে ওর মনে ব্যথা লাগবে, তার দীর্ঘনিশ্বাসে তোমার সংসার ভস্ম হয়ে যাবে। আর বল্‌ছ, ছেলেপিলের ঘর, এ বাড়ীতে আছে আর কে? আমি, অতুল, আর ননী! ননী ছেলেমানুষ, অতুল লেখাপড়া শিখেছে, সে যখন জানবে, এই মেয়েকে আমি মেয়ে বলে গ্রহণ করেছি, তখন সে কি তার বোনকে দেখে তার চরিত্র ঠিক রাখ্‌তে পার্‌বে না? আর এ মেয়েও জেনো জ্বলন্ত আগুন, এর কাছে অসদ্ অভিপ্রায়ে কেউ গেলে, সে জ্বলে পুড়ে মরবে। গিন্নি, আমি যতকাল বেঁচে থাকি, মা আমার কাছেই থাকবে। দেখো ওকে কিন্তু কেউ যেন কোনও কটূ কথা বলো না। মা যেন কোনও প্রকার মনে ব্যথা না পায়। তুমিও জান্‌বে মেয়ের মত মেয়ে পেয়েছ, যদি যত্ন করে রাখ্‌তে পার।

তুমি উকিল মানুষ, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে পারে কার সাধ্য? তুমি ত তোমার অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে একগদ খুব বলে গেলে, কিন্তু আমিও বলি, একে আমার সংসারে স্থান দিলে আমার সংসারে আগুন জ্বলিবে। আমরা স্ত্রীলোকের চরিত্র যেমন বুঝি, তোমরা তার অর্দ্ধেকও বোঝ না। আমি আবারও বলি, যদি সংসারের মঙ্গল চাও, একে অন্য কোথায়ও সংস্থান করে দেও। শুধু ভাবের উপর চলো না।

গিন্নি, আর ওকথা মুখ দিয়ে এনো না। এ মেয়ের দোষে আমার সংসারের কিছুই হবে না। যদি আমার সংসারের অমঙ্গল হয়, তবে তা আমার সংসারের লোকের দোষেই হবে।

ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী দেখিলেন, ভুবনমোহিনী সম্পর্কে ভোলানাথ

বাবুর সংকল্প অটল। তাহাকে এ বাড়ী হইতে কিছুতেই স্থানান্তরিত করা যাইবে না। ভুবনমোহিনী ভোলানাথ বাবুর সংসারে রহিয়া গেল সত্য, কিন্তু ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী তাহাকে কোনও দিনই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে সদাসর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিতেন, সামান্য ত্রুটি হইলেই তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে ত্রুটি করিতেন না। কিছুদিন পরেই ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী ভোলানাথ বাবুর নিকট বলিলেন, অতুল আর ছুকরি যে শোয় তার মধ্যকার দরজা ভেঙ্গে গেছে, তা বন্ধ করা যায় না, মিস্তরি ডেকে এখনই তা সমান করাও।

ভোলানাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন,—স্ত্রীলোকেরা বড়ই সন্দেহ-আত্মা। তোমার কেবল মিছামিছি সন্দেহ, অতুল কি তার বোনের সম্ভ্রম নষ্ট কর্‌বে? যাক্, আমি তোমার মনস্তুষ্টির জন্য মিস্তরি ডাকিয়ে তা শীগ্‌গিরই সমান করে দেবো।

ভোলানাথ বাবুর আর মিস্তরি ডাকা হইল না, সুতরাং দরজাও ভাঙ্গাই রহিয়া গেল। ভুবনমোহিনী ঠাকুর উঠাইয়া দেওয়া সম্পর্কে প্রস্তাব করিলে ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী দেখিলেন, এ প্রস্তাব নেহাত মন্দ নহে, ভুবনমোহিনীকে শুধু শুধু বসাইয়া খাওয়ান হইতে তাহাদ্বারা কতকটা টাকার সঙ্কুলান হইবে। ভুবনমোহিনী যখন এখানে স্থায়ী ভাবেই রহিল, তখন তাহাদ্বারা কিছু কাজ আদায় করিয়া নেওয়া মন্দ কি।

ভুবনমোহিনীর প্রস্তাব ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী সাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনি ভোলানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই ঠাকুর উঠাইয়া দিলেন, ভুবন-মোহিনী রন্ধনশালায় ভর্ত্তি হইল। সেই দিবস মধ্যাহ্নে ভোলানাথ বাবু আহার করিতে বসিলে, ভুবনমোহিনী তাহাকে ভাত দিতে গেল; তিনি ভুবনমোহিনীর দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে বলিলেন,—একি মা, আজ তুই যে? ঠাকুর কই?

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল,—ঠাকুর উঠিয়ে দিয়েছি। আমার ত কোনও কাজ নেই, তাই মার কাছে প্রস্তাব করেছিলাম, ঠাকুর উঠিয়ে দিতে, আমিই রান্না করব।

ভোলানাথ বাবু কিন্তু ভুবনমোহিনী কথাটা যত সহজে বলিল তত সহজে নিতে পারিলেন না। তিনি অনুমান করিলেন, ইহার মধ্যে তাহার স্ত্রীর হাত আছে। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন, এ বিষয়ে তাহার আর বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। ভুবনমোহিনী যদি তাহার স্ত্রীকে কোনও কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে পারে, তবে তাহা ভুবনমোহিনীর পক্ষেই মঙ্গল। তাহার স্ত্রীর স্বভাব তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন।

ভোলানাথ বাবু ভুবনমোহিনীকে হাসিয়া বলিলেন,—যা হোক মা, তা হলে ভালই হয়েছে, এখন থেকে খাওয়াটা ভাল হবে। মা অন্নপূর্ণা আমার, তুই পাক কর্‌বি, এখন থেকে ছেলের আর খাওয়ার কোন কষ্ট হবে না। আর, মেয়ে-ছেলে পাক না কর্‌লে কি পাক হয়? পাক করা কি আর পুরুষের বিদ্যা? কথায় বলে মা, যার কম্ম তার সাজে অন্যের তাতে লাঠি বাজে। বুঝ্‌লি মা?

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল,—সে কেমন বাবা? কেন ঠাকুর কি পাক কর্‌তে পার্‌ত না? পাক মন্দ কর্‌ত কি?

আর মা সে কথা বলিস্ না, ঠাকুরের কথা শুন্‌বি তবে শোন্। ঠাকুর বেটারা মাইনে নিবে লম্বা লম্বা, কথা শুনাবে আরও লম্বা, রান্নার সময় অষ্টরম্ভা! পাকত করে এনে দিল, মুখে দেয় কার সাধ্য? তাতে আবার তাকে কিছু বলা যাবে না, যদি কিছু বল, অমনি তবে বল্‌বে আমি চল্লাম। তাদের কি, তারা মনে করে, ৮।১০ টাকা গতরে খাটলে সব জায়গায়ই পাব, তাতে আবার কথা শুন্‌বো কেন? আমরাও নিরুপায়; তাদের না হলেত চলে না, তাই তারা আমাদের কথা শুনাতেও পারে। এ তাদের অন্যায়

নয় বল্‌ছি, আমরাই তাদের কাছে ঠেকা বেশী, তারা যেমন তেমন করে ১০।১৫ টাকা রোজগার কর্‌তে পারবেই। আর এখন ঠাকুরদের আদরই বা কত? মেয়েরা ত এখন সকলেই হয়ে পড়েছে রোগা, অনেকেরই এখনকার দিনে আগুনের জাল সহ্য হয় না, তাই প্রায় সকল বাসায়ই এখন ঠাকুর চাই। ঠাকুরেরও কদর বেড়ে গেছে, দিন দিন আরও বাড়ছে। মেয়েলোকেরও স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি নাই, তারাও দিন দিন রোগা হয়ে পড়ছে।

ভুবনমোহিনী বলিল, কেন, আমাদের স্বাস্থ্য মন্দ কি?

ভোলানাথ বাবু বলিলেন, মা, তুই যে সহুরে মেয়ে নস্। সহুরে মেয়ে বৌরা গ্রামের মেয়ে বৌদের চেয়ে অনেক অসুস্থ। তার অবশ্য একটা কারণ আছে, গ্রামের মুক্ত বাতাসে স্বাস্থ্য অনেক ভাল থাকে। সেখানে খাওয়া দাওয়া সাধারণতঃ সহরের চেয়ে অনেক ভাল পাওয়া যায়, আর সহুরে মেয়েরা থাকে একেবারে বদ্ধ বাতাসে, অনেকে ত চন্দ্র সূর্য্যের মুখই দেখে না, মাছ দুধত প্রায় একরকম পায়ই না বল্লেই হয়, দুধ যা পায় তাতে জলের ভাগ দুধের ভাগ থেকে থাকে বেশী। ভাল বাতাস পায় না, ভাল খাওয়া পায় না, শরীর পুষ্টি হবে কি দিয়ে? তাই ছেলেবেলা থেকেই সহুরে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ে। আর গ্রামে যে বাড়ীতে মেয়েরা বউরা রোগা হয়ে পড়ে, সে বাড়ীতেও তাদের একরকম ঠেকেও পাক কর্‌তে হয়। কারণ সেখানে ঠাকুরের এত ছড়াছড়ি নাই। যাক্ মা, তুই আমার দুইটা উপকার কর্‌লি, এক দফায় ঠাকুরের আর মুখনাড়া খেতে হবে না, দুই দফায় এখন থেকে খাওয়াটাও ভাল হবে।

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল,— আগে মুখেই দিয়ে দেখুন, মেয়ে কেমন পাক করেছে। আমরা গেঁয়ে লোক, সহরের লোক কোন্‌টা পছন্দ করে জানি না, না জানি আপনার সব জিনিষই নষ্ট করে ফেলেছি।

ভোলানাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন, মা, তুই আর কয় পদ পাক করেছিস্, বল্ ত? প্রথম দিনেই দেখ্ছি আমার বদ্ হজমির ব্যারাম করে তুল্বি? এ পর্য্যন্ত শাক, বটি, ছেচ্‌কি, চচ্চরি, ডাল, মাছের ঝোল দিয়েছিস্, বল্‌ছিস্ আরও আছে, বলি আজ নিমন্ত্রণ খাওয়াচ্ছিস্ নাকি? না, আর তোর রান্না করবার ইচ্ছা নাই? এই এক বেলা রেঁধেই বিকেল বেলা বল্‌বি, আমার অসুখ হয়েছে, শেষে আমার একূল ওকূল দুকূলই যাবে। ঠাকুরও উঠিয়ে দিলি, তোরও অসুখ হবে। আর তোর পাক যা অখাদ্য হয়েছে, তাত ত আমার খাওয়ার নমুনা দেখেই বুঝতে পেরেছিস্। আমাকে যা দিয়েছিলি পাতে কিছু আছে?

মেয়েকে কি এত প্রশংসা করতে হয়, বাবা? আর অসুখের কথা যা বল্‌ছেন, আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, আমাদের অসুখ সহজে হয় না। জ্ঞান হয়ে আমি খুব কমই অসুখে ভুগেছি। আমার মনে পড়ে না, আমি উপোশ করেছি কিনা। আপনার দুকূল যাবে না, সে বিষয়ে কোনও ভয় নাই। আর পদই বা এমন বেশী করেছি কি? আমায় তরকারি, মাছ, ডাল মা এনে দিয়েছিলেন, আমি পছন্দ করে ইচ্ছা মত পাক করেছি। এত জিনিষ দিয়েছিলেন, তা আর আমি বেশী করেছি কি? আপনি যে বল্লেন, ঠাকুর বেটারা খুব কথা শুনায়, সে কি রকম? পাক খারাপ হলেও কিছু বলা যাবে না?

মা, তোকে ত বলেছিই, তোর সহরের অভিজ্ঞতা নাই, তাই ঠাকুরের পাল্লায় পড়িস্‌নি। এই তুই এসে যে ঠাকুরটি দেখেছিলি তার কথাই বলি শোন। সে আজ আমার বাসায়ই প্রায় দশ বার বৎসর যাবৎ ছিল। বাড়ী মুঙ্গেরে। এখন ঠাকুর দুই দেশের বল্‌তে গেলে পাওয়া যায়, এক উড়িয়া আর এক হিন্দুস্থানী। দুই জাতই বেইমানের হদ্দ। তাদের শত

খাওয়াও, শত দেও, তবুও বল্‌বে কিছু খেলাম না, কিছু পেলাম না। কথায় কথায় বলবে, অমুক বাবুর বাড়ীতে যে ছিলাম, তিনি এত দিতেন, এত খাওয়াতেন, তা কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এই ভাবেই এক বাড়ীর প্রশংসা আর এক বাড়ীতে যেয়ে করবে। আর অন্যের কাছে কেবলই তোমার বদনাম করবে। আমার ঠাকুরটির নাম হরি ওঝা। হরি ঠাকুর আমার বাসায় যখন প্রথম এলো, তখন তার মাইনে ছিল পাঁচ টাকা, গুণের মধ্যে ছিল চুলোর জালটা কোনও মতে ঠেল্‌তে পার্‌তো। আমার গিন্নি রোজ তাকে পাক দেখিয়ে দিত, কোনও দিন ভাত ডালটা নিয়ম মত নামাত, কোনও দিন তাও থাক্‌ত আসিদ্ধ। আর অন্যান্য তরকারির কথা এক রকম বাদ দিলেও পার। তখন স্বভাবটি ছিল ভাল. বেশ নম্র, পাক শিখ্‌বার বেশ একটু আগ্রহ ছিল, ছেলে পিলেদের সকলকেই বেশ ভালবাসতো। বছর খানেক কাজ করে বাড়ী চলে গেল, এই এক বছরে পাক মোটামোটি রকমের শিখ্‌ল। বাড়ী থেকে আবার কতকদিন পরে এল, আমার বাসায় তখন যে ঠাকুর ছিল, তাকে উঠিয়ে দিয়ে আবার হরি ঠাকুরকে রাখ্‌লাম, সেবার নিজে হতেই তার মাইনে করে দিলাম ৬ টাকা; এবার মেজাজটাও আগের চেয়ে একটু রুক্ষ হলো। এই রকম করে কি বছরই বাড়ী যেত, আবার বাড়ী থেকে এসে আমার বাসায়ই থাকত। বছর চার পাঁচ থাকবার পর তার একবার আমার বাসায় কলেরা হলো, আমি আর আমার স্ত্রী নিজ হাতে তার বমি, মল পরিষ্কার করে ঔষধ পথ্য দিয়ে তাকে বাঁচালাম, সেই বার তার মাইনে ছিল সাত টাকা। যতই পুরাণ হতে লাগল, মেজাজ তার ততই গরম, কথায় কথায় বলে এমন চাকরি ঢের পাওয়া যায়, তখন সে পাক বেশ শিখেছে। গত বৎসর তার মাইনে ছিল নয় টাকা, গত বৎসরের এক কথা বলি তাতে বুঝ্‌বে সে কি পর্য্যন্ত হয়েছে।

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল, আপনি এত ভণিতা করেও বল্‌তে পারেন !

শোন্‌ই না, এখনও শেষ হয় নি তার কীর্ত্তি। গতবার দোলের সময় হুলির আগের দিন আমার কাছে এসে হুলির পরবি চাইল, আমি বল্‌লাম, আমি ত তোমাকে কোনও দিন হুলির পরবি দেই নাই, আর আমি রংটং, হুলি এগুলো ভালও বাসি না, তাই আমি পরবি দিতে পার্‌ব না। তখন তোমার মা জ্বরে শয্যাগত, দেখ্‌তেই পাচ্ছ আমার বাসায় আর তৃতীয় ব্যক্তি নাই যে পাক কর্‌তে পারে। ঠাকুর ত পরের দিন আর আসেন না। বৈঠকখানায় বসে আছি, চাকর এসে বল্‌লে, ঠাকুর আর কাজ কর্‌বে না, সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখি নিরুপায়, বুঝলাম ত কেন ঠাকুর আস্‌ছেন না। তখন কি করি আট আনা পয়সা নগদ হুলির পরবি ঠাকুরকে দিয়ে তাকে সেধে বাসায় আনি। তারপর ঠাকুরকে দিয়ে সে বেলা পাক করিয়ে তবে খেয়ে দেয়ে কাছারিতে যাই। আর এবার হয়েছিল ঠাকুরের মাইনে দশ টাকা। এবারকার কথা শুন্‌বে ? ঠাকুর যে ডাল পাক কর্‌ত তা প্রায়ই অসিদ্ধ থাকৃত, মাছের ঝোলে হয় জল বেশী পড়্‌ত, না হয় মশলার কাঁচা গন্ধ থাকৃত। আমি এসব দেখে একদিন ঠাকুরকে বল্লাম, এখন কেমন পাক কর ঠাকুর ? দিন যতই যাচ্ছে তোমার পাকের ততই অবনতি হচ্ছে। ডাল ত এখন খাওয়াই যায় না, তাত অসিদ্ধই থাকে, আর মাছের ঝোলও এখন রোজ হয় অখাদ্য, একটু মনোযোগ দিয়ে পাক কোরো। তাতে ঠাকুর উত্তর কর্‌ল, বাবু বুঝ্‌তে পেরেছি, এখন আমাকে আপনার আর রাখ্‌বার ইচ্ছা নাই। আমার হাত ত পাকা ছাড়া আর এখন কাঁচা হয় নাই ; আর ডালের কথা বল্‌ছেন, তা হয় ডালের দোষ, না হয় জলের দোষ, না হয় কড়াইয়ের দোষ। আমি বল্‌লাম, ঠাকুর বল কি ? কড়াইয়ের দোষে ডাল সিদ্ধ হয় না, এমন ত কোনও দিন শুনিনি, কোনও

জায়গায় জলের দোষে ডাল সিদ্ধ হয় না শুনেছি, অবশ্য ডালের দোষে হতে পারে। তাতে ঠাকুর বল্লে, না বাবু, কড়াইর দোষেও অনেক সময়ে ডাল সিদ্ধ হয় না। আমি স্বস্তি বলে মেনে নিলাম। একদিন আমার গিন্নি একটি ডেকচি করে ডাল পাক করলে, ডাল বেশ সিদ্ধ হয়ে মিশে গেল, তাতে আমায় ঠাকুর বল্লে, বাবু, আমাকেও ডেকচি দিন, তাতে ডাল বেশ সিদ্ধ হবে। দিলাম তাকে একটা ডেকচি, প্রথম প্রথম তিন চার দিন বেশ ডাল সিদ্ধ হল, তারপর আবার সেই অসিদ্ধ ডাল। আমি বল্লাম, ঠাকুর এখন কি? তখন ঠাকুর বল্লে, বাবু, এ আমার কপালের দোষ। আমি ঠাকুরকে খুব মন্দ বললাম। আরে পাক করবে কি, সবই ত সময়ের প্রয়োজন। তারা চাইবে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে যেমন তেমন করে পাক নামিয়ে দিতে, তাতে পাক ভাল হবে কি? ঠাকুরকে মন্দ বলায়, ঠাকুর বল্লে, না বাবু আমি বুঝেছি, এখন আমার বরাত মন্দ, আমাকে হিসাব চুকিয়ে দিন। এইত হল আমার হরি ঠাকুরের কির্ত্তি। আর ছেলে পিলেদের সঙ্গে এখন যে ব্যাভার করত, তা আর বল্‌বার নয়। তবে বল্‌বে মা, একে উঠিয়ে দিয়ে আর একজন রাখিনি কেন? সবই এক, তার মধ্যে বরং এই ভাল। এ দেশে চলে গেলে মাঝে মাঝে যে ঠাকুর রাখি তারা এর চেয়েও খারাপ। এ ত পাক এখন শিখেছেই, তারা পাকও করতে পারে না, আবার মেজাজও গরম।

ভুবনমোহিনী হরি ঠাকুরের ব্যাখ্যা শুনিয়া হাসিয়া অস্থির হইল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, বাবা, পয়সা ব্যয় করেও ত আক্কেল কম পেতে হয় না? একটা ঠাকুরের পাছে অন্ততঃপক্ষে সম্ভব আপনার ২০৲ টাকার কম ব্যয় হতো না?

বিশ টাকা বল কি? মাইনে, খাওয়া, জলখাওয়া, ধোপা, নাপিত

ইত্যাদি, তার উপর আবার অপব্যয়, চুরি, এই সব নিয়ে অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশ টাকা মাসে ঠাকুরের পেটে যেত।

তার উপর আবার মুখনাড়া! বেইমান ত কম নয়!

তা আর কি কর্বে, যে যার কাছে ঠেকা তার মুখনাড়া সইতে হবেই। যাহোক্ মা, আজ যেমন খেলাম, এমন খাওয়া যদি রোজ খাওয়াতে পারিস্ তবে বোধ হয় আরও কিছুদিন বাঁচব। এসব ঠাকুরের রান্না খেলে আয়ুঃ শেষ হয়ে আসে, আমারই ত অজীর্ণ রোগ হয়ে আস্‌ছিল, খেতে যেন কেমন একটা খিতখিত বোধ হত

আপনি জিনিষ এনে দিলে আমি পাক করে খুব খাওয়াতে পারব, তাতে আমার আনন্দ আরও বেশী হবে পিতার সেবায় কন্যার কবে নিরানন্দ?

ভুবনমোহিনী দুই বেলাই অতি পরিপাটি করিয়া রান্না করিত। ভোলানাথ বাবুর খাওয়ার সময় রোজ তাহাকে পরিপাটি রকমে পরিবেশন করিয়া তাহাকে বাতাস দিতে থাকিত। ভুবনমোহিনীর ব্যবহারে ভোলানাথ বাবু যেন মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। ভোলানাথ বাবুর মনে হইত, ভুবনমোহিনী যেন প্রকৃতই তাহার কন্যা। ভুবনমোহিনী ভোলানাথ বাবুর স্ত্রীকে তাহার যথাসাধ্য সন্তুষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাকে সন্তুষ্ট করা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। ভুবনমোহিনী সারা দিন এক মিনিটের জন্যও বিশ্রাম করিত না, সর্ব্বদাই একটা না একটা কাজ নিয়া ব্যস্ত। ননী তাহার গুণে বড়ই বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে পড়া শেষ হইয়া গেলেই ভুবনমোহিনীর সাথে গল্প করিতে বসিত, খোকাকে নিয়া খেলা করিতে তাহার বড়ই ভাল লাগিত খোকা ও ননীকে পাইলে আনন্দে অস্থির হইয়া যাইত। ভুবনমোহিনী এখানে আসিবার পর হইতেই অতুল যেন অন্যমনস্ক হইতে লাগিল। ভুবনমোহিনীকে দেখিয়া তাহার

মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহার যেন খাওয়ার আর রুচি হয় না, পড়িবার আর তেমন আকাঙ্ক্ষা হয় না, পড়িতে বসিয়া বই খুলিয়া বসে, বসিয়া কেবল ভুবনমোহিনীর রূপই ধ্যান করে। অতুল দিন দিনই রোগা হইয়া পড়িতে লাগিল। ভোলানাথ বাবু ও তাহার স্ত্রীও অতুলের স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না।

একদিন রাত্রিতে অতুল একা আহার করিতে বসিয়াছে, ভুবনমোহিনী তাহাকে পরিবেশন করিতেছে। ভুবনমোহিনীকে অতুল মোহিনী বলিয়া ডাকিত, ভুবনমোহিনী অতুলকে ছোট বাবু বলিয়া ডাকিত। অতুল কিছু খাইয়াই আর আহারের দিকে মনোনিবেশ না করিয়া ভুবনমোহিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সে আর খায় না। ভুবনমোহিনীও কতক দিন যাবৎ অতুলের অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু কেন যে সে অন্যমনস্ক তাহা সেও বুঝিতে পারে নাই। অতুলকে ঐ অবস্থায় চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ভুবনমোহিনী অতুলকে বলিয়া উঠিল, একি, আপনি কোন্ দিকে চেয়ে আছেন? আপনি খান না কেন, আপনার মাছ ত বিড়ালে নিয়ে যাবে?

অতুল ভুবনমোহিনীর কথায় বড়ই লজ্জা পাইল। সে তৎপরে কোনও মতে কিছু আহার করিয়া চলিয়া গেল। অতুল ভুবনমোহিনীর মূর্ত্তি তাহার মন হইতে কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছিল না। শয়নে স্বপনে জাগরণে ভুবনমোহিনীর মূর্ত্তি যেন তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, তাহার জীবন যেন ততই অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। ভুবনমোহিনীকে না পাইলে যেন সে আর বাঁচিবে না বলিয়া বোধ হইল, সে আর তাহার প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। সে তখন প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িল। সময় সময় বিবেক আসিয়া তাহাকে বলিত, ভুবনমোহিনী তাহার পিতার পালিতা কন্যা, তাহার প্রতি তাহার মনে কি এ ভাব আনা ন্যায় হইবে, তাহার নিকট তাহার কোনও অসৎ

প্রস্তাব করা কি সঙ্গত হইবে? তখন যেন সে কিছুকালের জন্য দমিয়া পড়িত। আবার কুমতি আসিয়া তাহাকে উপদেশ দিত, ভুবনমোহিনী ত আর সতী নহে, সতী হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিবে কেন? সে কেন তাহার জীবনের বাসনা তৃপ্তি করিবে না? পালিতা কন্যা আবার কি? পিতা আশ্রয়হীনা বলিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন মাত্র! তাহার সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। আবার বিবেক বলিল, যদি ভুবনমোহিনী তাহার প্রস্তাবে রাজি না হয়? সে যদি পিতার নিকট এ কথা বলিয়া দেয়? তখনই আবার কুমতি বলিল, দূর হক গে ছাই, তাহা কি হইতে পারে? ভুবনমোহিনী নিশ্চয়ই রাজি হইবে। তাহার স্বামী ত তাহাকে সারা জীবনের জন্য ত্যাগই করিয়া গিয়াছে, তাহার কি যৌবনের ভোগ লালসা নাই? পিতাকে জানান ত দূরের কথা, তাহার প্রস্তাব সে হাসিমুখে গ্রহণ করিবে! এই প্রকারে বিবেক কুমতির দ্বন্দ্বে কুমতিরই জয়লাভ হইল, অতুল তাহার অভিপ্রায় ভুবনমোহিনীকে জানাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। অতুল ভুবনমোহিনীকে তাহার অভিপ্রায় জানাইবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। সুযোগও ঘটিয়া গেল।

আজ ভুবনমোহিনী সকলের খাওয়া দাওয়া সমাপ্ত করিয়া শুইতে যাইবে, তখন রাত্রি প্রায় বারটা। অত রাত্রি পর্য্যন্ত অতুল কোনও দিনই জাগা থাকে না। অতুল আজ তাহার বই খুলিয়া বসিয়া আছে। ভুবন-মোহিনীর ঘরে যাইতে হইলে অতুলের ঘরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। ভুবনমোহিনী শুইবার জন্য তাহার ঘরে যাইতেছে, এমন সময় অতুল অতি মৃদুস্বরে ডাকিল, মোহিনী আমার একটা কথা শুনবে? আমার একটা কথা রাখ্‌বে?

ভুবনমোহিনী আহত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় অমনি ফিরিয়া দাঁড়াইল। সে অতুলের স্বর শুনিয়া ও চোখমুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, অতুলের

অভিপ্রায় মন্দ। সে অতুলের ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, পিতা এত মহৎ আর পুত্র এত নীচ! সে আর অতুল ভ্রাতা ভগ্নী সম্পর্ক! তাহার সম্পর্কে অতুল মন্দ অভিপ্রায় মনে স্থান দেয় কোন্ প্রবৃত্তিতে? বিবেক বলিয়া কি একটা পদার্থ নাই!

সে ফিরিয়া দাড়াইয়া কিছুক্ষণ অতুলের দিকে চাহিয়া রহিল, তৎপরে দৃঢ়স্বরে বলিল, "ছোটবাবু রাত অনেক হয়েছে, এখন ঘুমিয়ে থাকুন, আমার কাছে আপনার বল্‌বার কিছুই নাই।" ইহা বলিয়াই ভুবনমোহিনী তাহার প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল। সে রাত্রিতে ভুবনমোহিনীর আর ঘুম হইল না। সে বুঝিতে পারিল, এ স্থানে আর তাহার বেশী দিন থাকা হইবে না, বা থাকা নিরাপদও নহে। অতুল তাহার জন্য উন্মত্ত হইয়াছে, তাহার রূপই তাহার কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এইরূপ যে তাহাকে কোনও জায়গায়ই তিষ্ঠিতে দেয় না। ভগবান তাহাকে কেন এরূপ দিলেন? এখন তাহার উপায়? সে এখন কোথায় যাইবে? একবার তাহার মনে হইল, আর না, আর পরের মুখাপেক্ষী হইয়া সে জীবন কাটাইবে না, তাহাতে তাহার প্রতি পদে পদে লাঞ্ছনা, সে কি আত্মনির্ভর করিতে পারে না? পরাধীন জীবনের উপর তাহার একটা ধিক্কার জন্মিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ পরেই মনে হইল, কোথায় যাইবে, সে যে একেবারে নিঃসহায়া। ক্রমেই যেন তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা কমিয়া আসিতে লাগিল, মনে মনে বলিল, যে নারীকে পতি তাহার চরণে স্থান দেয় না, জগতে বুঝি তাহার কোথাও স্থান নাই। অবশেষে মনে মনে বলিল, দেখা যাউক, কপালে কি পর্য্যন্ত কষ্ট ভোগ আছে!

অতুল ভুবনমোহিনীর নিকট বাধা পাইয়া ও তাহার প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখিতে পারিল না। সে ভুবনমোহিনীকে পাইবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিল। সে সারা দিনই কেবল ভুবনমোহিনীর রূপই ধ্যান

করে। ভুবনমোহিনীকে তাহার পাওয়া চাই-ই। এবার সুযোগ পাইলে ভুবনমোহিনীকে সে ভাল করিয়া বলিবে, তাহার শেষ আকিঞ্চন তাহার পায়ে ঢালিয়া দিবে।

উক্ত ঘটনার তিন দিবস পরে ভুবনমোহিনীকে তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিবার সুযোগ আবার উপস্থিত হইল। রাত্রিতে ভুবনমোহিনী রান্নার কাজ শেষ করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া নিজে আহার করিয়া শুইবার জন্য তাহার ঘরে যাইতেছে; তখন রাত্রি প্রায় এগারটা, অতুল বই নিয়া বসিয়াছিল। অতুল হঠাৎ ভুবনমোহিনীর বস্ত্র ধরিয়া টান দিয়া বলিল, মোহিনী, আজ আমার কথা শুন্‌তেই হবে।

ভুবনমোহিনী ফিরিয়া দাড়াইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে গম্ভীর স্বরে বলিল, বলুন, কি বল্‌বেন।

অতুল বলিল, মোহিনী, আমি তোমার জন্য পাগল হয়েছি, তোমাকে না পেলে আমি বাঁচ্‌ব না। চল তোমাকে নিয়ে আমি এখান থেকে পালাই। পালিয়ে অন্য জায়গায় যেয়ে সেখানে আমরা স্বামী স্ত্রী রূপে বাস করব। আমি লেখাপড়া শিখেছি, আমি উপার্জ্জন করব. দুজনে মহাসুখে সারা জীবন থাকব। মোহিনী, আমার কথায় রাজি হয়ে তুমি আমাকে বাঁচাও।

ভুবনমোহিনী অতুলের কথায় বাধা না দিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহার কথা শুনিল। তখন বলিল, ছোট বাবু, এই বুঝি আপনার বিদ্যাশিক্ষা কর্‌বার ফল? আপনি না খুব বিদ্বান্? আপনার মা বোন্ জ্ঞান নাই? আমি না আপনার ভগ্নী? আমি না আপনার পিতার পালিতা কন্যা? আপনি এ বাসনা ত্যাগ করুন। আপনি বিয়ে করুন, আমি আপনার বউকে মানুষ করে দিবো। আমি আপনার বোনের মতই সারা জীবন আপনার কাছে থাক্‌ব। আর জান্‌বেন, আমার স্বামী জীবিত, আমি কি দ্বিচারিণী হতে পারি?

অতুল ভুবনমোহিনীর অতি সন্নিকটে আসিয়া বলিল, "মোহিনী, আমি জ্ঞানহারা হয়েছি। তুমি আমাকে বাঁচাও, নইলে আমি আত্মহত্যা করব। তোমাকে আমি চাই-ই।" ইহা বলিয়াই সে ভুবনমোহিনীকে ধরিতে আসিল। ভুবনমোহিনী একপদ পশ্চাৎ সরিয়া যাইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, ছোট বাবু, এ সব কি, আমি এখনই আপনার বাবাকে ডাক দিব।

ভোলানাথ বাবু সে দিন ঘুমাইয়া ছিলেন না, তাহার প্রকোষ্ঠে বসিয়া একটা মোকদ্দমার কাগজ দেখিতেছিলেন, তিনি ভুবনমোহিনীর চীৎকার শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিলেন। অতুলের ঘরে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা দেখিয়া তিনি ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার স্ত্রীও আসিলেন। ভোলানাথ বাবু দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, তাহার গুণধর পুত্র কি কাজ করিয়াছে। দেখিলেন, ভুবন-মোহিনী রাগে কাঁপিতেছে, অতুলচন্দ্র পিতামাতাকে দেখিয়া মাথা হেট করিয়া বসিয়া রহিল।

ভোলানাথ বাবুর রাগে তখন শরীর কাঁপিতে লাগিল। ভোলানাথ বাবুকে কেহ কোনও দিন রাগ করিতে দেখে নাই। তিনি ভুবন-মোহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বল্ত মা, কি হয়েছে? সত্যি বলিস্ কিছু গোপন করিস না।

ভুবনমোহিনী আগা গোড়া সমস্ত কথা ভোলানাথ বাবুর নিকট বিবৃত করিল। তখন ভোলানাথ বাবু অতুলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কি, তোমার উত্তর কি?

অতুল তখন ঢোক গিলিতে গিলিতে বলিল, ও মিথ্যা কথা বল্ছে। ওর আগাগোড়া সব কথা মিথ্যা। আমি কেন ওকে ওসব কথা বল্তে যাব! ওই আমাকে বরাবর জ্বালাতন করছিল, আজ ওই আমার কাছে প্রস্তাব

করেছিল, চল, আমরা দুজন পালিয়ে এখান থেকে অন্যত্র যাই। আমিই তাতে রাজি হচ্ছিলাম না। ও বলছিল—

ভোলানাথ বাবু ধমক দিয়া অতুলকে থামাইয়া দিলেন, আর বলিতে দিলেন না। বলিলেন, কুষ্মাণ্ড, তুই না বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় পাশ করে মহা বিদ্বান্ হয়েছিস্? তোদের বিদ্যালয়ে বুঝি নীতি বিদ্যা পড়ান হয় না? মা বোন্ তোর জ্ঞান নাই? এ যে তোর বোন্, আমার পালিতা কন্যা। আমি যে অনুক্ষণ মা মা করে অস্থির। আমার মেয়ে ছিল না, মেয়ের জন্য সময় সময় বড়ই আক্ষেপ করতাম, এ যে আমার সে সাধ মিটিয়েছে। গাধা, পশু, তুই মহাদোষ করেছিস্, আবার মিথ্যা কথা বল্‌ছিস্! আবার তুই ওর ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস্! আমি ওকালতি কর্‌তে কর্‌তে ঘাগি হয়ে গেছি, আমার চোখে তুই ধূলা দিতে চাস্? তোর সাহস ত কম নয়। তুই কার সঙ্গে খেলা কর্‌তে গিয়েছিলি জানিস? এ যে আগুন, আগুনে হাত দিতে গিয়েছিলি, এখনই পুড়ে মর্‌তি। সতীর অভিশাপে ভস্ম হয়ে যেতি। সতীর অভিশাপ কেমন তা তুই বইতে পড়িস্ নি? রামায়ণ যদি পড়ে থাকিস্ তবে জানবি সীতার অভিশাপে সমস্ত লঙ্কাপুরী ছারখার হয়ে গেল, আর তুই ত কোন্ ছার? আমার মা যে সীতার মত সতী। গরু, তুই কার অপমান করলি? তুই যে আমারও অপমান করলি। আমি যে আমার মাকে আমার বাড়ী নির্ভয়ের স্থান বলে আশ্রয় দিয়েছিলাম, তুই যে আমার সে আশ্রয়কেও আজ কলুষিত কর্‌লি! তোর এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে! তুই এখনই বাইর বাড়ী যা, সেখানে যেয়ে আজ শো, শুয়ে শুয়ে সমস্ত রাত্রি অনুতাপ কর। কাল ভোরে ভুবনমোহিনীর পা ধরে তোর ক্ষমা চাইতে হবে।

ভুবনমোহিনী ভোলানাথ বাবুর কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী, ভোলানাথ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি যে

বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলে। তুমি মোহিনীকে বিশ্বাস করে অতুলকে যা তা বল্‌ছ, আমি অতু··কেই বিশ্বাস করি। এ মোহিনীরই দোষ, আমার ছেলে এমন নয়, সে কি এমন কাজ করতে পারে?

ভোলানাথ বাবু স্ত্রীকে ধমক দিয়া বলিলেন, "দেখো, কুপুত্রের পক্ষ আর অবলম্বন কোরো না। আমি.না বলেছি, সতীর অভিশাপে সবংশে ধ্বংশ হয়ে যাবে। যাও আমার মাকে যেয়ে শান্ত কর।" ইহা বলিয়াই তিনি ভুবনমোহিনীকে বলিলেন, "আয় মা তুই আমার সঙ্গে। মা, আমার আশ্রয় কলুষিত হয়েছে বলে তুই আমায় ক্ষমা করবি?" এই কথা বলিতে যেন ভোলানাথ বাবুর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। ভুবনমোহিনীকে তিনি এক অভিনব চক্ষে দেখিয়া ছিলেন; নিজের কন্যাকেও বুঝি লোকে তেমন চক্ষে দেখে না ভুবনমোহিনীকে তিনি যেমন চক্ষে দেখিতেন।

ভুবনমোহিনী ভোলানাথ বাবুর বুকের মধ্যে মাথা লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ভোলানাথ বাবুকে ভুবনমোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা, আপনি বলছেন কি, এ সব আমার অদৃষ্ট দোষ। আপনি সে বিষয়ে কোনও দুঃখ করবেন না।" তৎপরে ধীর গম্ভীর স্বরে বলিল, "রাত অনেক হয়েছে, আপনি যেয়ে শুয়ে থাকুন, আমি খোকাকে নিয়ে শোব এখন। আর, ছোট বাবু ছেলে মানুষ, তাকে ক্ষমা করুন"

ভোলানাথ বাবু শুধু বলিলেন, দেখলে গিন্নি, আমার মা কত মহৎ? আমার মা অতুলের চেয়ে অনেক ছোট, অথচ সে কত বড় সংযমী, কত বড় বুদ্ধিমতী!

ভোলানাথ বাবু তাহার প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেলেন। ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী কিছুক্ষণ বাদে শুইতে গেলেন। যাইবার সময় ভুবনমোহিনীকে

বলিয়া গেলেন, ছুরির নেকামির সীমা নাই। এসব নেকামির এখানে জায়গা হবে না বল্‌ছি। আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি এখানে তোমার স্থান হবে না, তুমি অন্য জায়গা খোঁজ। তোমার জন্য আমি আমার ছেলেকে হারাতে পারি না। তুমি এখানে থাক্‌লে আমার সোনার সংসারে আগুন লাগবে।

ভুবনমোহিনী এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য না করিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। অতুল বাহির বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ভুবনমোহিনী শুইয়া শুইয়া ভবিষ্যৎ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিল। এখানে এঘটনার পরে আর এক দিনও তাহার পক্ষে থাকা কর্ত্তব্য কি না। অতুল পতঙ্গের ন্যায় তাহার রূপ-বহ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছে। যদি সে এখানে থাকে তবে এ আহুতি হইতে উদ্ধার পাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং তাহাকে অতুলের চক্ষুর অন্তরাল হইতে হইবে। এখানে থাকিয়া ভোলানাথ বাবুর সুখের পরিবার ত সে ছারখার করিতে পারে না। পিতা পুত্রে মনোমালিন্য, স্বামী স্ত্রীতে মনোমালিন্য অবশ্যম্ভাবী যদি সে এখানে থাকে। আর তাহার মঙ্গলের দিকে দেখিলেও তাহার একদিনও এখানে থাকা উচিত নয়। বহু চিন্তা করিয়া সে সেখান হইতে অন্যত্র যাওয়াই সুস্থির করিল। তখন মনে হইল, কোথায় সে যাইবে? হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, কলিকাতায় অনেক বড় লোকের বাড়ীতে রাঁধুনি রাখে, সে সেখানে যাইয়া রাঁধুনিবৃত্তি করিয়া নিজের ও পুত্রের জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। ভোলানাথ বাবু আজ কতক দিন হইল কলিকাতায় শেষ রাত্রির গাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে সে শুনিয়াছিল, তাহাদের বাসা হইতে ঠিক পশ্চিমদিকে কতকটুকু গেলেই ষ্টেসন। এই কথা মনে হওয়া মাত্রই সে আর বিশেষ চিন্তা করিল না, অমনি পোর্টমেণ্ট হইতে তাহার কয়েকখানা কাপড়, খোকার কয়েকটি জামা

নিয়া একটি গাঁট বাঁধিল। তাহার নিকট যে আশিটি টাকা ছিল তাহাও সেবিঙ্গবেঙ্কের বহিখানা সঙ্গে নিল। খোকাকে কোলে করিয়াও গাঁটটি হাতে করিয়া সে ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইল। শেষ রাত্রিতে টিকেট কিনিয়া সে কলিকাতায় রওনা হইয়া গেল। গাড়ীতে বসিয়া তাহার যেন মনে হইতে লাগিল, আজ তাহার নির্ম্মুক্ত জীবন।

কেদারের মাতার অবস্থা খুব খারাপ, কখন কি হয় বলা যায় না। কেদার বড় সাহেবকে রমেশবাবুর দ্বারা বিশেষ ভাবে বলাইয়া এক মাসের ছুটি নিল। তাহার মাতার গুরুদেব লিখিয়াছেন, তিনি তাহার মাতাকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় আসিবেন, কেদার যেন অতি ভোরে তাহার জন্য শিয়ালদহ ষ্টেসনে অপেক্ষা করে। কেদার সেই মতে অতি ভোরে শিয়ালদহ ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। ষ্টেসনে ঢাকা মেইলের গাড়ী আসিল। কেদার তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল, কোথায়ও তাহার মাতার গুরুদেব নাই। তখন কেদার তাহার বাসা অভিমুখে রওনা হইবার উদ্যোগ করিল। তখন রেলের আগন্তুক লোক প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছে। কেদার দেখিতে পাইল, একটি সুন্দরী যুবতী ষ্টেসনের এক স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ভাব গতিক দেখিয়া কেদারের মনে হইল, সে যেন বড়ই বিপদে পড়িয়াছে। কেদার মনে করিল, সম্ভবতঃ যুবতীর সঙ্গে যে পুরুষ আসিয়াছিল তাহাকে সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কেদার কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া যুবতীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, যখন দেখিল, পুরুষ মানুষ আর কেহ আসে না, অথচ যুবতীও সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া আছে, তখন কেদার যুবতীকে উদ্ধার করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইল।

ভুবনমোহিনীর শিয়ালদহ ষ্টেসনে নামিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একবারও মনে হয় নাই বা সে একবারও চিন্তা করে নাই, সে সর্ব্ব প্রথমে কোথায়

যাইয়া উঠিবে, কেমন করিয়া চাকরি সংগ্রহ করিবে। সে সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি রেল ষ্টীমারে আসিল, অথচ এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে চিন্তা করে নাই, সে এখানে আসিয়া কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে। কলিকাতায় তাহার আত্মীয় স্বজন কেহ ত ছিল না। সে যেন এক তন্দ্রার আবেশে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বিশ্বাস ছিল, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইলেই এক উপায় হইবে, স্বাবলম্বন না করিয়া পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকলে কেবল নানা প্রকার বাঁধা বিঘ্নের কথা মনে উদয় হইয়া মনকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যদি সে স্বাবলম্বন করিতে পারে, এ সুবিস্তীর্ণ জনাকীর্ণ বিশ্ব সংসারে তাহার এবং তাহার পুত্রের আহারের অভাব হইবে না। অনুপায়েই উপায় উদ্ভাবন হইবে। শিয়ালদহ ষ্টেসনে যাইয়া যখন ভুবনমোহিনী নামিল, তখন দেখে লোকে লোকারণ্য। প্রকাণ্ড সহর, প্রকাণ্ড ব্যাপার, সে এই সব দেখিয়া যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে তখন সর্ব্বপ্রথমে শিশু পুত্রকে কোলে করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, এখন সে কি করিবে, কোথায় যাইবে। ঠিক এমনি সময় কেদারনাথ আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বোন্, তোমার সঙ্গের পুরুষ কি তুমি হারিয়ে ফেলেছ?

ভুবনমোহিনী কেদারের কথার উত্তর দিতে একটু সংকোচ বোধ করিতে লাগিল। সে মাথার ঘোমটা একটু টান দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেদার তাহাকে মৌন থাকিতে দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, বোন্, তুমি আমার কাছে কোনও লজ্জা বোধ করো না, আমাকে তোমার বড় ভাই বলে মনে কোরো, তুমি নিঃসংকোচে বল, তোমার সঙ্গের লোক কোথায়? আমি তাকে খুঁজে এনে দেই। চুপ করে থেকো না বোন্, বল, আমার কি কর্‌তে হবে?

ভুবনমোহিনীর কেদারনাথের কথায় মনে হইল, এতদিন পরে বুঝি সে প্রাণের সন্ধান পাইল, ইহার কাছে তার লজ্জা বা ভয় করিবার কিছুই নাই। কেদারনাথের কথায় এমনিই একটা আন্তরিকতা ছিল, ভুবনমোহিনীর প্রাণ কেদারনাথের দিকে আকৃষ্ট হইল। সে এবার ঘোমটা টান দিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে পুরুষ কেউ নাই। আমি এ বিশ্ব সংসারে একা। আমি একাই এসেছি, আমি বড় অনাথিনী, আমার কেউ নাই।"

ভুবনমোহিনী এমন ভাবে কথাগুলি বলিল যে তাহা কেদারনাথের মর্ম্মের অন্তস্থলে যাইয়া বিদ্ধ হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, যুবতীর প্রতিবর্ণ ঠিক। সে যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কেদারকে ঐ ভাবে থাকিতে দেখিয়া ভুবনমোহিনী বলিল, "আপনাদের ব্রাহ্মণী লাগ্‌বে? আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, যদি দরকার হয় আমি সব কাজ কর্‌তে পার্‌ব।" ভুবনমোহিনী এক নিশ্বাসে এ কথা-গুলি বলিয়া ফেলিল।

কেদারের তখন যেন চমক ভাঙ্গিল। সে যেন এতক্ষণ এ পৃথিবীতেই ছিল না, তাহার মনে হইতেছিল, এমন অপূর্ব্ব রূপসী যুবতী, অথচ এত সরলা, সে একা এ সংসারে কি করিয়া ভাসিতে পারে? ভুবন-মোহিনীর কথা শুনিয়া কেদার বলিয়া ফেলিল,—আচ্ছা, তোমার যখন এ পৃথিবীতে কেউ নাই বল্লে, তা হলে আজ থেকে তোমার একজন আত্মীয় জুটে গেল। আজ থেকে আমি তোমার দাদা হলাম, তুমি আমার ছোট বোন হলে। আমার একজন ব্রাহ্মণীর দরকার, তুমি আমার আর আমার মার পাক কর্‌বে, আমরা সকলে মিলে খা'ব। এসো আমার সঙ্গে, আমার বাসায় চলো। সঙ্গে বুঝি তোমার এই জিনিষ?

ইহা বলিয়াই কেদার ভুবনমোহিনীর কোল হইতে খোকাকে নিজের কোলের মধ্যে আনিয়া বলিল, "মামু চল্, মামার বাড়ী চল্।" তৎপরে ভুবনমোহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এস বোন্ চল, গাড়ী করি গে। আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করে ত কোনও ফল নাই "

কেদারের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ভুবনমোহিনীর মনে হইতে লাগিল, এ প্রকৃত দেবচরিত্র পুরুষ। ভগবান এতদিনে তাহার আশ্রয়-স্থান জুটাইয়া দিয়াছেন। কেদারকে তাহার প্রকৃত দাদা বলিয়াই জ্ঞান হইতে লাগিল। সে বিনা সংকোচে কেদারের অনুবর্ত্তিনী হইল।

কেদার গাড়ী করিল। তৎপরে ভুবনমোহিনীকে নিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীতে উঠিয়া কেদার ভুবনমোহিনীকে বলিল,—বল ত বোন্, তোমার ইতিবৃত্ত, তোমার নাম কি, তোমার বাড়ী কৈ, এখানে তুমি কি করে এলে?

কেদারনাথের কার্য্যকলাপ ও কথার আন্তরিকতা দেখিয়া ভুবনমোহিনীর লজ্জা ও সংকোচের ভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গেল। সে তখন অম্লান বদনে ধীরে ধীরে তাহার জীবনের সমস্ত ইতিহাস কেদারের নিকট বিবৃত করিল। তাহা শুনিয়া ভুবনমোহিনীর প্রতি কেদারের হৃদয় শ্রদ্ধায়, স্নেহে ও সম্ভ্রমে ভরিয়া গেল। তাহার মনে হইতেছিল, সে বুঝি একটি উপন্যাস শুনিতেছে, বাস্তব জীবনে যে এমন একটি কাহিনী হইতে পারে, তাহা তাহার ধারণাতেই পূর্ব্বে আসিত না। সে তখন ভুবনমোহিনীকে বলিল,—বাস্, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা চুক্তি হয়ে গেল। প্রথম, তুমি আমার ছোট বোন্ হলে, আমি তোমার দাদা হলাম। তুমি রাজি?

ভুবনমোহিনী বলিল,—নিশ্চয়ই রাজি।

দ্বিতীয় চুক্তি, আমি যতদিন বাঁচব, তুমি আমার কাছে থাকবে, যদি তোমার স্বামী না নেয়। তুমি রাজি?

নিশ্চয়ই রাজি। আমার যে দাদা আর অন্য কোথাও স্থান নাই।

বাস্, তা হলে আজ থেকে তুমি আমাকে কেদার দা বলে ডাকবে, আমি তোমাকে মোহিনী বলে ডাকবো। কেমন? তা ভাল হবে না?

আচ্ছা। কিন্তু দাদা আমি বড় গরীব। সারা জীবন যে আপনার দুটী জীবনের ভার বইতে হবে।

কেদার এবার ভুবনমোহিনীকে একটু ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, তুই এখন আমার ছোট বোন্ হলি, আমি এখন তোর দাদা হলেম, তখন আর এমন ভাবে কথা বল্‌লে চল্‌বে না। আমি তোকে "তোমার" থেকে তুইতে এনেছি আর তুই আমাকে "আপনার" থেকে তুমিতে আন্‌বি। বুঝ্‌লি? আর বুঝ্‌লি, দাদার কাছে কিন্তু কোনও কথা গোপন করিস্ না, যখন যা দরকার হয় আমাকে বল্‌বি। বুঝ্‌লি? আমার এক বোন আছে, তোর সমান বয়সি, না সে তোর থেকে কিছু ছোট হবে। সে যখন এখানে আস্‌বে তখন দু বোনে খুব স্ফূর্ত্তিতে থাক্‌বি, কেমন?

কেদার ঝড়ের মত কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিল। ভুবনমোহিনীর মনের দুঃখ, বেদনা যেন ঝড়ের মুখে দূর করিয়া দিল। ভুবনমোহিনীর মনে হইতে লাগিল, কেদার যেন তাহার কতকালের পরিচিত।

ভুবনমোহিনী কেদারের কথার উত্তর দিল,—দাদা, তুমি যে আমার সত্যিকার দাদা, তোমার কাছে আমার গোপন করবার ত কিছুই নেই, আমি যে সম্পূর্ণ অনাথিনী দাদা।

আবার সেই কথা। অনাথিনী কি লো, আমি যে তোর দাদা।

আর তোর টাকার জন্ত কোনও চিন্তা করতে হবে না। আমিই তো রোজগার কর্‌ছি, সংসারে আছে আমার মা, আর আমি, তারপর আজ থেকে হলি তুই, আর আমার এই মামু।

ইহা বলিয়াই সে খোকার গালে এক চুমা বসাইয়া দিল, খোকা সোহাগে কেদারের গায়ে ঢলিয়া পড়িল। খোকা দেখিতে ননীর পুতুল! ভুবনমোহিনীর মতই রং, তাহারেই মত নাক, চোখ, সব সময়ে মুখে হাসি লাগিয়া আছে। কেদারের ক্ষণকাল ভালবাসাতেই খোকা কেদারের অনুগত হইয়া পড়িল।

কেদার খোকাকে কোলে করিয়া বাসায় নামিয়া ভুবনমোহিনীকে নিয়া বাড়ীর ভিতরে গেল। সেই দিন তাহার মার অবস্থা খুব খারাপ। মার কাছে যাইয়া সে বলিল, মা, তোমার গুরুদেব ত আসেন নাই। গুরুদেবের পরিবর্ত্তে দুইটি অমূল্য রত্ন এনেছি। ভুবনমোহিনীকে দেখাইয়া বলিল, "এই একটি বোন্।" খোকাকে দেখাইয়া বলিল, "এই একটি ভাগিনে" তৎপরে ভুবমমোহিনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মাতার নিকট বিবৃত করিল।

কেদারের মাতাকে ভুবনমোহিনী প্রণাম করিতে উদ্যত হইল। কেদারের মাতা পা সরাইয়া বলিলেন, না মা মরা মানুষের পায়ের ধূলা নিতে নেই, তা তুমি ওখান থেকেই প্রণাম কর। আশীর্ব্বাদ করি আবার তোমার সুখের দিন আসুক। ছেলেকে যেন মানুষ করে তুল্‌তে পার।

কেদারের নিকট ভুবনমোহিনীর কথা শুনিয়া কেদারের মাতা বলিলেন, "বেশ করেছিস্, খুব ভাল কাজ করেছিস্, আমার সদাশিব ভোলানাথ ছেলের যে এমন বুদ্ধি আছে, তা ত আগে জানতাম না। আমিও এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে মরতে পার্‌ব। সংসারে তোকে

আর একা ভাস্‌তে হবে না, তোকে যত্ন করবার একজন উপযুক্ত সাথী জুট্‌ল।" তৎপরে ভুবনমোহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কেমন মা, দুইজনে ভাই বোনের মত থাকতে পার্‌বি না? আমার কেদারের যত্ন নিতে পার্‌বি না?"

ভুবনমোহিনী বলিল,—খুব পার্‌ব মা।

কেদারের মাতা বলিলেন,—তা হলে আজ আমার একটা মহা চিন্তা দূর হলো।

ভুবনমোহিনীর শুশ্রূষা গুণে কেদারের মাতা আবার যেন আরোগ্য পথে একটু অগ্রসর হইলেন। ভুবনমোহিনী দিন রাত্রি প্রায় একরকম কেদারের মাতার নিকটই থাকে, নিজ হস্তে তাহার মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া ফেলে, দুই বেলা রান্না করে, আর তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের যাবতীয় কাজ করে। সে দুই তিন দিনের মধ্যেই ঘর দুয়ারের চেহারার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। দিনের বেলায় একটুও বিশ্রাম নাই, একুটু ওটুকু এমনি করিয়া সারা দিনই একটা না একটা কাজে ব্যস্ত। দিন কয়েকের মধ্যেই সে স্বর্ণময়ীর সাথে বেশ্‌ ভাব করিয়া নিল। খোকাকেও স্বর্ণময়ী বেশ ভালবাসিতে লাগিল। খোকারও এমনি স্বভাব তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকা যায় না, মুখে বড় কান্না নাই, সদা সর্ব্বদা নিজ মনে খেলায় ব্যস্ত। খোকা এখন প্রায় স্বর্ণময়ীর নিকট বসিয়া কিংবা ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে, ভুবনমোহিনী ত কেদারের মাতাকে নিয়াই ব্যস্ত।

ভুবনমোহিনীর সেবা যত্ন দেখিয়া কেদারের মাতা একদিন ভুবনমোহিনীকে বলিলেন,—মা, আমার একটি মেয়েছেলে বেলায় মারা গিয়েছিল, বেঁচে থাক্‌লে আজ সে ঠিক তোর সমান বয়সি হতো, তোকে দেখে আমার মনে হয় তুই আবার তার রূপ ধরে মরণের আগে আমাকে

দেখা দিতে এসেছিস্। যদি এলিই তবে কয়েকদিন আগে এলি না কেন? দুঃখ হয় আমার মায়ের সেবা বেশী দিন ভোগ কর্‌তে পারলাম না। তোরা যতই কেন না করিস্, আমাকে আর ধরে রাখ্‌তে পারবি না। আমার কালের ডাক এসেছে, এবার আমায় যেতে হবেই। কেদার আমার পাগলা ছেলে, সরল, সাদাশিব, সংসারের বড় কিছু জানে না, কোনও দিন যে জানবে তাও বোধ হয় না। তোর মা বয়স অল্প হলেও তুই সংসারের অনেক দেখেছিস্ তুই-ই কেদারকে দেখ্‌বি মা। আর একটি কথা, যতদিন নিশি না আসে কেদারের কাছে থাকিস্। দাদুকে ডাক্‌ত, আমি আশীর্ব্বাদ করে যাই।

ভুবনমোহিনী খোকাকে কোলে করিয়া কেদারের মাতার নিকট আসিল। কেদারের মাতা খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "দীর্ঘায়ু হয়ে দেশের মুখোজ্জল কোরো।" তৎপর ভুবনমোহিনীকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিলেন,—দেখ্‌লি সংসারের খেলা, লোকে আশা করে এক, হয়ে যায় আর এক। মালতীকে বড় আশা করে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছিলাম, বিয়ের পর হতে আজ পর্য্যন্ত তার মুখ খানা দেখ্‌তে পারলাম না। আজ এটার আপত্তি, কাল ওটার আপত্তি, এমনি করে তার শ্বশুর আর ওকে আমার এখানে দিল না। আমি যে মরতে বসেছি, আজও তাকে তারা ছেড়ে দিল না। এবার লিখেছে মালতী এখন গর্ভবতী, তাকে এখন পাঠাতে পারে না। হায় রে সংসার, মরার সময়ও তার মুখ খানা দেখ্‌তে পারলাম না, সেও তার মাকে আর দেখ্‌তে পারল না। সেই জন্যই বুঝি ভগবান তার স্থান পূরণ কর্‌তে তোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এও এক নিয়তির খেলা। বুঝ্‌লি মা, সংসারে দেখ্‌বি কার যে কোন্ জায়গায় জীবনের আরম্ভ, কোন্ জায়গায় শেষ বলা যায় না। সব নিয়তির খেলা মা, সব নিয়তির খেলা। আমি বরাবরই

নিয়তিটা মানি। নিয়তি পুরুষকার সর্ব্বদাই দ্বন্দ্ব করে, কে কাকে ছাড়াতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় নিয়তির সঙ্গে যেন পুরুষকার পেরে উঠে না।

মা, আমিও নিয়তিকে খুব মানি। না হলে আমি একবার মা হারিয়ে আবার মা পাব কেন? সংসারে কোথায় ভেসে চলেছিলাম, এমন ভাসা বুঝি জীবনে কেউ কোনও দিন ভাসে না। হঠাৎ আমার কাণ্ডারী জুটে গেল, কাণ্ডারীর মত কাণ্ডারী, জগতে দুর্লভ। দাদার মত দাদা পেয়েছি, সহোদর ভাই হলেও বুঝি বোনের জন্ম এত কেউ করে না। মা, সংসারে থাকতে গেলে নিয়তি না মেনে চলা দায়।

কেদারের মাতার সুমিষ্ট ব্যবহারে ভুবনমোহিনী তাহার মাতার স্বাদ পাইয়াছিল। কেদারের মাতার কথায় তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন দ্বিতীয়বার মাতৃহারা হইতে চলিল!

এই কথাবার্ত্তার তিন চারি দিবস পরেই কেদারের মাতা ইহধামের মমতা ছাড়িয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। ভুবনমোহিনী জননী-হারা সন্তানের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু কেদারের চক্ষে জল নাই, সে অটল। সে যেন পূর্ব্ব হইতেই এই শোকাবহ ঘটনার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল। ভুবনমোহিনীকে সে সান্ত্বনা দিয়া বলিল,—বোন্, উঠ, কেঁদে ত কোনও ফল নাই। ক্ষণভঙ্গুর দেহ চলে গেছে, মা তার স্মৃতি রেখে গেছেন। আমরা তার স্মৃতিকে মনে জাগরুক রেখে তাকে সদা সর্ব্বদাই আমাদের চোখের সাম্‌নে দেখ্‌বো। মৃত্যুর পরে যে সব কাজ আছে, চল আমরা ভাই বোনে মিলে তা করি যেয়ে। শোকে আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের যেন কোনও ত্রুটি না হয়ে পড়ে।

ভুবনমোহিনী কেদারের প্রতি চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। কেদার মাত্র ত্রয়োবিংশ বৎসরের যুবক, হিমাচলের মত অটল, কি প্রশান্ত মূর্ত্তি, মাতৃহারা হইলে শোকে লোককে মুহ্যমান করিয়া ফেলে. কই কেদারের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে মনে হয়, শোক ত তাহার চতুঃসীমাতেও আসিতে পারে নাই, অথচ কেদারের মত মাতৃভক্ত. সন্তান জগতে দুর্লভ! সে যেন নিয়তির খেলা বিধির নিয়ম বলিয়াই শিরোধার্য্য করিয়া নিয়াছে! সে কত বড় তত্ত্বজ্ঞানী!

ভুবনমোহিনী কেদারের প্রতি কতকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, দাদা, তুমি মানুষ না দেবতা? তোমাকে আমি চিন্‌তে পারি নাই, সম্ভব চিন্‌তে পারবোও না।

কেদার হাসিয়া ভুবনমোহিনীকে বলিল, পাগলি, দেবতা আবার হতে গেলাম কেন? আমি দেবতা হলে ত তুইও দেবী, দেবতার বোন যে দেবী হবে এ যে স্বতঃসিদ্ধ কথা। আমাকে আর তোর চিন্‌বার দরকার নাই। চল্ এখন মাকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে যাই; তুই, আমি, খোকা সকলে মিলে মায়ের মুখাগ্নি করে মায়ের শেষ কাজ করে আসি।

কেদার লোকজন ডাকিয়া ভুবনমোহিনী, খোকা সহ মাতাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়া গেল। মাতার দাহ কার্য্য শেষ করিয়া সকলে গঙ্গায় স্নান করিয়া ঘরে ফিরিল। তৎপর ঘর, দরজা সব পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিয়া ফেলিল। কেদারের কার্য্যকলাপ দেখিলে মনে হইত, যেন কোনও বিশেষ গুরুতর ঘটনা ঘটে নাই।

ইহার পরের দিন ভোরে কেদার ভুবনমোহিনীকে বলিল,—খোকার নাম কি রেখেছিস্?

"কি রাখ্‌ব? কে রাখ্‌বে বল? এতদিন ত আপনার জন কেউ ছিল

না।" এই কথা বলিতে ভুবনমোহিনীর যেন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কেদার ভুবনমোহিনীর হৃদয়ের আবেগ উপলব্ধি করিতে পারিল।

কেদার তৎক্ষণাৎ হাসিয়া খোকাকে কোলে করিয়া চুমা খাইয়া বলিল,— মামু, তোর নাকি নামই নাই, তুই মানুষ না ভূত? তোর নাম কি হবে তবে ভূতনাথ?

খোকা যেন কেদারের ঠাট্টা বুঝিতে পারিল, সে অমনি গাল ফুলাইল। সে মুখ ভার করিয়া রহিল, যেন সে কাঁদিয়া ফেলে।

কেদার অমনি খোকাকে আদর করিয়া বলিল,— বাপ রে, আমার মামুর বুদ্ধি দেখ; যেন তিনি একটি কতই বুড়া মানুষ, ঠাট্টাটা বেশ্ বোঝেন, খারাপ নাম তার পছন্দ হবে না। আচ্ছা মামু, সে নাম যখন তোমার পছন্দ হলো না, আচ্ছা তোমার নাম রাখলাম অজিতকুমার; কেমন এ নাম তোমার পছন্দ হয়েছে?

এবার যেন খোকার মুখে হাসি দেখা দিল। কেদার তখন অজিতের পিট চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল, "দেখ্‌লি মোহিনী, তোর ছেলের কাণ্ড! ভূতনাথ বলায় অমনি যেন সে কেঁদে ফেলে আর কি, আর অজিতকুমার নাম রাখায় যেন হাসি আর মুখে ধরে না। বেটার ত দেখ্‌ছি খুব বুদ্ধি হবে।" তৎপরে খোকাকে আবার আদর করিয়া বলিল, "বেটা বাঁচবি ত, যে বুদ্ধি তোর দেখ্‌ছি? না দুদিনের জন্য ভবের হাটের খেলা খেল্‌তে এসেছিস্?"

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল, মামার এত বুদ্ধি হলে, ভাগ্‌নের বুদ্ধি হবে না? লোকে বলে, নরাণাং মাতুলক্রমঃ।

কেদার হাসিয়া বলিল, বা লো মোহিনী, তুই যে আবার পণ্ডিতিও শিখেছিস্? সংস্কৃত শ্লোক যে দিব্বি উচ্চারণ করে আওড়িয়েছিস্।

পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃতও পড়েছিলি নাকি? তোর মধ্যে দেখ্‌ছি অনেক বিদ্যে আছে।

ভুবনমোহিনী বলিল, দাদা, তোমার বোন্‌কে তুমি যত মূর্খ মনে কর, তোমার বোন তত মূর্খ নয়। সে ইংরেজি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর পড়া পর্য্যন্ত পড়েছিল।

কেদারনাথের সংসার বেশ রীতিমত সুশৃঙ্খল ভাবে চলিতে লাগিল।

কেদারের মাতার শ্রাদ্ধ হওয়ার দিন কয়েক পরে ভুবনমোহিনী কেদারকে বলিল,—দাদা, তুমি বিয়ে কর না, তোমার বৌকে নিয়ে বেশ থাকব এখন

কেদার হাসিয়া বলিল, তুই ত চট্ করে বলে ফেল্‌লি লো পাগ্‌লি, বিয়ে কি এতই সোজা কথা ?

কেন, কঠিন কথা কি ?

বিয়ে করা ত কঠিন কাজ নয়, কিন্তু তার ঠেলা সামলান কঠিন।

সে কি রকম ?

বিয়ে কর্‌লে খাওয়াব কি ?

কেন তুমি যে মাইনে পাচ্ছ, তাতে কুলাবে না ? এক বউ এসে আর কত খাবে ? একজনে আর কত খরচ বাড়্‌বে ?

কেদার হাসিয়া বলিল,- তুই না সেদিন বড় বড়াই করেছিলি, তুই কিছু লেখাপড়া শিখেছিস ? এই বুঝি তোর বিদ্যা হয়েছে ? অঙ্কেতে খুব পণ্ডিত ছিলি, হিসেব করে দেখ্‌ত মাসে এখন আশি টাকা থেকে কত টাকা বাঁচে ?

অত হিসাব কর্‌লে চলে না।

হিসাব করে চলে না বলেই ত আমাদের ভারতবাসীর এই অবস্থা! বিয়ের সঙ্গে যে কত বড় দায়িত্ব তা আমরা এক দণ্ডও বিবেচনা করি না, ছাত্রজীবনে বিয়ে, উপার্জ্জন না করে বিয়েটা শুধু আমাদের দেশেই দেখা

যায়। আমরা পরিণাম চিন্তাই করি না, এটা যেন ঠিক ডাল ভাত খাওয়ার সামিল করে নিয়েছি, অর্থাৎ বুঝ্‌লি, ক্ষিধে পেলে যেমন আমরা খাই, বয়স হলেই তেমন একটা বিয়ে করে ফেলি; অথচ খাওয়াব কি তার ঠিকানা নাই। বিয়ে করলাম, গণ্ডায় গণ্ডায় মা ষষ্ঠীর কৃপায় ছেলে-পিলে হল, তারপর ছেলেপিলে নিয়ে সংসারে হাবুডুবু খাও।

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল,—দাদা, তোমার বয়স আন্দাজে সংসারের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী হয়ে পড়েছে; তুমি এমন শিখ্‌লে কোথা?

পাগলি, কেউ ঠেকে শেখে, কেউ দেখে শেখে, আমি দেখে শিখেছি। আমাদের বাড়ীর পাশেই আমার এক আত্মীয় আছে, তার আয়ের আন্দাজে ব্যয় চতুর্গুণ। ছেলেপিলে হয়েছে অনেকগুলো, না পারে তাদের রীতিমত খাওয়া পড়া দিতে, না পারে তাদের রীতিমত যত্ন নিতে। টিনটিনে তাদের চেহারা, যেন এক এক তালপাতার সিপাই, দেখ্‌লেই দুঃখ হয়। এই সব দেখে বিয়ের নাম শুনলেই আমার হৃৎকম্প উঠে যায়।

ভুবনমোহিনী কেদারের কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল, বলিল,—দাদা, তোমার বল্‌বার এতও ঢং, তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি, তুমি বিয়ে কর্‌লে যখন ছেলেপিলে হবে, তখন তোমার মাইনেও বাড়্‌বে

কেদার হাসিয়া বলিল,—ছেলেপিলে হওয়াটা যত সোজা, মাইনে বাড়াটা তত সোজা নয় লো দিদি!

অজিত এখন বেশ কথা বলিতে পারে, তাহার বয়স এখন তিন বৎসর হইয়াছে। সে সব কথাই ভাঙ্গা ভাঙ্গা রকমে বলিতে পারে। সে ভুবন-মোহিনী ও কেদারের কথায় বাঁধা দিয়া বলিল, "মামা বাবু, আমি গয়ে দাব।" অর্থাৎ গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইব। কেদার অজিতকে ইহার পূর্ব্বে দুই দিন ট্রামে করিয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে নিয়া গিয়াছিল, সেখানে যাইয়া মাঠে ছুটাছুটি করিয়া অজিতের মহা আনন্দ। অজিতকে গড়ের

মাঠে নিয়া সে বলিয়াছিল, এটা গড়ের মাঠ। অজিত গড়ের মাঠ মনে রাখিতে পারে নাই, তাহার শুধু মনে ছিল, গড়ের মাঠের গ, তাই কেদারকে সে বলিল, মামা বাবু, গয়ে দাব।

কেদার হাসিয়া বলিল,—দেখ ত মোহিনী, এর পেছনে কত টাকা যাবে? একেও ত মানুষ কর্‌তে হবে।

তোমার সঙ্গে পেরে উঠা যাবে না, তোমার যা খুসী তাই কর। আমার কথা ত তুমি শুন্‌বে না।

আমার আর একটা কর্ত্তব্য কাজ আছে, তার জন্যও আমার কিছু টাকার প্রয়োজন।

সে কি শুনি?

তা তোর সম্পর্কে।

তা কি রকম?

বল্‌তে আরম্ভ করলেই ত তুই হাউ হাউ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌বি; তবে শোন্ চুপ করে, খুব মন দিয়ে শোন্। সব কথা বুঝিস্। বুঝ্‌লি?

হ্যাঁ তুমি বল, আমি মন দিয়েই শুন্‌ব।

আমি ঠিক করেছি তোকে আমি ধাত্রীর ক্লাশে ভর্ত্তি করে দিব।

সে কি রকম?

এই ত কথা বলা না আরম্ভ কর্‌তেই সে কি রকম, একটুও ধৈর্য্য নাই, আগে সব কথা শোন্, তারপর বলিস্ সে কি রকম?

আচ্ছা তুমি বল, আমি চুপ কচ্ছি।

হ্যাঁ, চুপ করে মনোযোগ দিয়ে শোন্, অতি প্রয়োজনীয় কথা। তুই যা লেখাপড়া শিখেছিস্ বল্লি? তাতে তুই ধাত্রী-বিদ্যাটা বেশ শিখ্‌তে পার্‌বি, তা শিখ্‌তে তোর বছর খানেক স্কুলে পড়্‌তে হবে। এই কলকাতার সহরে ভাল ধাত্রী হতে পার্‌লে, আর একটু নাম পড়লে মাসে তিন চার

শ টাকা রোজগার করতে পারে। আমি যত দিন আছি, তোর আর অজিতের ভরণ পোষণের কোনও ভয় নাই। লোকের মরণ বাঁচন ত কেউ বলতে পারে না, যদিই আমি হঠাৎ মারা যাই, তবে ত তোর ছেলে নিয়ে আবার পথে ভাসতে হবে। তাই আমার ইচ্ছা, তুই নিজে যাতে উপার্জ্জন করে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারিস্, তাই আমার দেখা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালন কর্‌তেও আমার কিছু টাকার দরকার।

ভুবনমোহিনী কেদারের কথা আগা গোড়া শুনিয়া মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিল, সে যাহা বলিয়াছে তাহা অতি যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু কেদারের এতগুলা টাকা মাস মাস খরচ করিতে তাহার যেন সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। কেদার ভুবনমোহিনীর মুখ দেখিয়াই তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিল, সে হাসিয়া বলিল,—মোহিনী, তুই না আমার ছোট বোন্? আমার মার কথা বুঝি তোর মনে নাই? মা না বলেছিলেন, আমার এক ছোট বোন ছিল, সে বেঁচে থাকলে তোরই মত হতো, তুই নাকি তার রূপ ধরে আমাদের এখানে এসেছিস্?

কেদারের কথায় ভুবনমোহিনীর সংকোচের ভাব দূর হইয়া গেল। সে তখন বলিল, আমি পার্‌ব ত?

খুব পার্‌বি। তোর মত লেখা পড়া জানা বুদ্ধিমতী মেয়ে ধাত্রীর মধ্যে কয় জন আছে? মন দিলে তুই খুব ভাল ধাত্রী হতে পার্‌বি।

আচ্ছা, কত টাকা আমার পেছনে তোমার মাস মাস লাগ্‌বে?

সম্ভবতঃ ৮।১০ টাকা লাগ্‌তে পারে গাড়ী ভাড়াটারা নিয়ে।

এতগুলা টাকা আমার জন্য তোমার মাসে মাসে খরচ করতে হবে? শেষ কালে যদি আমি না পারি, তবে অনর্থক কতকগুলা টাকা তোমার খরচ হবে।

তোমার কিলো? বল্ আমার। আর পার্‌বি না কেন? এ যে

উভয়েরই কর্ত্তব্যের আহ্বান, আমারও টাকা যোগাড় করতে হবে, তোরও বিদ্যা শিখ্‌তে হবে।

ক বছর আমার পড়্‌তে হবে?

এক বছর।

তা হলে দেখ্‌ছি এই এক বছরে তোমার এক টাকাও বাঁচবে না, তার উপর তুমি অজিতের জন্যই বা কত টাকা ব্যয় কর্‌ছ। এক বছরে যদি তোমার মাইনে না বাড়ে তবে ত এ বছরের মধ্যেও তোমার বিয়ের প্রস্তাব করা যাবে না; তার বিরুদ্ধে তুমি যে যুক্তি তর্ক দিয়েছ।

কর্ত্তব্যের আহ্বান শ্রবণ করা আগে না আমার বিয়েটা আগে? উপস্থিত কর্ত্তব্য কাজ আগে করে, তার পর অন্য কাজ।

দাদা, তোমাকে চিন্‌তে আমার ঢের দেরী।

কেদার হাসিয়া বলিল, কেন তুই চোখে কম দেখিস্‌ নাকি? চশমা কিনে দেব? তুই আস্ত পাগ্‌লি?

না আমি সত্যি বল্‌ছি, আমি তোমাকে এখনও চিনি নাই।

আচ্ছা, তুই চিন্‌তে থাক্‌ আমার তাতে কোনও আপত্তি নাই। তা হলে কিন্তু কালই তোকে আমি স্কুলে ভর্ত্তি করে দিব; এ বিষয়ে সুবিধাও হয়েছে মন্দ নয়। অজিত স্বর্ণদিদির বেশ বাধ্য হয়েছে, তুই যখন না থাক্‌বি, অজিত স্বর্ণদিদির কাছে থাক্‌বে। আমি আজই স্বর্ণদিদির কাছে এ প্রস্তাব কর্‌ব। আর একটা কথা, তুমি মনে কিন্তু দুঃখ করো না, আমি তোমার সম্পর্কে আর একটা কথা বল্‌তে চাই। তোমার অতীত জীবনের কথা যার তার কাছে বোল না, পৃথিবীর লোক সব সমান নয়, কে কোন্‌ ভাবে কথাটা নেয় তার ঠিক নাই। তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌লে তুমি বল্‌বে, তুমি আমার বোন। কেমন এটা যুক্তি-সঙ্গত কথা নয়?

হাঁ, এ ত যুক্তিসঙ্গত কথাই। তোমার কাছেও আমার একটা কথা বল্‌বার আছে।

বল্‌ না কি বল্‌বি?

আর একদিন বল্‌ব, আজ না।

আজই বল্‌ না?

না, আর একদিন বলব। এ বিষয়ে আমি আরও একটু চিন্তা করে নি, আমি সে বিষয় এখন পর্য্যন্ত নিজেই ঠিক করে উঠতে পারি নাই।

ভুবনমোহিনী ধাত্রীর ক্লাসে ভর্ত্তি হইল। সে রীতি মত বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল। ভুবনমোহিনীর অনুপস্থিতিতে অজিত স্বর্ণময়ীর নিকট থাকিতে লাগিল। কেদার একদিন ভুবনমোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন, এ বিদ্যাটা লাগ্‌ছে কেমন?

বেশ্, ভালই ত লাগে।

খুব মনোযোগ দিয়ে তোর এ বিদ্যাটা শিখ্‌তে হবে, এখন তোর এটাই প্রধান কর্ত্তব্য কাজ, এর উপরই তোর ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে।

কেদারের মাতার শ্রাদ্ধের সময় রমেশ বাবু কেদারের বাসায় আসিয়া ছিলেন, তখন তিনি ভুবনমোহিনীকে দেখিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া এই মাত্র জানিয়াছিলেন, ভুবনমোহিনী কেদারের দূর সম্পর্কীয় ভগিনী। কেদার প্রথমে মাতার অসুখ তৎপরে তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আজ প্রায় দুই তিন মাস যাবৎ আর রমেশ বাবুর বাড়ীতে যাইতে পারে নাই। সে আজ অজিতকে নিয়া রমেশ বাবুর বাড়ীতে গেল। অনিতা অজিতকে পাইয়া অতি আনন্দিত হইল, সে অজিতকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল,—বা, বেশ ছেলেটি ত। খোকা তোমার নাম কি?

অজিত ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, অজিত কুমাল্।

বাবার নাম কি ?

নিথি বাবু !

বাবা কোথায় ?

দেথে।

"বাঃ, কেদার দা, তোমার অজিতকুমার ত সব কথাই জানে : এই বুঝি তোমার সেই বোনের ছেলে ?" তৎপর মাতাকে সম্বোধন করিয়া অনিতা বলিল, "মা, কেমন সুন্দর ছেলেটি, যেন ননীর পুতুল। এমন ছেলে দেখলে কার না ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে ?"

অনিতার মাতা বলিলেন, "বাস্তবিকই খুব সুন্দর, যা বলেছিস্ ঠিক যেন ননীর পুতুল।" তৎপরে তিনি অজিতকে কোলে তুলিয়া নিয়া তাহার গালে দুইটি চুমা খাইয়া বলিলেন, "বল ত খোকা, আমি কে ?"

অজিত অমনি উত্তর দিল, মা।

কেদার অমনি হাসিয়া বলিল, "দূর বোকা, ভুল করেছিস্, বল্ দিদি মা, মামার মা কি আর মা হয় ?" তৎপরে অনিতার মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও একটু বড় স্ত্রীলোক দেখলেই বল্‌বে মা।"

অনিতার মাতা বলিলেন, মার থেকে মধুর ডাক কি আর আছে ? তেমন যে শত্রু সেও যদি এসে মা ডাকে তবুও প্রাণ গলে যায় ; আর তোমার অজিতের মুখে মা ডাক ত মধুরের চেয়েও মধুর।" তৎপরে তিনি অজিতকে আবার সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বল্ খোকা আবার 'মা'।"

অজিত বলিল, মা।

অনিতার মাতা অজিতকে কোলে করিয়া আদর করিতে লাগিলেন।

অনিতা তখন কেদারকে বলিল, কেদার দা, অজিতের মাকে আমাদের বাসায় একদিন নিয়ে এস না?

না দিদি, সে বড় একাচোরা, কারু সাথে মিশে না, সে কোথাও যেতে চায় না।

"না, না, তা হচ্ছে না কেদার দা, তাকে আমাদের বাসায় একদিন আন্‌তেই হবে।" তৎপরে অজিতকে দেখাইয়া বলিল, "তুমি যা বল্‌লে তা এমন ছেলের মা হতেই পারে না। তোমার কেবল বাজে আপত্তি। তা হবে না, কবে আন্‌বে বল? বল না কেদার দা, কবে আন্‌বে?"

আচ্ছা আন্‌ব একদিন।

কেদার সত্যের একটু অপলাপ করিল। কেদারের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, ভুবনমোহিনী এখন অন্য কোনও বাসায় যায়। তাহা হইলেই দশ রকমের প্রশ্ন উঠিবে, কথায় কথায় ভুবনমোহিনীর অতীত জীবনের ইতিহাস বাহির হইয়া পড়িতে পারে, তাহা হয়ত কেহ বিশ্বাস করিবে, হয়ত কেহ বিশ্বাস করিবে না, সেই কথা নিয়া নানা সমালোচনাও হইতে পারে; তাহাতে ভুবনমোহিনী মনে কষ্টও অনুভব করিতে পারে।

অনিতা চিরকালই একগুঁয়ে, সে বলিল, না হয় আমরাই যেয়ে তোমার বোন্‌কে দেখে আস্‌ব। তিনি এখানে আছেন কতদিন?

আছে অনেক দিন, তোমাদের যখন ইচ্ছা হয় দেখে এসো। আমাকে বোলো আমি তোমাদের নিয়ে যাব।

অনিতা অজিতকে কাছে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মা কোথায়?

বাসিতে।

কি করে?

পলে।

কি পড়ে ?

বই পড়ে।

অজিত ঠিকই বলিয়াছিল, ভুবনমোহিনী বাসায় বসিয়া অবসর সময়ে তাহার ধাত্রী বিদ্যার বহি পড়িত, তাই অজিত বলিল, তাহার মাতা বই পড়ে।

অনিতা মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মা, কি চালাক ছেলে, কি চট্‌পট্‌ উত্তর দেয়।

অনিতার মাতা বলিলেন, "বেঁচে থাক্‌লে মানুষ হবে।" তৎপরে অজিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "খোকা, তুমি কার মত হবে ?"

খোকা মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়াই উত্তর দিল, মামাল মত।

সে এক কেদারকেই উত্তমরূপে চিনিতে শিখিয়াছিল, তাহার কাছে থাকিতেই সে সকলের চেয়ে ভালবাসিত, তাই সে কেদারকেই আদর্শ করিয়া নিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করা মাত্রই বলিয়া ফেলিল, মামাল মত।

অনিতা অজিতের উত্তর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, দেখ ত কেদার দা, আমি সেদিন বলেছিলাম, আমি তোমাকে মাথায় উঠিয়ে রেখেছি, তুমি ত আমায় ঠাট্টা করেই অস্থির করে তুল্লে। এখন শোন তোমার ভাগ্নের কথা, দেখ সে কি বলে ? সেও তোমাকেই আদর্শ করে নিয়েছে। আমি যেন বানিয়ে বলেছিলাম, সে ত আর বানিয়ে বল্‌তে পারে না।

অজিতের মাতা অজিতের গাল টিপিয়া বলিলেন, আদর্শ ঠিকই ধরেছ, কেদারের মতই চরিত্রবান হও।

কেদার হাসিয়া বলিল, "আপনারা দেখ্‌ছি আমার মাথাটাই খারাপ করে ফেল্‌বেন।" তৎপরে অনিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "অনু, পড়াশুনা কেমন হচ্ছে ? পরীক্ষা ত কাছে।"

আর সব বিষয়ে এক রকম করেছি, অঙ্কটাই ঠিক করে ধর্‌তে পাচ্ছি না, বড়ই ভুল হয়ে যায়।

আচ্ছা, আমি তোমাকে এ কয় দিন রোজই এসে অঙ্ক শিখিয়ে যাব।

অজিত বলিল, আমিও আব্বো।

অনিতা অজিতের গাল টিপিয়া বলিল, তুমিও আস্‌বে? আচ্ছা এসো; আর রোজ এখানে এসে সন্দেশ খেয়ো।

ইহা বলিয়াই অনিতা দুই খানা সন্দেশ আনিয়া অজিতের হাতে দিল। অজিত বিনা আপত্তিতে মহা আনন্দে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

কেদার তাহা দেখিয়া বলিল, ভাগ্‌নেটি ঠিক মামার অনুযায়ীই হয়েছে, পেটুকের হদ্দ, চেনা নাই অচেনা নাই, খাওয়া দিলে মহা আনন্দ, অমনি তার সদ্ব্যবহার করতে আরম্ভ করে।

অনিতার মাতা বলিলেন, ও বলে কেন, মিষ্টি পেলে কোন্‌ ছেলে-পিলের আনন্দ না হয়?

কেদার হাসিয়া বলিল, না মা, ওর আনন্দ একটু বেশী হয়, দেখ্‌ছেন না ওদিকে চেয়ে, ওর আর এখন কিছুতেই মন নাই, কেবল ঐ হাতের জিনিষের দিকে ছাড়া। এখন থেকে ও এখানে রোজ আস্‌তে আমাকে জ্বালাতন করে মার্‌বে। ও আজ যে লোভ পেল এখন রোজই এখানে আস্‌বে নিশ্চয়। পিপড়ে আর ছেলেপিলেরা সমান, মিষ্টির গন্ধ পেলেই সেখানে জুটবে, তার মধ্যে এ ত হচ্ছে এক আস্ত রাক্ষসের ভাগ্‌নে।

অজিত কেদারের কথার অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিয়া মহা পণ্ডিতের মত সন্দেশ খাইতে খাইতে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, লোজ আব্বো।

অনিতা, তাহার মাতা, কেদার অজিতের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

অনিতার মাতা কেদারকে বলিল, তা হলে তোমার রান্নাবান্নার এখন কোনও কষ্ট হয় না? অজিতের মাই বুঝি সব দেখেন?

হ্যাঁ, সেই ত দেখে, ওকি যেমন তেমন মেয়ে, আমার আর কি সংসার? তেমন বড় সংসারের গিন্নি হলেও তা অনায়াসে চালিয়ে নিতে পারে। অমন একটি মেয়ে এখনকার দিনে পাওয়াই দায়। আমার ত আজ পর্য্যন্ত চখে পড়েনি।

অনিতা জিজ্ঞাসা করিল, বয়স কত?

বয়স আর কত হবে, জোর ১৯।২০।

অনিতার মাতা বলিলেন, মাত্র, আমি ত তাকে ভেবেছিলাম, কত বয়সই না হবে।

না মা, অল্প বয়স হলে কি হবে, এমন মেয়ে আমি দেখি নাই।

এ বয়সেই এত কর্ম্মপটু? তুমি ত তাকে মস্ত এক সার্টিফিকেট দিলে।

আমি বলে কেন, যে তার সংসর্গে আসবে, সেই তাকে ভাল না বেসে পারবে না। যেমন রূপে রূপবতী, তেমন গুণে গুণবতী। তার মত রূপবতী মেয়ে আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে মেলা বড় সোজা নয়। আজ পর্য্যন্ত তেমন সুন্দরী আমার চখে পড়ে নাই। আর গুণের কথা কি বলব মা, আমি তার সংসর্গে যতই থাকছি তার গুণে যেন আমি অবাক্ হয়ে যাই, আমি তার চরিত্রের কোনও জায়গায়ও একটু দোষ ধরতে পারি নাই।

কেদার সরল ভাবে ভুবনমোহিনীর রূপের ও গুণের ব্যাখ্যা করিয়া যাইতে লাগিল, এই ব্যাখ্যা যে ভবিষ্যতে মহা অনর্থ ঘটাইতে পারে, তাহা কেদারের ধারণাতেই আসিল না। একজন যুবকের মুখে একটী রূপবতী যুবতীর এরূপ রূপের ও গুণের বর্ণনা যে নিন্দনীয় বা দোষণীয় হইতে পারে, তাহা কেদারের কল্পনার মধ্যেই কখনও আসিতে পারে না। সে

সরল প্রকৃতির, সরল ভাবেই পৃথিবীর যাবতীয় কার্য্য দেখিত, সরল ভাবেই মনের কথা বলিয়া গেল

কেদারের সরল ভাবের কার্য্যে ভবিষ্যতে এক বিষময় ফলের বীজ রোপিত হইল। সেই ব্যাখ্যা শুনিয়া সেই দিন হইতে অনিতার মাতার মনে একটা খটকা লাগিয়া গেল।

অনিতার মাতা বলিলেন, তোমার বাসায় ত আর কেউ নাই?

কেদার সরল ভাবে উত্তর করিল, আর কে থাকবে, আমি আছি, আমার বোন্ আছে, আর আমার এই মামু আছে।

আর কোনও বুড়ো লোক দুই এক জন এনে রাখ্‌তে পার না?

বুড়ো লোক কোথায় পাব? আর তাদের দরকারই বা কি, এই আমরাই ত বেশ আছি। আমার বোনই পাকা সংসারি, একটা পয়সারও অপব্যয় হবার জো নাই।

অনিতার মাতার কথার মধ্যে যে নিগূঢ় অর্থ আছে, কেদারের মত সরল প্রকৃতির লোক তাহা বুঝিল না। সে আপনা মনেই অনিতার নিকট ভুবনমোহিনীর গুণের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। কেদারের মুখে ভুবনমোহিনীর ব্যাখ্যা আর শুনিতে অনিতার মাতার ইচ্ছা হইল না, তাহা যেন তাহার কর্ণে বড়ই বিসদৃশ বাজতে লাগিল। তাহার বদন যেন ম্লান হইতে ম্লানতর হইতে লাগিল, তাহার হৃদয়ের উচ্চ স্থান হইতে কেদার যেন ক্রমেই নামিয়া আসিতে লাগিল। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, তোরা থাক্, আমি একটু কাজ করে আসি।

অনিতার মাতা হঠাৎ চলিয়া যাইবার যে অন্য কোনও কারণ থাকিতে পারে, তাহা কেদার কিংবা অনিতা উপলব্ধি করিতে পারিল না।

অনিতা বলিল, কেদার দা, এবার ত যেমন তেমন, আস্‌ছে বছরই ত গোলমাল, ম্যাট্রিকে কেমন করি কে জানে?

ভাল করে পড়লে খারাপ করবে কেন ? আর তুমি অঙ্কেতে ভয় কর, ম্যাট্রিকে অঙ্ক যে সোজা হয়, তা তৃতীয় শ্রেণীর ছেলে মেয়েরাও পারে ; বরং ক্লাসের পরীক্ষায়ই অঙ্ক কঠিন হয়।

আস্‌ছে বছর কিন্তু তোমার একটু বেশী খাট্‌তে হবে, এবারকার মত ফাঁকী দিলে চলবে না।

এমন সময় রমেশ বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেদার অজিতকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মামু, দাদা বাবুকে নমঃ কর।

অজিত অমনি রমেশ বাবুর পদধূলি গ্রহণ করিল। রমেশ বাবু অজিতকে কোলে তুলিয়া নিয়া চুমো খাইয়া বলিলেন, বেশ্ শিখেছে ত, বেশ্ ছেলে।

অনিতা বলিল, এ আর বেশী কি, যে চালাক ছেলে, আমি ত এমন চালাক ছেলে দেখিই নাই।

রমেশ বাবু বলিলেন, বড় লোকের চেহারা, বেঁচে থাক্‌লে বড় লোকই হবে।

অজিত রমেশ বাবুর চিবুক ধরিয়া বলিল, দাদা।

রমেশ বাবু বলিলেন, বারে বা, এর মধ্যেই মনে রইল, কেদার মাত্র একবার বলে দিয়েছে, আমি তোর দাদা বাবু, অমনি তোর মনে রইল, আমি তোর দাদা: আচ্ছা বাহাদুর ছেলে। খুব স্মরণশক্তি ত।

অজিত রমেশ বাবুর চিবুক ধরিয়া নানা প্রকার সোহাগ করিতে লাগিল। রমেশ বাবু অজিতের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি কেদারকে বলিলেন, "যখনই তুমি এখানে আস, একে কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এস। এ যে আমাকে ভুলিয়ে ফেল্‌লে।" তৎপরে অনিতাকে বলিলেন, "কি বল্‌ছিলি অনি, আস্‌ছে বছরে তোর জন্য কেদারের বুঝি বেশী খাট্‌তে

হবে। তার বুঝি আর কাজ কর্ম্ম নেই? জানিস্ কেদারের এখন আফিসে কি পরিমাণ খাট্‌তে হয়?"

তা হোক্, ওখানেও খাট্‌নি বাড়্‌বে, আমার এখানেও খাট্‌নি বাড়্‌বে। কেদার দা দুই খাট্‌নিই বজায় রেখে চল্‌তে পার্‌বে। কেমন পার্‌বে না কেদার দা?

খুব পার্‌ব, এখানে ত খাট্‌নিই নয়, এ যে মহা আনন্দ, এ যে মহা বিশ্রাম। আফিসের খাটুনির পরে এখানে এসে তোমাকে পড়ান আমার পরিশ্রম কেমন লাগে জানো? যেমন গ্রীষ্মের দিনে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ থেকে হয়রান হয়ে এসে এক গ্লাস সুশীতল জল পান করা। তাই বলছিলাম অনুদিদি, এমন পরিশ্রমই আমি চাই।

কেদারদা, বড় বেশী বলে ফেল্‌লে।

আমি এক বর্ণও অতিরঞ্জিত করি নাই। অনু, ঠিক কথাই বলেছি। তোমাকে পড়াতে আমার সে রকম আরামই বোধ হয়।

অনিতা অজিতকে সম্বোধন করিয়া বলিল, অজিত বাবু, আসবে ত? ভুল না কিন্তু?

অজিত মাথা নাড়িয়া বলিল, লোজ আব্বো।

অনিতা বলিল, রোজ এসে এমনি করে সন্দেশ খেয়ো।

কেদার হাসিয়া বলিল, আর নিমন্ত্রণ করতে হবে না, যে লোভ দিয়ে দিলে, এখানে আস্‌বার জন্য আমাকেই জ্বালাতন করে মার্‌বে।

তথায় আরও কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া অজিতকে নিয়া কেদার বাসায় চলিয়া আসিল।

ভুবনমোহিনা চলিয়া যাইবার পর দিবস অতি প্রত্যুষে ভোলানাথ বাবু ভুবনমোহিনীর প্রকোষ্ঠে গিয়া দেখেন, প্রকোষ্ঠ খালি, কেহই নাই। অতুল বাহিরে পাইচারি করিতেছে। অতুলকে ডাক দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মোহিনী কই ?

অতুল বলিল, জানি না।

জানি না কেমন ? তুই কোনও খবর রাখিস্ না সে কোথায় গেছে ?

না, আমি ত ঘুম থেকে উঠেই আর তাকে দেখি না।

"তা হলেই বুঝ্‌তে পেরেছি সে কোথায় গেছে।" এই কথা বলিয়া ভোলানাথ বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার চেহারার যেন ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি যেন মূর্চ্ছা যাইবার মত হইলেন। অতুল অমনি দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল, বাবা, বাবা, আপনি বসুন।

আর বস্‌ব, আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে। উঃ, আর যে সহ্য করতে পারি না।

ইহা বলিয়াই তিনি মাটিতে বসিয়া পড়িলেন, বুকের উপর হাত দিয়া মাথা হেট করিয়া রহিলেন। কিছুকাল ঐ ভাবে থাকিয়া আবার অতুলকে বলিলেন, কুসন্তান, কুপুত্র তুই ! এত লেখা পড়া শিখে পিতৃহন্তা হলি ? উঃ ! প্রাণ যায়, শীঘ্র তোর মাকে ডেকে নিয়া আয়।

অতুল সেই মুহূর্ত্তে দৌড়াইয়া তাহার মাতাকে যাইয়া বলিল, বাবা যেন কেমন কচ্ছেন, শীগ্‌গির শীগ্‌গির এসো।

ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী ছুটিয়া আসিলেন, আসিয়া দেখেন ভোলানাথ বাবু ঘন ঘন নিশ্বাস টানিতেছেন, নিশ্বাস প্রশ্বাস টানিতে যেন ভয়ানক কষ্ট হইতেছে, ভয়ানক ঘামাইতেছেন। তাহার ঐ অবস্থা দেখিয়া অতুল এবং তাহার মাতার বড়ই ভয় হইল। অতুলের মাতা ভোলানাথ বাবুকে বাতাস দিতে লাগিলেন। অতুলকে তিনি বলিলেন, ডাক্তারের কাছে এখনি লোক পাঠিয়ে দে, আমার বড়ই ভয় কচ্ছে।

ভোলানাথ বাবু একটু সুস্থ হইয়া বসিয়া বলিলেন, গিন্নি, ডাক্তার লাগ্‌বে না, আমার মানসিক ব্যাধির ডাক্তার কি কর্‌বে. আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে।

অতুলের মাতা বলিলেন, কেন এমন হলো?

"কেন এমন হলো আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছ? তোমরাই এমন করেছ, আমার যদি মৃত্যু হয় এর কারণ তোমরা মাতা পুত্র। আমার মা সতী-সাধ্বী ছিল, তাকে তোমরা অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছ, আমি তাকে বড়ই নিরাপদ স্থানে স্থান দিয়েছিলাম! হায় রে জগৎ সংসার! হায় রে মানব প্রকৃতি!" একথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষে জল আসিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অতুলকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—গাধা, কুষ্মাণ্ড, তুই এখনও বল্‌তে চাস্, সে কাল মিথ্যা কথা বলেছিল, তুই সত্য কথা বলেছিলি? বিশ্ববিদ্যালয়ের মস্ত উপাধিধারী তুই, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তোর মত কুলাঙ্গার বড় উপাধি পায়, সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পড়ার, শিক্ষার বলিহারি যাই! তোর মত মহা পণ্ডিত এই বিশ্ববিদ্যালয় হতে আর কজন বেরিয়েছে? তুই এখনও বল্‌বি, তুই-ই সত্যবাদী সে মিথ্যাবাদী? আমার একটি মেয়ের বড় সাধ হয়েছিল, ভগবান আমায় তা জুটিয়ে দিয়েছিলেন, তুই আমার সেই বড় সাধে বাদ দিলি! সাধ পূরণ হতে হতেই আমার প্রাণের সেই বহু দিনের

আকাঙ্ক্ষার ঘর আবার খালি করে দিলি! তুই এখনও বল্‌বি তুই সত্যবাদী, সে মিথ্যাবাদী? সে কোথায় গিয়েছে জানিস্? সে হয় কোথায়ও গিয়ে আত্মহত্যা করেছে, না হয় এমন স্থানে চলে গিয়েছে যেখানে তাকে আর আমরা দেখব না। সে কেন গিয়েছে জানিস্? সে বুদ্ধিমতী, আমার মহা হিতাকাঙ্ক্ষিণী, কাল্‌কে তোর ও তোর মার ব্যবহারে সে মনে করেছিল, হয় ত আমিও তার প্রতি অবিশ্বাসী হতে পারি, যদি তা না হই, তবে তাকে নিয়ে তোতে আমাতে মনোমালিন্য হবে, গৃহে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি হবে, সে তা চায় না বলে চলে গেল। তোর মা ত স্পষ্টই তোর পক্ষ সমর্থন করেছিল, ঘরের গৃহিণী যদি তাকে কলঙ্কিনী মনে করে তবে, এমন অবস্থায় নিষ্পাপ চরিত্রা হয়ে সে কি এখানে থাকতে পারে? তুই এখনও বল্‌বি, তুই-ই সত্যবাদী, সে মিথ্যাবাদী? উঃ, আর ত বল্‌তে পারি না, আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে!

এতগুলি কথা একবারে বলিয়া যাওয়ায় ভোলানাথ বাবুর হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন, মুখ বিকৃতি করিতে লাগিলেন, যেন হৃদয় তাহার বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ভোলানাথ বাবুর কথায় অতুলের মনে ভয়ানক আন্দোলন চলিতেছিল, তাহার হঠাৎ মনে হইল, পিতা বুঝি চলিয়া যান, আর ত দেরী করা যায় না। সে হঠাৎ পিতার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল,—বাবা, বাবা, আমায় ক্ষমা করুন, আমিই মিথ্যাবাদী সে-ই সত্যবাদী। আমি নরপিশাচ, সে দেবী, তাকে খুঁজে এনে আমি তার পা ধরে ক্ষমা চাইব। আমি আবেগের বশে হঠাৎ একটা কাজ করে ফেলেছি। আমি আমার অন্যায় প্রবৃত্তিকে দমন কর্‌তে না পেরে, হঠাৎ তার প্রতি অন্যায় আচরণ করে ফেলেছিলাম। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

ভোলানাথ বাবু চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—

আমার কাছে ক্ষমা চাইলে কিছু হবে না। সেই দেবীকে খুঁজে বের করতে হবে, তারপর তার পা ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিতে হবে, তার ক্ষমা না পেলে তুই সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরবি। আমি না বলেছি, সতীর দীর্ঘ নিশ্বাস, সেই দীর্ঘ নিশ্বাসে সমস্ত লঙ্কাপুরী ছারখার হয়ে গেল, তুই আমি ত কোন্ ছার? আর কাল বিলম্ব না করে আমার মাকে খুঁজে আন্।

ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী আগাগোড়া সব দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন,—আমার একটা বড় ভুল ধারণাই আজ ভাঙ্গল। সত্যি সত্যি মোহিনী সতী সাধ্বী।

গিন্নী, সংসার দেখেছ কি? বেঁচে থাকলে আরও কত দেখ্‌বে, শিখ্‌বে। যদি তুমি তোমার সংসারের মঙ্গল চাও, তবে তাকে খুঁজে নিয়ে এসো, আবার কন্যা পদে তার অধিষ্ঠান কর। সে ত তোমাকে মায়ের মতই দেখ্‌তো, সে ত তোমাকে মায়ের মতই ভক্তি করতো।

ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী অতুলকে বলিলেন, যা, তুই এখনই বেরিয়ে যা, যেখান থেকে পারিস্ তাকে খুঁজে নিয়ে আয়, আমি তাকে কন্যা পদেই বরণ করে নিব।

ভোলানাথ বাবু, অতুল প্রভৃতি ভুবনমোহিনীর বহু অনুসন্ধান করিল, তাহার কোনও সন্ধানই তাহারা পাইল না। সেই দিন হইতে ভোলানাথ বাবুর পরিবারে একটা বিষাদের ছায়া পড়িল।

ভুবনমোহিনী ধাত্রী পরীক্ষায় প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইল। ধাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কেদার তাহার বাসার সম্মুখভাগে একটি বিজ্ঞাপন লটকাইয়া দিল, "পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী, ভুবনমোহিনী দেবী।"

ভুবনমোহিনীর সদা সর্ব্বদাই স্বামীর কথা মনে পড়িত। যখনই তাহার কোনও কাজ না থাকিত, স্বামীর চিন্তা আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিত। একবার তাহার মনে হইত, স্বামী এখন না জানি কি ভাবে আছেন, তিনি না জানি কত কষ্টেই আছেন, তাহার শরীর ভাল আছে ত? তিনি কি এখনও পূর্ব্বের ন্যায় মদ্যপায়ী, অসচ্চরিত্র আছেন? না, তাহার স্বভাব এখন পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে? আবার মনে হইত, হয়ত তিনি আবার বিবাহ করিয়াছেন, সেই স্ত্রীকে নিয়া তিনি সুখে আছেন ত? আবার তাহার মনে হইত, বিনা দোষে তাহার উপর এ কি শাস্তির বিধান! সে ত কায়মনে কোনই দোষ করিয়াছিল না, তবে তাহার উপর এ কি অভিশাপ! এ সব কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া আবার বলিত, না সে বিষয় চিন্তা করিলে কি হইবে, ইহা যে নিয়তির খেলা। আজ যখন সে পরীক্ষার ফলের কথা শুনিল, তখন সে মনে মনে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তুমি ত আমাকে পুত্রসহ জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলে, আমাকে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জীবন যাপন করিতে আদেশ দিয়াছিলে, এখন একবার দেখে যাও, আমি কি করিয়া জীবন যাপন করিতেছি। ভগবান যাহার সহায় তাহাকে মারে কে?

ভগবান আছেন, ভগবান আশ্রয়হীনাকে আশ্রয় জুটাইয়া দিয়াছেন, দেবতুল্য ভ্রাতার দর্শন মিলাইয়া দিয়াছেন, বেশ্যাবৃত্তির স্থলে স্বাধীন উপায়ে সসম্মানে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দেখে যাও, আজ তোমার স্ত্রী আর নিরাশ্রয়া নয়, দুই মুষ্টি অন্নের জন্য তোমার স্ত্রীর আর অপরের গলগ্রহ হইতে হইবে না। আবার মনে মনে স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, তুমি ত আমার আর মুখ দেখিবে না বলিয়াছিলে, কিন্তু আমি এখনও বলি, যদি আমি সতী হই আবার তোমার সাথে দেখা হইবে, তখন তুমি তোমার ভুল বুঝিতে পারিবে, তখন তোমার অনুতাপ হইবে, আমি আবার আমার পত্নীত্ব স্থান অধিকার করিতে পারিব। তৎপরে আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, জানি না ভগবান আমার সেই বড়াই কবে রক্ষা করেন!

কেদারনাথ আজ আফিস হইতে হাসিতে হাসিতে বাসায় ফিরিল। ভুবনমোহিনী তাহার ঐ অবস্থা দেখিয়া বলিল, কি দাদা, আজ যে এত খুসী?

দেখ্ ত, অদৃষ্টের কি পরিহাস? এক সঙ্গেই দুটো সুফল ফলে গেল তুইও প্রথম হয়ে পরীক্ষা পাশ হয়েছিস্, আমিও আজ আফিসে যেয়ে এক সুখবর পেলাম।

কি রকম?

আজ আফিসে গেলেই আমাদের বিভাগের বড় সাহেব আমাকে ডেকে বল্লেন, তোমার কাজে আমি বড় খুসী হয়েছি, তোমার উপর ওয়ালা তোমার নামে খুব ভাল রিপোর্ট করেছেন। আমার ডিপার্টমেণ্টে একটা একশ টাকার চাকরি খালি হয়েছে, তোমাকে সেটা দিলাম আমি ত তা শুনে অবাক্। এত শীগ্‌গির যে প্রমোশন পাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।

যা হউক, তা হলে এক সঙ্গে তিনটে সুফল ফলে যাউক না কেন? তা হলে এখন আর একটা সুখজনক কাজের আয়োজন করা যেতে পারে?

সে কি রকম?

কি রকম আর কি? এই তোমার বিয়ে। এখন বিয়ে কর্‌লে সম্ভব তুমি তোমার স্ত্রীকে খাওয়াতে প্যার্‌বে।

তুই এক মহা পাগল, আমাকে বিয়ে করাবার জন্য তুই যেন ক্ষেপে উঠেছিস্। দেখ্, কলকাতার সহরে একশ টাকায় কোনও ভদ্রলোক পরিবার নিয়ে থাকতে পারে না, আরও কিছু মাইনে বাড়ুক তখন বিয়ের বিষয় দেখা যাবে। তুই আগে একটু রোজগার কর্‌তে আরম্ভ কর, তখন না হয় ভাই বোনে সংসার চালাব।

আমার রোজগার আরম্ভ করতে কত দিন দেরী হয় কে জানে?

না হয় বছর খানেক পরেই এ বিষয় দেখা যাবে। আমি ত আর বুড়ো হয়ে যাচ্ছি না। বল্‌তে গেলে আমার এখনও বিয়ের বয়সই হয় নাই।

রমেশ বাবুরা অনিতাকে যদি অত দিন না রাখেন?

তুই ভারি দুষ্টু, তোর সঙ্গে এ বিষয় আমি আর আলাপই করব না।

কেদার প্রায়ই ভুবনমোহিনীর নিকট অনিতা, রমেশ বাবু ও তাহার স্ত্রীর বিষয় আলাপ করিত। সেই আলাপ হইতে ভুবনমোহিনী স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল, কেদারের মন অনিতার দিকে আকৃষ্ট, কেদার অনিতাকে পাইলে সুখী হইবে।

যে দিন কেদারের মুখে ভুবনমোহিনীর রূপ বর্ণনা রমেশ বাবুর স্ত্রী শুনিলেন, সেই দিন হইতে তিনি কেদারের প্রতি বীতরাগ হইলেন, সেই দিন হইতে তাহার হৃদয়ের উচ্চস্থান হইতে কেদারকে একেবারে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন, সেই দিন হইতে তিনি একেবারে কৃতসংকল্প

হইলেন, কেদারের সহিত অনিতার বিবাহ হইতে পারে না। সেই দিন হইতে কেদার যখন তাহাদের বাড়ীতে যাইত, তিনি আর তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না, তেমন সমাদর করিতেন না, যেন একটু দূরে দূরে থাকিতেন, তাহার হাবভাব দেখিলে মনে হইত, কেদারের আগমনটা তিনি তত পছন্দ করেন না। আবার যখন তিনি দেখিলেন, বৎসরেক হইয়া গেল, এখনও ভুবনমোহিনী কেদারের সঙ্গেই আছে, তখন তিনি মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, ভুবনমোহিনীর সহিত কেদারের চরিত্রদোষ হইয়াছে নিশ্চয়, তখন কেদারের গুণরাশি তাহার মন হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া তাহার ঘৃণিত মূর্ত্তি তাহার মনে সদাসর্ব্বদাই জাগরিত হইত। তিনি রমেশ বাবুর নিকটও এবিষয়ে দুই একবার উত্থাপন করিলেন, রমেশ বাবু তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি পাগল হয়েছ নাকি? কাকে কি বল্‌ছ? কেদার কি আমার তেমন ছেলে? সে যে ভীষ্মের মত চরিত্রবান্। ভুবনমোহিনী যে তার বোন্।

রমেশ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, বোন্ না কে, কে জানে? তুমি কি সে বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করেছ?

অনুসন্ধান আর কর্‌ব কি, কেদারই ত বলেছে সে তার বোন্। কেদার কি মিথ্যা কথা বলেছে?

এ বিষয়ে সে সত্য গোপন করে মিথ্যা কথা বল্‌তে পারে তা আমি বিশ্বাস কার।

তা অসম্ভব। কেদার প্রাণ গেলেও কোনও বিষয়ে কোনও প্রকার মিথ্যা কথা বল্‌বে না। তার স্বভাবের বিরুদ্ধে কোনও সন্দেহ আনাও আমাদের পাপ হবে। অনিতার সঙ্গে তার বিয়ে না দিতে হয় না দিবে, কিন্তু তার স্বভাবের বিরুদ্ধে কিছু বোলো না।

অনিতার সঙ্গে ত তার বিয়ে হতেই পারে না, তাত দেবই না। আমি অনিতার এক সম্বন্ধের প্রস্তাব পেয়েছি। সে সম্বন্ধ যদি হয় তবে আমি তাই করব। আমি আমার ভাইপো শচীনকে আস্‌তে লিখেছি। সেই ছেলে নাকি শচীনের সমপাঠী ছিল, সে ছেলে এবার ডেপুটি হয়েছে, তাদের অবস্থাও নাকি খুব ভাল। শচীন মাস খানেকের মধ্যেই আস্‌বে।

রমেশ বাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—না, তা হতেই পারে না, অনিতাকে কেদারের হাতেই দিব। আমি দিব্য চক্ষুতে দেখ্‌তে পাচ্ছি, ওরা একে অন্যের জন্য সৃজিত হয়েছে।

রমেশ বাবুর স্ত্রী স্বামীর সহিত এ বিষয়ে আর কোনও বাদানুবাদ না করিয়া নিজেই ঘটকালি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

রমেশ বাবুর স্ত্রীর পূর্ব্বের সহিত বর্ত্তমান ব্যবহারের পার্থক্য কেদার সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, এক একবার তাহার মনে হইত, সে আর রমেশ বাবুর বাড়ীতে যাইবে না, আবার অনিতার কথা মনে হইতেই তাহার সেই সংকল্প বালির বাঁধের মত ভাঙ্গিয়া যাইত। সে পূর্ব্ববৎই অনিতাকে পড়াইতে লাগিল। অনিতাও তাহার মাতার কেদারের সহিত ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহাতে সে মনে মনে অতীব দুঃখ অনুভব করিত, কিন্তু কেন যে তাহার মাতা কেদারের সহিত এমন ব্যবহার করেন তাহা বুঝিতে পারিল না।

ভুবনমোহিনী যখন কেদারের নিকট অনিতা সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিল, তখন কেদারের মনে ঘোর সন্দেহ ছিল, রমেশ বাবুরা তাহার সহিত অনিতার বিবাহ দিবেন কি না। তাই সে ভুবনমোহিনীকে অনিতা সম্বন্ধে আর বাক্যালাপ করিতে দিল না।

কেদার ভুবনমোহিনীকে বলিল, তুই বাজে কথা উঠিয়ে আমার স্ফূর্ত্তিটাই মাটি করে দিলি।

আচ্ছা না হয় তোমার বিয়ের কথা আর উঠাব না, এখন অন্য একটা কথা বলি ?

ইহা বলিয়াই ভুবনমোহিনী মাথা হেট করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি খুঁটিতে লাগিল।

ভুবনমোহিনীর ঐ অবস্থা দেখিয়াই কেদার বুঝিতে পারিল, ভুবনমোহিনী কোন্ বিষযে কথা বলিতে চাহিতেছে। কেদার হাসিয়া বলিল, পাগ্‌লি, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি তুই কি বল্‌বি। নিশি বাবুর বিষয় ত? আমিও ভেবেছি নিশি বাবুর খবরটা একবার নিয়ে আস্‌ব।

হঁ্যা, আমি সেই কথাই বল্‌ব ভেবেছিলাম। আজ কয়েকদিন থেকেই মনটা যেন কেমন কচ্ছে, মনকে যেন কিছুতেই দমিয়ে রাখ্‌তে পারছি না।

হবে না কেন বোন্, তুই যে হিন্দুনারী, এটা যে দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রীর দেশ।

তা হলে একবার তার খবর নিয়ে আস্‌বে ?

হঁ্যা, আমি ছুটি নিয়ে কয়েক দিনের জন্য তোদের দেশে যাব, নিশি বাবুর খবর নিয়ে আস্‌ব।

তা হলে আজ তোমার কাছে আর একটা কথা বলি, তা তোমাকে এতদিন বলি নাই, বল্‌বার কোন প্রয়োজনও মনে করি নাই। আমার স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব দেখে আমার শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাঁর গচ্ছিত টাকা থেকে আমি আমার স্বামীর অজ্ঞাতসারে এক হাজার টাকা সরিয়ে আমার নামে আর খোকার নামে সেবিন্সবেঙ্কে রেখে দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, সময়ে অসময়ে কাজ দেবে। আমার স্বামী যখন আমায় পুত্রসহ ত্যাগই করেছেন, তখন সেই টাকা আর এখন রাখ্‌বার আমার অধিকার নাই। আমরা যখন কুলচ্যুতই হয়েছি, তখন শ্বশুর কুলের ধন ভোগ কর্‌বার আমরা কে ?

ভুবনমোহিনীর এই কথা বলিতে যেন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কেদার তাহা উপলব্ধি করিয়া বলিল,—বোন্, অতীতের কথা আলোচনা করে ত কোনই ফল নাই, যা ভবিতব্য আছে তা হবেই। এখন আমার কি কর্‌তে হবে বল্?

তাই বল্‌ছিলাম দাদা, আমার ত এখন টাকার আর কোনও প্রয়োজন নাই, তার বরং টাকার দরকার হতে প্যারে। তুমি যখন আছ, আর আমিও ভগবানের কৃপায় এক রকম উপার্জ্জনক্ষম হয়েছি, তখন তাঁর টাকা তাকেই ফিরিয়ে দেওয়ার সংকল্প করেছি। সেই টাকা থেকে আমার সংসার খরচের জন্য ৮০৲ টাকা খরচ করেছিলাম, অন্য কাজের জন্য ১০০৲ টাকা উঠিয়েছিলাম, তার মধ্যে ২৬৲ টাকা খরচ হয়েছে, বাকী ৭৪৲ টাকা আমার হাতে আছে। তুমি যখন সেখানে যাও, সেই টাকা আর সেবিংসবেঙ্কের বইগুলো নিয়ে যাবে। আমি টাকা উঠাবার ফরম্ দস্তখত করে দিব, তুমি সেবিংসবেঙ্ক থেকে বাকী টাকা উঠিয়ে, সর্ব্বসমেত ৮৯৪৲ টাকা তাঁর হাতে দিয়ে বল্‌বে, তাঁর হতভাগিনী স্ত্রী তাঁর শ্বশুরের গচ্ছিত টাকা থেকে কতক টাকা লুকিয়ে রেখেছিল, তা ফেরত দিল। যদি তিনি বিশ্বাস না করেন এই টাকা তাঁর পিতার গচ্ছিত টাকা কিনা, তবে যেন তিনি রামচন্দ্র ও তার মায় কাছে এবিষয় জিজ্ঞাসা করেন, রামচন্দ্রের দ্বারাই আমার শ্বশুরের শ্রাদ্ধের দুই তিন দিন আগে আমি পোষ্টাফিসে এই টাকা রেখে দিয়েছিলাম। এই টাকাগুলো আমাকে বড়ই জ্বালা দিচ্ছে, এই টাকা তাঁকে ফিরিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত আমি আর শান্তি পাব না। আমার প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই মনে হয়, আমি ভয়ানক অন্যায় কার্য্য করছি।

কেদার ভুবনমোহিনীর কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি বুদ্ধিমতী! কি উদার হৃদয়া!

এমন স্ত্রীর সহিত এমন ব্যবহার! পুরুষ জাতি কি পশু? পুরুষ জাতি কি অন্ধ?

ভুবনমোহিনী আবার কেদারকে বলিল,—অমনি ভোলানাথ বাবুদের খবর নিয়ে এসো। ভোলানাথ বাবু দেবতুল্য লোক। তিনি আমাকে ঠিক তার মেয়ের মতন দেখ্‌তেন। আমার জন্য না জানি তিনি কত কষ্টই অনুভব করেছেন। আর এক কথা, এই যে তুমি যাবে, দেখো কিন্তু কোনও মতেই প্রকাশ কোরো না, আমি কোথায় আছি। তুমি তাকে টাকা দিয়েই চলে আসবে, বেশী কথা তাঁর সঙ্গে বোলো না। কোনও মতেই যেন জান্‌তে পারে না, আমি এখানে আছি।

কেদার হাসিয়া বলিল, খুব হুশিয়ার ত দেখ্‌ছি! দেখবি তোর কাজ আমি ভাল রকম করেই করে আস্‌ব।

ইহার কতক দিবস পরে কেদারনাথ ছুটি নিয়া নিশিকান্তের দেশে রওয়ানা হইল। যাইবার সময়ে ভুবনমোহিনী হইতে ৭৪৲ টাকা ও সেবিঙ্গবেঙ্কের বহি দুইখানা ও ভুবনমোহিনীর দস্তখতি ফারম্‌ সঙ্গে নিয়া গেল।

কেদারনাথ কুসুমপুরে নিশিকান্তের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীটি অতি শোচনীয়, মাত্র দুইখানা জীর্ণ ঘর বিদ্যমান। বাড়ী ঘরের আকৃতি দেখিয়াই তাহার বাসিন্দাবর্গের অবস্থা কেদারনাথ অতি সহজেই অনুমান করিতে পারিল। নিশিকান্তকে ডাকিতেই সে বাড়ীর বাহির হইয়া আসিল, আসিয়া দেখে একটি দিব্যকান্তি যুবা পুরুষ একটি ব্যাগ হস্তে দণ্ডায়মান। নিশিকান্ত আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল,—মশায় কি আমাকে চান ?

কেদার বলিল,—মশায়ের নাম কি নিশি বাবু ?

হ্যাঁ, আমার নামই নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনার নাম কি ? আমার কাছে আপনার কি দরকার ?

"আমার নাম সুরেন্দ্রচন্দ্র চাটুয্যে, আপনি আমার মামাত বোন্ ভুবনমোহিনীকে বিয়ে করেছেন। অনেক দিন থেকে মোহিনীকে দেখি না, এ অঞ্চলে একটু কাজ ছিল, তাই ভাব্‌লাম মোহিনীর সাথে একটু দেখা করে যাই।" তৎপরে হাসিয়া বলিল, "মশায় ত বেশ লোক দেখ্‌ছি, কুটুম্বকে একটু বস্‌তেও দেবেন না ?"

কেদারের কথা শুনিয়াই নিশিকান্তের মুখ শুকাইয়া গেল, তাহার দুইটী কারণ ছিল, প্রথম কারণ ভুবনমোহিনী সম্পর্কে, দ্বিতীয় কারণ কুটুম্ব বাড়ীতে আসিয়াছে, সে খাওয়াইবে কি, তাহারা যে গতকল্য হইতে একেবারে উপবাসী।

নিশিকান্তকে মৌন থাকিতে দেখিয়া কেদার নিশিকান্তের দুরবস্থার বিষয় আরও বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিল। সে অতি সহজেই আবার বলিল, "মশায়ের যা অভিরুচি হয় হউক, আমি ত এ বেলা এখান থেকে যাচ্ছি না। চলুন ঘরে যেয়ে বসি।"

নিশিকান্ত আর উপায়ন্তর না দেখিয়া কেদারকে বলিল,—আসুন সুরেন্দ্র বাবু, ঘরের ভিতরে যেয়েই বসি।

ঘরের ভিতরে যাইয়া দেখিল, একটি মাস ছয়েকের বালিকা একটি ছিন্ন মাদুরের উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছে। ঘরে বিশেষ কোনও জিনিষ নাই। একখানা ছোট তক্তপোষ, তাহার উপর ঐ ছিন্ন মাদুর।

ভুবনমোহিনীর উপর অত্যাচারের কথা স্মরণ হওয়াতে নিশিকান্তকে দেখিয়াই কেদারের মনে তাহার উপর ভয়ানক ঘৃণা ও রাগ হইয়াছিল, সে মনে মনে বলিল, পশু, নরাধম, তুমি যে অমূল্য রত্ন বিসর্জ্জন দিয়েছ, তোমার কপালে কি আর সুখ আছে? কুলবধূকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলে তার গৃহে কি আর লক্ষ্মী থাকে? তোমার কপালে অন্ন জুটিবে কেমন করিয়া? সেই ঘৃণা ও রাগ মুখে প্রকাশ না করিয়া কেদার দেখিল, নিজ হইতে টাকা না দিলে তাহার অন্ন জুটিবে না বোধ হয়, অথচ তাহারও ত আহার করিতে হইবে, সেই জন্য সে হাসিয়া বলিল,—নিন্ নিশি বাবু, এই পাঁচটি টাকা নিন্। কুটুম্ব বাড়ী এসেছি, একটু ভদ্রতা করতে হয়। আপনি আমাকে সমাদর করেন নি বলে আমার ভদ্রতা ছাড়্‌ব কেন?

নিশিকান্ত ঐ টাকা পাইয়া এক সমস্যার হাত হইতে উদ্ধার পাইল। সে বলিল,—সুরেন্দ্র বাবু, তা বল্‌তে পারেন, তবে কিনা দেখুন, ভদ্রতা সবই অর্থ সামর্থ্যের উপরে নির্ভর করে। সত্য কথা বলব কি, আজ আপনার এই টাকা কয়টা না পেলে আপনাকে কিছু খাওয়াতেই পার্‌তাম না। আমরা গত কাল থেকে উপবাসী।

কেদার বলিল, তা হলে এখন খাওয়ার আয়োজন করুন, আর আমার বোন্‌কে ডাকান।

নিশিকান্ত এবার ঢোক গিলিতে আরম্ভ করিল, সে যে কি বলিবে তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিছুক্ষণ বাদে বলিল,—আপনার বোন্‌ত এখানে নাই।

নাই কেমন ?

কেন, আপনি নরেন্দ্র বাবুর খুনের মোকদ্দমার কথা শোনেন নাই ?

তা শুনেছিলাম।

তার পরে তাকে ত্যাগ করেছি।

ত্যাগ করেছেন ?

হ্যাঁ, তাকে কলঙ্কিনী মনে করে ত্যাগ করেছি।

বলেন কি ? সে কলঙ্কিনী ?

তাইত আমার বিশ্বাস।

তাই আপনার বিশ্বাস ? সে বিশ্বাস কেন হলো ?

বিশ্বাস হলো, আবার কেমন করে হবে ?

বলি কোনও প্রমাণ পেয়েছিলেন যে সে কলঙ্কিনী ?

প্রমাণ অবশ্য পেয়েছিলাম।

চাক্ষুস প্রমাণ ?

চাক্ষুস প্রমাণ কি আর পাওয়া যায় ?

তবে কি প্রমাণ ?

এই অনুসন্ধান করে যতদুর জানা যায়।

কার কাছে অনুসন্ধান করেছিলেন ?

এই যাদের কাছে দরকার।

তারা সত্য বলেছে কি মিথ্যা বলেছে তা বুঝলেন কেমন করে ?

তারা মিথ্যা বল্‌বে কেন ?

তারা কি চাক্ষুস প্রমাণ দিয়েছে ?

না তা দেবে কেন ? তারাও তাদের অনুমানেই বলেছে। একা বসন্ত বলেছিল, সে জান্‌ত, আমার স্ত্রী কলঙ্কিনী।

বসন্ত কেমন স্ত্রীলোক ?

সে অতি দুশ্চরিত্রা।

একমাত্র তার কথাতেই বল্‌তে গেলে আপনার স্ত্রীকে আপনি ত্যাগ করেছেন ?

না মশায় তা নয়, তবে সেই প্রধান প্রমাণ।

আপনার স্ত্রীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?

তাকে আবার জিজ্ঞাসা করব কি ? আসামী কি নিজে তার দোষ স্বীকার করে ? আপনার ত দেখ্‌ছি খুব বুদ্ধি !

তা ত ঠিকই, নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন, তাকে একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না, আবার তাতে আমার বুদ্ধির দোষ হলো। যাক্ সে কথা, আপনার স্ত্রীকে ত্যাগ করে ভাল কাজ করেন নাই।

আমি যা ভাল বুঝেছি তাই করেছি।

নিশিকান্তের কথা শুনিয়া কেদারের একবার মনে হইল, তাহার গণ্ডদেশে দুই চপেটাঘাত বসাইয়া দেয়, আবার তখনই তাহার মনে হইল, সে ত এখানে ঝগড়া করিতে বা ভুবনমোহিনীর সতীত্বের প্রমাণ করিতে আসে নাই, সে বহু কষ্টে রাগ দমন করিয়া বলিল,—যাক্ সে কথায় আর কাজ কি। আপনি যা ভাল বুঝেছেন করেছেন, আপনি এখন খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করুন। আপনি বুঝি তাকে পরিত্যাগ করে আর এক বিয়ে করেছেন ?

হ্যাঁ, তা না করে আর করি কি বলুন ? সংসার চালায় কে ?

কেদারের তাহা শুনিয়া হাসি আসিল, সংসার ত প্রকাণ্ড, তাহা চালানের জন্য আবার লোকের প্রয়োজন হয়! এই সংসার চালান নিয়া আমাদের দেশে অনেক সংসারে দৈন্যতার, দুঃখের সৃষ্টি হয়!

কেদার বলিল,—আপনার না বেশ জায়গা জমি ছিল, তা খোয়ালেন কি করে?

আর মশায় সে কথা আর বল্‌বেন না, সব অদৃষ্ট, সব অদৃষ্ট! সেই মোকদ্দমার পর আমি ত আবার বিয়ে কর্‌লাম, মহালে যাওয়ার কতকদিন পরে আমার মুহুরি বেটা জমিদারকে জানাল, আমি অনেক টাকা তহবিল তছ্রুপ করেছি। মশায় হিসাব রাখা কি সহজ কথা, তার মধ্যে আবার জমিদারির হিসাব। দেওয়ানজি যেয়ে আমার মহালে উপস্থিত। বেটা মহালে যেয়ে আমার মহাল যাচাই আরম্ভ কর্‌ল, তা করে সে সাব্যস্ত কর্‌ল, আমি পাঁচ হাজার টাকা তছ্রুপ করেছি। তিনি ত সেই টাকা চেয়ে বস্‌লেন আমি তা দেব কেন? তাতে তিনি চান ফৌজদারি কর্‌তে, আদালত কর্‌তে। আমি দেখ্‌লাম জমিদারের সঙ্গে মামলা করে কি আমি পার্‌ব? গরীব বড় লোকের সঙ্গে মামলা কর্‌লে জিততে জিততেও হেরে যায়, তাই আমি দেখ্‌লাম মামলা না করে আপোষে মিটিয়ে ফেলাই ভাল, তাই অনেক বলে কয়ে আমি রফা কর্‌লাম, জমিদার সরকারে আমি চার হাজার টাকা দিব। মশায়, মামলা কর্‌লে এক পয়সাও পেত না, এক পয়সাও আমার ভাঙ্গনি বের হতো না, তবে কিনা দেখ্‌লাম বড়লোকের সঙ্গে গরীবের মামলা করা পোষায় না। বাবার আমলের ত কিছুই ছিল না, যা ছিল দুই একটু জায়গা জমি। আমি সেই জায়গা জমিটুকু বেঁচে পাঁচ হাজার টাকা পেলাম, তার চার হাজার টাকা জমিদার সরকারে দিলাম, আর ঐ এক হাজার টাকা এই বছর দুই বসে খেয়েছি। এখন হাত একেবারে শূন্য। আর মশায়, জমিদারও এমন

বেইমান, আমার থেকে টাকাগুলি আদায় করে আমায় কাজ থেকে একেবারে বরখাস্ত করে দিলে।

কেদার হাসিয়া বলিল, বাস্তবিকই, বড় বেইমান ত। এমন বেইমান ত ভূভারতে দেখা যায় না। আপনাকে বরং প্রমোশন দেওয়া উচিত ছিল। এতগুলি টাকা আপোষে অত সহজে একবারে দিয়ে ফেল্‌লেন।

নিশিকান্ত কেদারের পরিহাস বুঝিল না, সে বলিল,—প্রমোশন না হউক, বরখাস্ত করার কোনও কারণ ছিল না। হঠাৎ বরখাস্ত করায় আমি চাকরি কোথায় পাই বলুন ত? এখনকার দিনে চাকরির বাজার কি সোজা?

তাত দেখ্‌ছি জমিদারের অন্যায়ই হয়েছিল। আপনার চাকরির পন্থা না করে আপনাকে বরখাস্ত করা তার নেহাৎ অন্যায় হয়েছে। তারপর অন্য কোনও জায়গায় আর চাকরি দেখেন নাই?

দেখেছি বই কি, চাকরি মিলে কই? চাকরির বাজার কি সস্তা? আচ্ছা মশায়, আপনারা ত সহরে থাকেন, চেহারাতেই বুঝতে পাচ্ছি, আর আপনি যখন আমার নেহাৎ কুটুম্ব, আপনিই কেন আমার একটি চাকরি জুটিয়ে দিন্ না?

আপনি কি পর্য্যন্ত পড়েছিলেন?

নিশিকান্ত এবার একটু বিপদে পড়িল, সে কি বলিবে, তাহার প্রকৃত বিদ্যার কথা বলিলে ত তাহার কুটুম্ব বুঝিবে সে আদৌ কোনও কাজের উপযুক্তই নয়। সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—আমি ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিলাম, বাবা মরে গেলেন বলে খরচ না চলায় আর পড়া হলো না।

কেদার বুঝিল, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। নিশিকান্তের সহিত আলাপেই কেদার বুঝিতে পারিল, তাহার বিদ্যা অতদূর পর্য্যন্তও হয় নাই। তবুও

কেদার নিশিকান্তকে সে বিষয়ে কিছু না বলিয়া বলিল, আচ্ছা দেখ্‌ব, আপনার কোনও চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি কিনা। আশা করি পার্‌ব।

নিশিকান্ত বলিল, "তা হলে সুরেন্দ্র বাবু, আপনি বসুন, আমি আপনার খাওয়ার উদ্যোগ করি যেয়ে।" এই কথা বলিয়া নিশিকান্ত কেদারের খাওয়ার আয়োজন করিতে চলিয়া গেল। নিশিকান্ত কেদারকে বেশ পরিতোষ রকমেই ভোজন করাইল। নিশিকান্তের এই স্ত্রীই উভয়কে পরিবেশন করিল। আহার করিতে বসিয়া কেদার নিশিকান্তকে বলিল, এ বাড়ী খানা ত আপনার আছে

নিশিকান্ত বলিল,—তাও বা কেমন করে বলি? জায়গাটুকু জমিদারের, ঐ যে বলেছিলাম, জামদারের টাকার জন্য বাড়ী বিক্রি করেছিলাম। জমিদার খুব দয়ালু কিনা, তাই জায়গাটুকু দিয়েছেন, আমি ঘর দু খানা করে কোনও মতে আছি।

কেদার বলিল,—তা হলে দেখ্‌ছি জমিদার নেহাৎই বেইমান।

যাক্ সে কথা, এখন আপনি যাবেন কবে?

কেদার হাসিয়া বলিল,—ভয় নাই, আমি বিকেল বেলা আর থাক্‌ব না। চলুন উঠি, আপনার সাথে আরও কথা আছে। আপনাকে একটা সুখবর দেবো।

উভয়ে হাত মুখ ধুইয়া পান চিবাইতে বসিল। নিশিকান্ত তামাক ভরিয়া আনিয়া হুকাটি কেদারের নিকট অগ্রসর করিয়া বলিল,—খান।

কেদার বলিল,—না, আমি তামাক খাই না।

তামাকও খান না?

তামাকও খাই না একথা বল্‌তে পারি না, আমি ছোট নিশা করি না।

ও বুঝেছি, তবে রাত্রিতে থেকে যান, বাজার থেকে আনিয়ে রাখ্‌ব, দুজনে বেশ আমোদ করা যাবে।

কেদার পাঁচ টাকা নিশিকান্তকে দিয়াছিল, তাহা হইতে তিন টাকার চাউল, ডাইল, মাছ, তরকারি প্রভৃতি আনিয়া নিশিকান্তের নিকট দুই টাকা ছিল, তাহা দিয়াই সে মদ খাইবার প্রস্তাব করিল। কেদার বুঝিতে চাহিয়াছিল, এমন অভাবে পড়িয়া নিশিকান্ত মদ পরিত্যাগ করিয়াছে কি না; কিন্তু কেদার দেখিল, নিশিকান্ত পূর্ব্বের স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করে নাই, সে এখনও পূর্ণ মদ্যপায়ী।

কেদার বলিল,—না মশায়, আমার বিকেলে থাকা হবে না। যাক্ সে কথা। দেখুন, আমার বোন্ মোহিনী যে এখানে নাই তা আমি জানি। সে কুলটা বা দ্বিচারিণী নয়, সে মহা সতী সাধ্বী, আপনি অন্যায় মত তাকে গৃহত্যাগিনী করেছেন। যা হোক সে আশ্রয় পেয়েছে, সে এখন তার ভায়ের কাছে আছে। আপনার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব দেখে আপনার পিতার মৃত্যুর পর আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার পিতার গচ্ছিত টাকা থেকে এক হাজার টাকা সে সরিয়ে রেখেছিল, সেই টাকার পাঁচ শ টাকা তার নামে, পাঁচ শ টাকা আপনার ছেলের নামে সে সেভিন্সবেঙ্কে রেখে দিয়েছিল। সেই টাকা থেকে সে ১০৬৲ টাকা খরচ করেছে, আজ আপনাকে পাঁচ টাকা দিয়েছি, আর ঐ নিন্ বাকী ৮৮৯৲ টাকা। এই টাকা আপনার হতভাগিনী স্ত্রী আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, তার টাকার কোনও প্রয়োজন নাই। এই টাকার কথা আপনাদের গ্রামের রামচন্দ্র শীল আর তার মা জানে। যদি ইচ্ছা করেন, আপনি তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারেন।

নিশিকান্ত হাত বাড়াইয়া বলিল,—দিন টাকা, অত জিজ্ঞাসা কর্‌বার আমার প্রয়োজন নাই।

কেদারের মনে হইতে লাগিল, কি পাষণ্ড! কি অকৃতজ্ঞ! স্বামী স্ত্রীতে স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যবধান! স্বামী কত নীচ, আর স্ত্রী কত মহৎ? তবুও

আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক নিয়ম ও শিক্ষানুসারে এবং স্বামীর মুখাপেক্ষী হইয়াই স্ত্রীর থাকিতে হইবে? স্ত্রী যেন স্বামীর শুধু ক্রীড়ার পুত্তলিকা মাত্র।

সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিশিকান্তের হাতে টাকাগুলি দিল, নিশিকান্ত একটি একটি করিয়া টাকা গণিয়া নিল। তাহার মুখে যেন হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কেদার বলিল,—তা হলে এখন আমি উঠি।

নিশিকান্ত বলিল,—আজ রাত্রিতে থেকে যান না? রাত্রিতে বেশ আমোদ করা যাবে, না হয় আমিই সমস্ত খরচ দেবো।

কেদারের আর নিশিকান্তের মুখ দেখিতে ইচ্ছা হইল না। সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিশিকান্তের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহার বাড়ী হইতে চলিয়া আসিল। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সময় সহরে যাইয়া ভোলানাথ বাবুর পরিবারস্থ সকল লোকের খবর নিয়া আসিল। বাসায় আসিয়া ভুবনমোহিনীর নিকট যথাযথ বর্ণনা করিল।

এক নূতন ডেপুটির সঙ্গে অনিতার বিবাহের প্রস্তাব যে রমেশ বাবুর স্ত্রী রমেশ বাবুর নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ডিপুটি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সুধীরচন্দ্র। সুধীরচন্দ্র তৃতীয় বিভাগে এম, এ পাশ করিয়া ডিপুটির উমেদারি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। তাহার পিতা কৈলাস বাবুর সহিত বড় বড় সাহেবদের খুব চিনা, তিনি তৈল-মর্দ্দনে খুবই পটু। সাহেব সুবাদের সাথে, এমন কি সাহেব সুবাদের চাপরাশির সাথেও তাহার খুব পরিচয়। তিনি প্রতি সপ্তাহে কমিশনার সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ী যাইয়া একবার সেলাম জানাইয়া আসেন। যদি কোনও সপ্তাহে সাহেবেরা মফঃস্বলে যাওয়ায় তাহার এই কর্ম্ম-পদ্ধতি বাদ পড়িয়া যায়, সাহেবদের সহিত পুনর্ব্বার দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার আর রাত্রিতে নিদ্রা হইত না, খাওয়ারও রুচি থাকিত না। রাস্তা দিয়া বাহির হইলে যে কোনও সাহেবদের সহিত দেখা হইত, পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই সেলাম দিতেন, কাহাকেও বাদ দিতেন না।

একদিন তাহারই সহযোগী ডেপুটি বিনয় বাবু হাসিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন,—মশায়, আপনি দেখ্‌ছি সাহেব দেখ্‌লেই সেলাম ঠোকেন, এণ্ডু, পেণ্ডু কাকেও বাদ দেন না। আপনার সঙ্গে রাস্তায় একত্রে বেড়াতে লজ্জাই করে।

তদুত্তরে কৈলাস বাবু বলিলেন,—মশায়, এণ্ডু পেণ্ডু বল্‌বেন না, এ সবই রাজার জাত, আজ যাকে এণ্ডু বলবেন তাকে দুদিন পরেই দেখ্‌বেন

লাট সাহেব, ওরা দেবতা, দেবতার মধ্যে ছোট বড় বিচার কি মানুষের সাধ্য ? এ মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত, তাই আমি সকল দেবতাকেই পূজা দিয়ে দেই।

সুধীরচন্দ্রের এম, এ পাশের পর কৈলাস বাবু বহু চেষ্টা করিয়া দুইবার বিফলকাম হইয়া তৃতীয় বার কমিশনার, এক্‌জিকিউটিব কাউন্সেলের মেম্বরকে ধরিয়া সুধীরচন্দ্রকে ডেপুটি করিলেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিয়া দিলেন, "সাহেবসুবা দেখ্‌লেই সেলাম কর্‌বে, কাকেও বাদ দিও না, সময়ে কাজে লাগ্‌বে।"

সুধীরচন্দ্র ডেপুটি হওয়ার কিছুকাল পরেই কৈলাস বাবু হঠাৎ কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন, ছেলের চাকরির সুবিধাটা বেশী দিন ভোগ করিয়া যাইতে পারিলেন না।

পিতার মৃত্যুর পর সুধীরচন্দ্র নিজেই সংসারের কর্ত্তা হইল। মাতা তাহার নিকট তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলে সে বলিল,—আচ্ছা, এখন ত মানুষ হয়েছি, এখন আমি নিজেই দেখে শুনে একটা বিয়ে কর্‌ব, পাত্রী ঠিক করে তোমাকে জানাব।

সুধীরচন্দ্রের মাতা উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া "স্বস্তি" বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি সেকেলে মানুষ, তিনি মনে করিলেন, এ কালের নিয়মই এই, সুতরাং তিনি আর এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করা সঙ্গত বোধ করিলেন না।

রমেশ বাবুর শ্যালক-পুত্র শচীন্দ্রনাথ মুরুব্বির জোরে সব-ডিপুটি হইয়াছিল, উভয়েই এখন ফরিদপুরে প্রবেশনারি করিতেছে। উভয়ের মধ্যে খুব ভাব, তাহারা সমপাঠী।

শচীন্দ্রনাথ কথায় কথায় একদিন রমেশ বাবুর কন্যা অনিতার কথা সুধীরের নিকট উত্থাপন করিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, আচ্ছা এ বিষয়

আর একদিন দেখা যাবে। কথায় কথায় আজ আবার শচীন্দ্রনাথ সুধীরের নিকট তাহার সহিত অনিতার বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল,—মেয়ে কেমন? বিদ্যাবুদ্ধি কেমন তা বল, তবে ত সে বিষয় চিন্তা করা যাবে।

শচীন্দ্র উত্তর করিল,—মেয়েটির রং তেমন খুব ফরসা নয়, তবে কালোও নয়, মুখশ্রী, অঙ্গ সৌষ্ঠব খুব সুন্দর, দেখ্‌লেই তাকে ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে।

সুধীর হাসিয়া বলিল,—তুমি ত আবার তাকে ভালবেসে ফেলনি? যে রকম তুমি বর্ণনা কল্লে, শেষ কালে আবার তোমার সঙ্গে লড়াই করতে হবে না ত?

বল্‌ছ কি আহাম্মক, আমার যে পিশ্‌তোতো বোন্।

কেমন পিশ্‌তোতো বোন্?

আমার বাবা আর অনিতার মা সহোদর ভাই-বোন্।

তা হলোই বা, তাতেই বা ঠেকায় কিসে? মুসলমানরা বা সাহেবেরা ত পিশ্‌তুতো বোন্‌কে বিয়েই করে।

আমরা ত মুসলমানও নই, সাহেবও নই, আমরা যে হিন্দু।

ভায়া ওসব কিছু না, ওসব simply prejudice, শুধু আমাদের কুসংস্কার।

শচীন্দ্র দেখিল,—সুধীরের সঙ্গে এ বিষয়ে যুক্তি তর্ক বৃথা, তাহার প্রবৃত্তি অতি হীন ও নীচ। তাহার স্বভাবের বিষয়ে ছাত্র-জীবনেও একটু বদনাম ছিল, সে সময় সময় নাকি মদও এক আধটুকু পান করিত। সে প্রায়ই বলিত, এখনকার দিনে ভদ্রসমাজে চলিতে গেলে এর এক আধটুকু দরকার। কিন্তু শচীন্দ্র তবুও তাহাকে উপযুক্ত পাত্রই মনে করিল। এখানে বিবাহ হইলে অনিতার খাওয়া দাওয়ার কোনও কষ্ট হইবে না,

সুধীরের পিতা বিস্তর টাকা রাখিয়া মারা গিয়াছেন, তাহারা মাত্র দুইটি ভাই, ছোট ভাইটিও পড়াশুনায় বেশ ভাল।

শচীন্দ্র সুধীরকে বলিল,—তা তুমি অনিতাকে কবে দেখ্‌তে যাবে ?

সুধীর বলিল,—রূপের ত ব্যাখ্যা কর্‌লে, গুণের ত বাখ্যা কর্‌লে না।

সে এবার ম্যাট্রিক দেবে, আশা করি ফার্ষ্ট ডিভিসনেই পাস হবে।

তা হলে লেখাপড়া মন্দ শিখেনি, কোন্‌ স্কুলে পড়ে ?

বেথুন স্কুলে।

"বেথুন স্কুলে ?' ইহা বলিয়াই সুধীরচন্দ্র মুখ ভ্রুকুটি দিয়া বলিল,—তোমার পিশেপিশিরা দেখ্‌ছি নেহাৎ সেকেলের। বেথুন স্কুলে কি এখন আর ভদ্রলোকের মেয়েরা পড়ে ?

কেন, ভদ্রলোকের মেয়েরা পড়ে না ত কাদের মেয়েরা পড়ে ?

ভদ্রলোক আর কি, পাঁড়াগেয়ে ভদ্রলোক, অর্থাৎ নেহাৎ হাঙ্গলা বাঙ্গলা গোছের, যাদের কোনও রুচি নাই।

সে কেমন ?

তুমি ত কোনও খবরই রাখ্‌না দেখ্‌ছি। সেখানে না আছে গান বাজনার চর্চ্চা, না আছে নাচের চর্চ্চা, না করে তারা থিয়েটার। তারা কেবল পড়া নিয়েই ব্যস্ত।

বাবা, মেয়েদের আবার নাচ শিখ্‌তেও হবে নাকি ?

হবে না ? এটা যে একটা Fine Art (সূক্ষ্ম বিদ্যা)।

নাচ শিখে দেখাবে কাকে ? স্বামীকে ? না দশজনকে নিমন্ত্রণ করে তাদের ?

সুধীরচন্দ্র এবার যেন একটু বিপদে পড়িল, সে একটু থামিয়া বলিল,—তা আর দেখাবার দরকার কি, একটা আর্ট শেখাতো হলো। একটা বিদ্যা শিখ্‌লে ফেলান যায় না; তুমিও দেখছি নেহাৎ সেকেলে ধরণের।

হ্যাঁ ভাই, সেকেলে ধরণেরই ভাল। আমার ত বিশ্বাস ছিল, বেথুন স্কুলই ভাল, তোমার মতে মেয়েদের জন্য কোন্ স্কুল ভাল ?

বেথুন স্কুল এখন একটা স্কুলের মধ্যেই নয়, এখনকার দিনে ভদ্রলোকের মেয়েরা হয় পড়্‌বে ডাইয়োসিয়েন্ স্কুলে, না হয় পড়্‌বে ব্রাহ্মগার্ল স্কুলে।

আমার পিশে ত ব্রাহ্ম নয়।

আরে মূর্খ, ওসব স্কুলে কি শুধু ব্রাহ্মরাই পড়ে ? বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্র-লোকের মেয়েরাই ত ও স্কুলে বেশী পড়ে, ব্রাহ্ম আর কয় জন ?

কি জানি ভাই, আমি অত সব জানি না।

জান্‌বে কি, ঐ স্কুলের মেয়েদের ট্রেনিংই অন্য রকমের। আমার এক দূরসম্পর্কীয় বোন্ ডাইয়োসিয়েন স্কুলে পড়্‌ত, সে যখন বীণা হাতে করে স্কুলে যেত আর স্কুল থেকে আস্‌ত, তখন আমার মনে হতো স্বরস্বতী দেবী যাচ্ছে আস্‌ছে। তখনই ভাই মনে হতো ঐ গানটি গেয়ে ফেলি।

জয় জয় দেবি চরাচরসারে
কুচযুগ-শোভিত মুক্তাহারে
বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।

সুধীর ঐ গানটি আওড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে গানটিও একটু গাহিল।

শচীন্দ্রনাথ বলিল,—আমার কপালে ত ভাই ও রকম বীণাপাণি দেখ্‌-বার সুযোগ ঘটে উঠে নাই। আমি বরাবরই ছিলাম নেহাৎ মফঃস্বলের সহরে।

তোমার বোন্ গান জানে কেমন ?

তা আমি অত বল্‌তে পারি না, সম্ভব জানে এক রকম। তা ত তুমি নিজেই যেয়ে পরীক্ষা কর্‌বে।

নাম বুঝি অনিতা ? অনিতা নামটা মন্দ নয়, বেশ কবিত্ব মাখা। এখানে দেখ্‌ছি রমেশ বাবুর রুচি মন্দ নয়। এক এক মেয়ের নাম শুন্‌লেই আতঙ্ক উঠে যায়, গায়ে জ্বর আসে।

সে কি রকম ?

যেমন কালিতারা, লক্ষীমণি, সাবিত্রী সুন্দরী। যাক্‌ সে কথা। এই অনিতার আগে অন্য কোথাও থেকে আর বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল ?

হ্যাঁ, তারা ত তার পাত্র এক রকম ঠিকই করে রেখেছিলেন, তবে তার কাছে তারা এখন মেয়ে দেবেন না।

কেন ? সে বেচারি কি অপরাধ কর্‌ল ?

তাদের এখন মত বদ্‌লে গেছে, তার নাকি এখন স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে।

হতে পারে ভাই তোমাদের অনিতাও এর জন্য কতক দায়ী।

কি রকম ?

রকম আর কি ? হয়ত অনিতাই তাকে আগে প্রশ্রয় দিয়ে থাক্‌বে, এখন সে দিকে আর সুবিধা না পেয়ে অন্য দিক ধরেছে।

সুধীরচন্দ্রের কুৎসিৎ রুচি দেখিয়া শচীন্দ্রনাথ এবার একটু ক্রোধান্বিত হইল, সে বলিল,—তোমার সঙ্গে কথা বলা আমার পোষাবে না। যাক্, তোমার সে মেয়ে বিয়ে করে কাজ নাই। তোমার রুচি অতি জঘন্য। তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত।

সুধীর শচীন্দ্রের পিট চাপড়াইয়া বলিল,—আরে রাগ করো না ভাই, না হয় আমাকে ক্ষমা কর। আমি না হয় আর ওকথা বলব না। তার কার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল ?

রমেশ বাবুদের আফিসে কেদার বলে একটি কর্ম্মচারী আছে, তার সঙ্গে।

সুধীর একথা শুনিয়া কতক্ষণ চিন্তা করিল, তৎপরে বলিল,— কেদার, এক কেদার ত আমাদের মেসে থাকৃত, সে তখন ই, আই, রেলওয়ে আফিসে প্রবেসনার ছিল। শুনেছিও নাকি সেখানে বহাল হয়েছে।

সে কেদারই হবে। ছেলেটিও বেশ সুন্দর, আমিও তাকে দেখেছি রমেশ বাবুর বাসায়।

ও সেই কেদার, সে ত হলো আস্ত একটা idiot (বলদ)। বাবা, তার ভাত খাওয়ার কথা মনে হলে এখনও আমার হৃদ্‌কম্প উঠে যায়।

শচীন্দ্র হাসিয়া বলিল,—সে কি রকম?

তার খাওয়া নিয়ে আমাদের মেসে এক ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গিয়েছিল। শুন্‌বে কাণ্ডটা?

বল না?

সুধীর মেছের পোলাও বিভ্রাটের কথা শচীন্দ্রের নিকট অঙ্গভঙ্গি সহকারে বলিল, অবশ্য তাহার নিজের কীর্ত্তি সম্পূর্ণ গোপন করিয়া গেল। শচীন্দ্র আগাগোড়া শুনিয়া বলিল,—হয় ত কেদার খুব গরীবের ছেলে, তাই আর কিছু খেতে পেত না, শুধু ভাত খেয়েই পেট ভর্‌ত।

আরে গরীব ত কতই দেখ্‌ছি, এ রীতিমত একটা রাক্ষস।

যাও।

সত্যি, আমি একবর্ণও মিথ্যা বলি নাই। যা হোক, রমেশ বাবুদের সুমতি হওয়ায় মেয়েটা বেঁচে গিয়েছে। ওটার কাছে পড়্‌লে মেয়েটা ভাতের হাড়ী নামাতে গিয়ে হাত পা পুড়ে মারা যেত।

সে কি রকম?

বুঝ্‌লে না? ওটা খেত এক এক বেলায় সের দু-তিন চালের ভাত, ঠাকুর রাখবার ক্ষমতা ত আর নাই, অনিতারই পাক কর্‌তে হতো। এখনকার দিনে ভদ্রলোকের মেয়েরা ত আর পাক করা শেখে না,

আর শিখ্‌বার দরকারও নাই, বেচারি পাক কর্‌তে যেয়ে অত বড় একটা হাড়ি নামাতেও পারতো না, হাত পা পুড়েই মারা যেত।

শচীন্দ্র সুধীরচন্দ্রের ভাতের হাড়ির বর্ণনা শুনিয়া হাসিয়া কুটপাট; বলিল, তুমি এত ঢং করেও কথা বল্‌তে পার। যাক্ সে কথা এখন, বল, তুমি কবে অনিতাকে দেখ্‌তে যাবে?

যাব শীগ্‌গিরই! এস, এক শনিবার দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে ছুটি নিয়ে অনিতাকে দেখে আসি।

আচ্ছা, দিন ঠিক কর, তার পর ছুটি নেওয়া যাবে।

শুনেছি রমেশ বাবু অনেক টাকা করেছেন? অনিতার ত আর বোন্ নাই, অনিতাই একমাত্র উত্তরাধিকারী?

তা হলে অন্যান্য বিষয়ে এক আধটু ত্রুটি থাকলেও এমেয়েকে গ্রহণ করা যেতে পারে। টাকাও একটা কম বিষয় নয়। আচ্ছা, তা হলে ছুটির উদ্যোগ করা যাক্।

ঠিক হইল, উভয়ে এক শনিবার ছুটি নিয়া অনিতাকে দেখিয়া আসিবে।

অনিতার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী। কেদার এখন প্রায় রোজই অনিতাকে যাইয়া পড়া বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু এখন যে পর্য্যন্ত কেদার অনিতার নিকট থাকে, অনিতার মাতা তাহাদিগের নিকট বসিয়া থাকেন, কেদারের সহিত বড় বিশেষ কথাবার্ত্তা বলেন না। ইতিমধ্যে অনিতার মাতা অনিতার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তোর জন্য অন্য মাষ্টার রাখ্‌লে হয় না? কেদারও ম্যাট্রিকুলেশন পাশ তুইও ম্যাট্রিকুলেশন দিচ্ছিস্‌, সে তোকে পড়াবে কি? তোকে পড়ায়ই বা কি? এক জন বি. এ. কি এম. এ. পাশ মাষ্টার রাখ্‌ না?

তাহাতে অনিতা উত্তর দিল, ওকথা মুখ দিয়ে এনো না মা, তুমি জান, কেদার দা ম্যাট্রিকে দশ টাকা বৃত্তি পেয়েছিল? সে সব বিষয়ই ভাল জানে, সে যা পড়ায়, বি এ. এম এ.র বাবা। আমাকে পড়ায়, আমি বুঝি না কেমন পড়ায়, তা তুমি কেমন করে বুঝ্‌বে? এখন আমার পরীক্ষা নিকট, আমাকে আমার মনে পড়্‌তে দেও।

অনিতার মাতা অনিতাকে এবিষয়ে আর কিছু বলিলেন না। তৎপর হইতে কেদার যতক্ষণ থাকিত, অনিতাকে সর্ব্বদাই চ'খে চ'খে রাখিতেন। কেদার ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল, অনিতার মাতা অনিতার সহিত তাহার মিলামিশাটা এখন আদৌ পছন্দ করেন না! এক একবার কেদার মনে করিত, আর রমেশ বাবুর বাড়ীতে যাইবে না, অনিতা তাহার কে? আবার তথনই অনিতার কথা মনে হইত, তাহার পরীক্ষা ত নিকটবর্ত্তী,

হয় ত তাহার পড়া কি অঙ্ক বুঝিবার জন্য সে 'রাস্তার দিকে তাহার আশায় চাহিয়া আছে। এই কথা মনে হওয়া মাত্রই সে রাস্তার দিকে ছুটিত। যে দিন রমেশ বাবুর সহিত তাহার দেখা হইত, সে দিন সে অত্যন্ত সমাদর পাইত, কেদারের যত্নের যেন কোনও ত্রুটি না হয় সে বিষয়ে বাড়ীর লোককে রমেশ বাবু অস্থির করিয়া তুলিতেন। কিন্তু কেদার বুঝিয়াছিল, এই বাড়ীর সহিত তাহার সম্পর্ক প্রায় ঘুচিয়া আসিয়াছে। সেই মুহূর্ত্তের জন্য সে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল।

শচীন্দ্র সুধীরের ছুটি পাইতে মাস পাঁচ ছয় দেরী হইয়া গেল। একদিন রমেশ বাবুর স্ত্রী শচীন্দ্রের নিকট হইতে চিঠি পাইলেন, সে সুধীরকে নিয়া আগামী শনিবার অনিতাকে দেখিতে আসিবে। অনিতাকে বিবাহ করিবার তাহার সম্পূর্ণ মত আছে। এখন অনিতাকে তাহার পছন্দ হইলেই হয়।

অনিতার ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। সে পরীক্ষা খুব ভাল দিয়াছে, পরীক্ষায় সে যে এত ভাল করিতে পারিবে সে তা আদৌ আশা করে নাই। অঙ্ক সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইয়াছে, অতিরিক্ত অঙ্ক ও সংস্কৃত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইয়াছে, অন্যান্য বিষয়েও সে খুব ভাল উত্তর দিয়াছে, সে আশা করে পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করিবে। পরীক্ষা দিয়া তাহার মহা আনন্দ হইল।

আগামী কল্যই শনিবার। কেদার অনিতার পরীক্ষার কয়দিন রোজ সন্ধ্যার পর আসিয়া খবর নিয়া যায়, সে কেমন পরীক্ষা দিয়াছে, অনিতাও তাহার কাছে তাহার পরীক্ষার কথা বর্ণনা করে। আজ সন্ধ্যার পরে কেদার আসিলে অনিতা ছুটিয়া কেদারের নিকট যাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—কেদার দা, এবার একটা কাণ্ডই করে ফেল্‌লাম, আমি না জানি একটা বৃত্তিই পেয়ে ফেলি। যদি পাই, তবে প্রথম মাসের বৃত্তি দিয়ে তোমার গুরুদক্ষিণা দেব।

অনিতার মাতা সে সময়ে সে দিন সেখানে ছিলেন না। অনিতার আনন্দ দেখিয়া অনিতার মাতার ব্যবহারের কথা কেদার ভুলিয়া গেল। অনিতার আনন্দ দেখিয়া তাহারও অতীব আনন্দ হইল। সে হাসিতে হাসিতে বলিয়া ফেলিল,—অনু, টাকা কি একটা গুরুদক্ষিণা, ওত তুচ্ছ জিনিষ, এক দণ্ডও স্থায়ী নয়, একলব্য তার গুরুভক্তি দেখাবার জন্য দ্রোণকে তার একটা আঙ্গুল কেঁটে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন। যদি আমাকে গুরুদক্ষিণা দিতে হয়, তবে এমন কিছু দেবে যা চিরদিন মনে থাকে, যা অমূল্য।

অনিতার মন আজ আনন্দে ভরা, তাহার ভাবিবার যা বুঝিবার আজ কিছুই নাই, তাহার খোলা মন, সে অমনিই হাসিয়া বলিয়া ফেলিল, তা হলে গুরুজি, আমার গুরুদক্ষিণা স্বরূপ আমাকেই আমি তোমাকে দিব।

কেদার বলিল, সত্যি, তা পার্‌বে?

অনিতা বলিল, নিশ্চয়ই।

সেই মুহূর্ত্তেই উভয়েরই মনে হইল, তাহারা আজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এখানেই ইহার শেষ হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু উভয়ের মনেই উভয়ের প্রশ্নউত্তর নিয়া ভীষণ অন্দোলন চলিতে লাগিল। কেদার এই বিষয়কে এইখানেই সমাপ্ত করিতে চাহিয়া বলিল,—তা ত যেন হবে, এখন পেট ভরার কি কর্‌বে? জানত আমরা পেটুক ব্রাহ্মণ?

আচ্ছা, কাল বিকেলে তোমার এখানে চা খাওয়ার নেমন্তন্ন রইল। আমি নিজের হাতে তোমার জন্য জলখাবার বানাব; তুমি আস্‌বে কিন্তু।

কেদার উত্তর দিতে যাইতেছে ঠিক এমন সময় অনিতার মাতা সেই স্থানে আসিলেন। তিনি অনিতার নিমন্ত্রণ ব্যাপার শুনিয়াছিলেন।

তিনি অতি রুক্ষ স্বরে বলিলেন,—না, কাল কেদারের এখানে আসার কোনও প্রয়োজন নাই, এখন ত আর তোমার পড়ার কোনও দরকার নাই. কাল বিকালে আমাদের বাসায় কয়েকজন লোক আসবে।

অনিতা বলিল,—কয়েকজন লোক আসলে কেদার দার আসতে আপত্তি কি ? সেই কয়েক জন লোক আসার সঙ্গে কেদার দার আসার সম্পর্ক কি ?

অনিতার মাতা অনিতাকে ধমক দিয়া বলিলেন,— ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ভারি বিদুষী হয়ে গেছেন। সব কথারই কেবল কাটাকাটি। সেই কয়েকজন লোক আসার সঙ্গে কেদারের আসার কোনও সম্পর্ক আছে কি না আছে, তা মেয়ের কাছে নিকাশ দিতে যাব! আমার হুকুম, কেদারের কাল এখানে আসার কোনও প্রয়োজন নাই।

অনিতার জ্ঞানপ্রাপ্তির পর হইতে আজ পর্য্যন্ত সে এত বড় রূঢ় কথা একদিনের জন্যও শুনে নাই, তাহার মাতা যে তাহার প্রতি এ রকম রূঢ় ব্যবহার করিতে পারেন, তাহাই তাহার ধারণা ছিল না, তাহাই সে কল্পনা করিতে পারিত না।

অনিতার ভাল পরীক্ষা দেওয়ার সমস্ত আনন্দ হঠাৎ গভীর নিরানন্দে পরিণত হইল, তাহার মনে হইল, স্বর্গে উঠিয়া যেন হঠাৎ সে ভূতলে নিপতিত হইল। কেদার দার অপমান যেন তাহার মনে শেলের মত বিদ্ধ হইল। কেদার দার এ অপমান কেন ? তাহার মত চরিত্রবান লোকের এ লাঞ্ছনা কেন ? তাহারই জন্য। সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। সে আর একটিও কথা না বলিয়া তাহার শয়ন কক্ষে যাইয়া তাহার শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। থাকিয়া থাকিয়াই তাহার কেবল কেদারের অপমানের কথা মনে পড়িতে লাগিল। কেদারও আর একটি কথা না বলিয়া রমেশ বাবুর বাসা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

তৎপর দিবস অতি প্রত্যুষে রমেশ বাবুর স্ত্রী রমেশ বাবুকে বলিলেন,— একটু সকালেই আজ আফিস থেকে এসো, শচীন সুধীরকে নিয়ে আজ বিকেলে অনিতাকে দেখতে আস্‌বে। অনিতাকে বিয়ে কর্‌বার সুধীরের সম্পূর্ণ মত আছে, এখন তার পছন্দ হলেই হয়।

রমেশ বাবু বলিলেন, ওসব পাগলামি এখন রাখ, কেদারের সঙ্গেই অনিতার বিয়ে হবে। ওসব সুধীর ঠুধীর দিয়ে আমার কি হবে?

তুমি বল্‌ছ কি? সুধীর ডেপুটির ছেলে, নিজে ডিপুটি, বাপের আমলের কত টাকা আছে, তার কাছে মেয়ে দেবো না, দেবো কি হাড়-হাবাতের ছেলের কাছে? আর গুণের ত সীমাই নাই!

তুমি কি যে বল্‌ছ, তোমার মাথা খারাপ হলো নাকি? এখন অনিতাকে আবার সুধীর ফুধীরকে দেখিও না। বল্‌ছি, সে এখন সেয়ানা হয়েছে। অনিতার কথাতে স্পষ্টই বুঝেছি, সে কেদারকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করে রেখেছে, তার কাছে অন্য লোকের নাম করো না, তাতে ফল আরও খারাপ হবে।

আমি দেখ্‌ছি তোমারই মাথা খারাপ হয়েছে, একটুখানি মেয়ে, মোটে বয়স ১৬।১৭, তাতে আবার পতিত্বে বরণ কি? এ যে রীতিমত নাটক। যাক্ এখন সে নাটকের কথা, আজ সুধীর বিকেলে আস্‌ছে, তাকে মেয়ে দেখাতে হবে, তারপর তার কাছে মেয়ে দেই আর না দেই পরের কথা।

সত্যি নাকি? এতদূর এগিয়েছ? তা হলে মেয়ে দেখাও। আমি আবারও বলি, কাজটা ভাল কর্‌লে না। আচ্ছা, আমি আজ একটু সকালেই আস্‌ব।

অনিতার মাতা অনিতাকেও প্রাতঃকালে বলিলেন, সুধীরের সহিত তাহার সম্বন্ধ এক রকম ঠিক, সুধীর ডেপুটি, বড় লোকের পুত্র, সুধীর

আজ বৈকালেই তাহাকে দেখিতে আসিবে, সুধীর তাহাকে দেখিয়া পছন্দ করিলেই সুধীরের করে অর্পিত হইবে।

অনিতা এতক্ষণে বুঝিতে পারিল, তাহার মাতা কেদারের সঙ্গে কেন গতকল্য এরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। তখন সে মনে মনে এই প্রথম চিন্তা করিতে লাগিল, সে সুধীরের পত্নী হইতে পারে কি না? সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইল, তাহা অসম্ভব, সে না গতকল্যই কেদারকে আত্মদান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত। এখনও ত চব্বিশ ঘণ্টা পার হয় নাই।

রমেশ বাবু সে দিন সকালেই আফিস হইতে আসিয়া সুধীরচন্দ্রের প্রতীক্ষায় বৈঠকখানায় বসিয়া রহিলেন। বৈকালে শচীন্দ্রনাথ সুধীরচন্দ্র সহ রমেশ বাবুর বাড়ীতে আসিল। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া শচীন্দ্র রমেশ বাবুকে বলিলেন, "পিশে মশায়, এই সুধীর বাবু।" আবার সুধীরকে বলিল, "সুধীর, এই আমার পিশে মশায় রমেশ বাবু।"

শচীন্দ্র এই কথা বলা মাত্রই সুধীরচন্দ্র অগ্রসর হইয়া রমেশ বাবুর হাত টানিয়া করমর্দ্দন করিল। রমেশ বাবুর সহিত করমর্দ্দন করিয়াই সুধীরচন্দ্র রাস্তার ক্লেশ দূর করিবার জন্য পকেট হইতে সিগারেট কেশ খুলিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল।

রমেশ বাবু সুধীরের সহিত করমর্দ্দনের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন। তিনি যেন অবাক্ হইয়া গেলেন, এটা কোন্ দেশী সভ্যতা? তিনি তাহার শ্বশুর হইতে চলিয়াছেন তাহাকে নমস্কার বা প্রণাম না করিয়া একেবারে করমর্দ্দন! রমেশ বাবু করেন কেরাণিগিরি, তিনি ত এত সাহেবি জানেন না, সুধীরের করমর্দ্দনের মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি মনে মনে সুধীরের প্রতি ভয়ানক চটিয়া রহিলেন। আবার সুধীরকে সিগারেট টানিতে দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন! কিন্তু কি করেন,

সুধীর তাহার স্ত্রীর কথানুসারেই তাহার মেয়ে দেখিতে আসিয়াছে, রাগ দমন করিয়া তিনি বলিলেন,—তোমরা বস, আমি বাড়ীর ভিতরে খবর দিয়ে আসি।

অনিতার মাতা সুধীরের আসার খরব পাইয়া অনিতাকে দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শচীন্দ্র সুধীরচন্দ্রকে নিয়া বাড়ীর ভিতরে গেল। অনিতার মাতা অনিতাকে নিয়া আসিলেন। সুধীর, শচীন দুইখানা চেয়ারে বসিয়াছে, অনিতা আসিয়া আর একখানা চেয়ারে উপবেশন করিল।

রমেশ বাবুর স্ত্রী শচীন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখন তোরা আলাপ কর্, আমি একটু যাই।" ইহা বলিয়া তিনি অন্তরালে রহিলেন।

শচীন্দ্র দেখিল, একটা কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলে সুধীর অনিতার কথাবার্ত্তা হওয়া দুষ্কর, তাই শচীন্দ্র বলিল, "অনি, তোদের পরীক্ষা হয়ে গেছে?"

অনিতার যেন আজ আর সে হাসিমাখা মুখ নাই; একটি কালো মেঘের ছায়া আসিয়া যেন তাহার বদন-কমলকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। এই কয়েক ঘণ্টাতেই যেন তাহার চেহারার ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সে যেন তাহার পিতামাতার আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য জ্ঞানে কলের পুত্তলির ন্যায় কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। অনিতা উত্তর দিল,—হ্যাঁ।

সুধীর এবার সুযোগ পাইল, সে জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন হলো পরীক্ষাটা?

অনিতা উত্তর দিল,—ভালই। একথা বলিয়াই অনিতা চুপ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

সুধীর অন্য জায়গায় যতই বাক্‌পটুতা দেখাক না কেন, অপরিচিতা

স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করা অতি দুরূহ কাজ। সে মহা বিপদে পড়িয়া গেল, তাহার বিশ্বাস ছিল, কথা-প্রসঙ্গে কথা উঠিবে, আলাপ পরিচয় বেশ জমিয়া উঠিবে, কিন্তু এ যে একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত। অনিতা যে একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া বসিল। সে যে অনিতাকে কি প্রশ্ন করিবে তাহাই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না? তাহাকে ত আর মামুলি ধরণের প্রশ্ন করা যাইবে না, সে যে ম্যাট্রিক দিয়াছে।

সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চিন্তা করিয়া আর কোনও প্রশ্ন না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনাদের স্কুল থেকে এবার কতটি মেয়ে পরীক্ষা দিল?

অনিতা উত্তর দিল, বত্রিশ জন। অনিতা কথার উত্তর দিয়াই আবা মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

সুধীর এবার আলাপ জমাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইল, সে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—আপনাদের এবারকার ক্লাস কেমন? ভাল মেয়েটেয়ে আছে?

সুধীর প্রশ্নটা করিয়া যেন নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িল, প্রশ্নটা তাহার নিকটই যেন কেমন বিসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। অনিতা কিন্তু সেই প্রশ্নের মধ্যে কোনও বিশেষত্ব না দেখিয়া উত্তর দিল,—আছে এক রকম।

সুধীর দেখিল, অনিতার সহিত আলাপ জমান একপ্রকার অসম্ভব চেষ্টা। সে আবার প্রশ্ন খুঁজিতে লাগিল, যেন এবারকার প্রশ্ন খাপছাড়া না হয়। সে বহু চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনাদের স্কুলে গান বাজনার চর্চ্চা ছিল কেমন?

অনিতা বলিল,—মন্দ নয়।

সুধীরও লক্ষ্য করিতেছিল, অনিতার মুখে যেন হাসির চিহ্ন মাত্রই নাই, এক বিষাদের রেখা পড়িয়া রহিয়াছে, বড়ই গম্ভীর। তাহার উত্তর পাইয়া

সে যেন খুসী হইতে পারিতেছিল না। সে কল্পনা করিয়া আসিয়াছিল, অনিতার প্রতি কথাতে তাহার প্রাণের মধ্যে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়া যাইবে, হৃদয়ে প্রেমের বন্যা বহিয়া যাইবে, কিন্তু এখানে আসিয়া অনিতার উত্তর শুনিয়া তাহার সে কল্পনা যেন স্বপ্নবৎ ঘুচিয়া গেল। তাহার চেষ্টা বারংবারই ব্যর্থ হইতে লাগিল, বহু চেষ্টা করিয়াও অনিতার সহিত সে আলাপ জমাইয়া উঠিতে পারিল না, অথচ অনিতার মুখখানা তাহার বড়ই মিষ্টি লাগিতেছিল। সে যত প্রশ্নই করে অনিতা এক কথায় তাহার উত্তর দিয়া চুপ করিয়া থাকে, এমত অবস্থায় কথাবার্ত্তা আর কতক্ষণ চালান যায়? সুধীর মনে করিল, বুঝি বা লজ্জাতুর ভাবই অনিতার এই প্রকার উত্তরের কারণ।

সুধীর আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল,—তা হলে আমাদের দুটো গান শুনিয়ে দিন না?

সেই প্রকোষ্ঠেই টেবিল হারমনিয়েম ছিল, অনিতা সেই হারমনিয়েম যোগে একটি গান গাহিল। গান শুনিয়া সুধীর শচীন্দ্রের কাণে কাণে বলিল,—ভারি সুন্দর গায় ত, ভারি মিষ্টি গলা, আর একটা গান গাইতে বল না।

শচীন্দ্র অনিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—সুধীর বাবু বলছেন, তোর গান তার কাছে বড়ই মিষ্টি লেগেছে, আর একটা গান গা।

শচীন্দ্রের মুখে এই প্রশংসা শুনিয়া অনিতার মুখে কোনও প্রকার আনন্দের বা লজ্জার ভাব প্রকাশ পাইল না, সে পূর্ব্ববৎ মৌন থাকিয়া কিছুক্ষণ পরে আবার একটি গান গাহিল। গান সমাপ্ত হইয়া গেলেও অনিতা হারমনিয়েমের নিকটেই বসিয়া রহিল।

সুধীর আর কোনও প্রশ্ন না পাইয়া শচীন্দ্রের কাণে কাণে বলিল,—তোমার বোন্‌কে এখন যেতে বল। চল আমরাও উঠি।

শচীন্দ্র অনিতাকে বলিল,—তুই এখন যা।

অনিতা চলিয়া গেলে রমেশ বাবুর স্ত্রী সুধীর, শচীন্দ্রের জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন, তাহারা জলযোগ করিয়া বাহির বাড়ী চলিয়া আসিল। অনিতা অন্য প্রকোষ্ঠে যাইয়া শয্যা গ্রহণ করিল, তাহার যেন নিজের জীবনের উপর একটা ঘৃণা জন্মিতে লাগিল, তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, আজ তাহাকে যেন একটি নাটকের অভিনেত্রীর খেলা খেলিতে হইল।

শচীন্দ্র বৈঠকখানায় আসিয়া রমেশ বাবুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল। সুধীর চলিয়া যাইবার সময় রমেশ বাবুর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিল না। তাহারা চলিয়া গেলে রমেশ বাবু বাড়ীর ভিতরে আসিলেন। তাহার স্ত্রীর সুধীরকে দেখিয়া বড়ই পছন্দ হইয়াছিল। তিনি হাসিতে হাসিতে রমেশ বাবুকে বলিলেন,—কেমন দেখ্‌লে? বেশ্ ছেলে, কেমন? চমৎকার, কেমন চেহারা? যেমনি রূপ তেমনি গুণ, এই ছেলে থুয়ে তুমি কেদারের কাছে মেয়ে দিতে চেয়েছিলে!

রমেশ বাবু মনে মনে সুধীরের উপর ভয়ানক চটিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া ফেলিলেন,—মহা বাঁদর, আমি বল্‌তে গেলে তার বাপের বয়সি, আমি প্রায় যাট হতে চলেছি, সে কালকের ছোকরা হয়ে আমার হাত ধরে এক সেকহ্যাণ্ড (করমর্দ্দন)। নেহাত বেয়াদব, আমার সামনে এসে ফরক্ ফরক্ করে চুরুট টান্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

রমেশ বাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন,—তুমি আবার নেহাৎ সেকেলে, তুমি কর রেলের কেরাণিগিরি, এখনকার দিনে এসবই আদবকায়দা।

রেখে দাও তোমার আদব কায়দা! আমি আর একেলে ছেলে দেখিনি? কেন তোমাদের শচীনও ত একেলে ছেলে, যেমন শান্ত তেমন বুদ্ধিমান। ওটা হচ্ছে একটা নেহাৎ ফক্করের হদ্দ। তুমি কার সঙ্গে কার তুলনা কর? কই কেদার আর কই সুধীর? একজন স্বর্গের দেবতা

আর একটা নরকের কীট, একজন অমূল্য রত্ন আর একটা রাস্তার কাচ। কেদারের সঙ্গে সুধীরের তুলনা করলেও সুধীরের মান বেড়ে যায়।

তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। তুমি যে কেদারের মধ্যে কি দেখ্লে আমি তাই বুঝি না। আমি কেদারের কাছে মেয়ে দেবই না, সুধীরের কাছেই দেবো।

রমেশ বাবু তর্কবিতর্ক একেবারেই ভালবাসিতেন না। তিনি স্বল্পভাষী, চুপ করিয়া রহিলেন।

সুধীর শচীন্দ্র ট্রামে উঠিলে শচীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন দেখ্লে?

সুধীর উত্তর করিল দেখ্লাম ত বেশ। চেহারাটা বাস্তবিকই লাভ্লি (Lovely), কিন্তু মুখে যেন হাসি নাই, বড়ই গম্ভীর, রীতিমত Philosopher, দার্শনিক গোছের। আর গানও গাইলো বেশ, কিন্তু তাতেও যেন প্রাণ নাই। গলাটা খুবই মিষ্টি, এমন গলা আমি জীবনে শুনিই নাই। তবে সব কথাতেই যেন প্রাণ-শূন্য। যা হোক্, মোটের উপর আমার পছন্দ হয়েছে। তুমি তোমার পিশিমার কাছে লিখে দিতে পার। তারপর, অনিতার যে দু একটু Defect (দোষ) আছে, তা আমি সারিয়ে নেব। আর এও অনিতার দোষ নয়, এ হচ্ছে তার বাপের দোষ। সে লোকটা নেহাৎ সেকেলের। আমি Hand shake (করমর্দ্দন) করলাম, আমার মুখের দিকে ফেল্ ফেল্ করে চেয়ে রইলো। মা বেশ intelligent (বুদ্ধিমতী), বাপটা নয়; সেটা, Idiotic (বলদ) গোছের। রমেশ বাবুর অনেক টাকা আছে, না? তোমার পিশিমার কাছে লিখে দিতে পার, আমি রাজি আছি। এই হলো মাঘ মাস, আস্ছে জ্যৈষ্ঠ মাসেই বিয়ে হবে।

শচীন্দ্র বলিল,—আচ্ছা আমি তাই লিখে দিবো।

উভয়ে ফরিদপুরে প্রত্যাগমন করিল।

(২৮)

শচীন্দ্র সুধীরের মত জানিয়া রমেশ বাবুর স্ত্রীর নিকট চিঠি লিখিল ও জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে বিবাহের দিন ঠিক করিবার জন্য লিখিয়া দিল। রমেশ বাবুর স্ত্রী সেই চিঠি পাইয়া অতীব আহ্লাদিত চিত্তে রমেশ বাবুর নিকট চিঠিখানা দিয়া বলিলেন,—যাক্, এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। এখন বিয়ের আয়োজনে প্রবৃত্ত হও।

সুধীর যে দিন অনিতাকে দেখিয়া গেল, সেই দিন হইতেই অনিতার শরীর খারাপ হইতে লাগিল, রোজ রাত্রিতে রাত্রিতে জ্বর হয়, দিনদিনই শরীর রোগা হইতে লাগিল, রীতিমত আহার নাই, মুখের হাসি যেন চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে; সদা হাস্য, সদা প্রফুল্লমাখা মুখ-খানা যেন সর্ব্বদাই একখণ্ড কালো মেঘে ঢাকা। রমেশ বাবুর স্ত্রী অনিতার শরীরের পরিবর্ত্তন দেখিয়াও তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিলেন না, তাহার সে দিকে বড় ভ্রূক্ষেপও নাই, তিনি অনিতা সুধীরের সম্বন্ধ সুস্থিরের দিকেই সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিলেন। রমেশ বাবু কিন্তু অনিতার শরীরের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহার স্ত্রীর কথায় উত্তর দিলেন, দিন ত ঠিক করব, ওদিকে মেয়ের দিকে চেয়ে দেখ্ছ? ওযে দিন দিনই রোগা হয়ে পড়্ছে, ওর যে মুখে আর হাসি নাই, শরীরের রক্তও যেন কমে আস্ছে। আগে ওর শরীরই ভাল হউক, তার পর দিন ঠিক।

ওসব কিছু নয়, ও সেরে যাবে। পরীক্ষার সময় খুব খেটেছিল কিনা, তাই একটু অসুখ হচ্ছে, ও আপনা আপনি সেরে যাবে।

রমেশ বাবু কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার স্ত্রী নিজেই দিন দেখাইবার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

অনিতার পরীক্ষার ফল বাহির হইল, অনিতা প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া কেদারের একবার ইচ্ছা হইল, অনিতাকে সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া আসে, কিন্তু আবার সেই মুহূর্ত্তেই রমেশ বাবুর স্ত্রীর সেই দিনকার ব্যবহারের কথা তাহার স্মরণ-পথে উদিত হওয়ায় তাহার প্রবল বাসনাকে দমন করিয়া রাখিল। সেই দিনের পর আজ পর্য্যন্ত তাহার প্রবল বাসনা স্বত্বেও রমেশ বাবুর বাসায় সে আর যায় নাই। রমেশ বাবুর স্ত্রীর সেই দিনকার ব্যবহারের পর হইতে কেদারেরও হাসি যেন কমিয়া আসিল, সেও যেন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে।

কেদারের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন ভুবনমোহিনীর চক্ষু এড়াইতে পারিল না। সে একদিন ধরিল,—কেদার দা, বলত, এর কারণ কি?

কেদার হাসিয়া বলিল,—কিসের কারণ?

তোমার এই ভাবের পরিবর্ত্তনের? গোপন করলে কি হবে, আমাদের চোখ এড়াতে পারবে না, আগের মত তোমার সেই স্ফুর্ত্তি নাই, সে হাসি নাই, এখনকার হাসি যেন শুষ্ক হাসি, আর সদাই যেন অন্যমনস্ক ভাব।

সত্যি মোহিনী, এর কারণ আছে, কারণ না থাকলে কি আমার মত লোকের স্ফুর্ত্তি নষ্ট করতে পারে?

আমি কি তা শুনতে পারি দাদা?

তুই পারবি না? তুই যে আমার মার পেটের বোন্!

ইহা বলিয়াই কেদার রমেশ বাবুর স্ত্রীর ব্যবহারের কথা বর্ণনা করিয়া বলিল,—তার ইচ্ছা, আমি আর সেখানে না যাই, কিন্তু জানিস্ ত মোহিনী

অনিতাকে না দেখ্‌লে আমার কত কষ্ট হয় অনিতাও আমাকে না দেখে থাক্‌তে পার্‌বে না, আমাকে না দেখ্‌লে অনিতার নিশ্চয়ই কোনও অসুখ কর্‌বে।

ভুবনমোহিনী কেদারের সরল প্রকৃতি, উদার হৃদয়, প্রশান্ত ভাব দেখিয়া মোহিত ও বিস্মিত হইয়া গেল,—হৃদয়ে কোনও কপটতা নাই, শিশুর ন্যায় মলিনতা হীন হৃদয়, শিশুর ন্যায়ই সরল-প্রকৃতি।

ভুবনমোহিনী কেদারকে বলিল,—তা রমেশ বাবুর স্ত্রী হয় ত দুদিন পরেই তোমাকে ডাকাবে।

না সে জন্য নয়, রমেশ বাবুর স্ত্রী কেন যে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর্‌লেন বুঝি না, আমি ত তাকে মার মতই জ্ঞান করি, যদি আমার কোনও দোষ হয়ে থাকে, ডেকে আমাকে শাসন করে দিলেই পার্‌তেন।

সম্ভবতঃ রমেশ বাবুর স্ত্রীর ইচ্ছা নয় অনিতাকে তোমার কাছে দেয়, তার সম্ভবতঃ অন্য জায়গায় বিয়ের কথা ঠিক হয়ে থাক্‌বে।

তা হতে পারে, সেই জন্যই বা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন কর্‌বেন? অন্য জায়গায় বিয়ে হলে হক্। আমি সে বিয়েতে যেয়ে আমোদ কর্‌তাম, আমি ত আর তাতে বাধা দিতাম না, বা আমার তাদের বাসায় গেলে তার অন্য জায়গায় বিয়েও ঠেকাত না।

তুমি যে রকম সরল-প্রকৃতির তুমি এর কারণ বুঝবে না, আমি এর কারণ বুঝেছি, তা তোমাকে বোঝাতে আমার ঘণ্টা খানেক লাগ্‌বে।

থাক্ বুঝ্‌বার দরকার নাই, তা নিয়ে সময় নষ্ট কর্‌বার বা মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজন নাই, আমার ঢের কাজ আছে।

ইহা বলিয়া কেদার অন্য কাজে বাসার বাহির হইয়া গেল। অনিতার অসুখ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বিবাহের আর দিন ঠিক হইতে পারিতেছে না। ডাক্তার দ্বারা তাহার রীতিমত চিকিৎসা হইতেছে, কিন্তু

তাহার অসুখ কোনও ডাক্তার নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না, শরীরও তাহার ভাল হইতেছে না, দিন দিনই সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

ক্রমে ম্যাট্রিক পরীক্ষার বৃত্তির ফল বাহির হইল। অনিতা পনর টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। রমেশ বাবু অনিতাকে এ শুভ সংবাদ দিয়া পত্রিকাখানা অনিতার হাতে দিলেন। অনিতা কাগজখানা পড়িতে লাগিল। রমেশ বাবু লক্ষ্য করিলেন, এই শুভ সংবাদ পাইয়াও অনিতার মুখের ভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হইল না, রমেশ বাবুকে কিছুই বলিল না। রমেশ বাবু অনিতার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন।

রমেশ বাবু চলিয়া গেলে অনিতা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিল। মনে মনে বলিল, এ জীবনে বুঝি গুরুদক্ষিণা দেওয়া আর হলো না।

কেদার আফিসে যাইয়া শুনিতে পাইল, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার বৃত্তির ফল বাহির হইয়াছে। সে তখনই যাইয়া গেজেট দেখিল, অনিতা পনর টাকা বৃত্তি পাইয়াছে, তাহা দেখিয়া সে যেন আর তাহার আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তাহার এত আনন্দ দেখিয়া তাহার আফিসের কয়েকজন বন্ধু তাহাকে ধরিল, কি কেদার বাবু, আজ যে দেখ্ছি স্ফুর্ত্তি আর ধরে না!

কেদার তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আজ খুব আনন্দই হয়েছে, আমার এক বোন্ আবার ছাত্রীও ম্যাট্রিকে পনর টাকা বৃত্তি পেয়েছে।" ইহা বলিয়াই সে গেজেট আনিয়া অনিতা সুন্দরী দেবীর নাম পনর টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রীর ঘরে তাহাদিগকে দেখাইয়া দিল।

তাহার বন্ধুরা বলিল,—তা হলে আজ আমাদের এখনিই খাওয়িয়ে দিন।

কেদার বলিল,—চলুন না কি খাবেন?

সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা খাবারের দোকানে যাইয়া সকলে মিলিয়া

কেদারের দশ মুদ্রা ধ্বংশ করিল। তাহারা আহার করিবার সময় কেদার বলিল,—আজ আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন, আপনারা যা পারেন তাই খান, টাকা আমি দিব। তাহারাও উদর পূরণ করিয়া খাবার খাইল।

আফিসের কাজ আজ শীঘ্র শীঘ্র সমাধা করিয়া অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, সে অনিতাকে তাহার সন্তোষ জ্ঞাপনার্থে রমেশ বাবুর বাড়ীর দিকে ছুটিল। রমেশ বাবুর স্ত্রীর পূর্ব্বেকার ব্যবহার, বা তাহার কেদারের সেখানে যাইবার অনিচ্ছার ভাব তাহার মনে একবারও জাগিল না। তাহার কেবল অনিতার কথাই মনে হইতে লাগিল। সে ট্রাম হইতে নামিয়া রমেশ বাবুর বাসায় যেন ছুটিয়া যাইতে লাগিল। রমেশ বাবুর বাসায় ঢুকিয়াই দেখে তাহার পুরাতন ঝি উপরকার সিঁড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই কেদার বলিল,—অনিতা বুঝি উপরে? বলিয়াই সে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। দুই এক সিঁড়ি উঠিয়াছে, এমন সময় ঝি বলিল,—আপনি উপরে যাবেন না, মা মানা করেছেন। অনিতা দিদির সঙ্গে আপনার দেখা হবে না, তার বিয়ে ঠিক হয়েছে।

কেদার ঐ কথা শুনিয়াই সেইখানে থমকিয়া দাড়াইল, কিছুক্ষণ নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আবার সিঁড়ি নামিয়া আসিল, এক পা দুই পা করিয়া রমেশ বাবুর বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। এতক্ষণে রমেশ বাবুর স্ত্রীর পূর্ব্বেকার ব্যবহার তাহার স্মরণ হইল। তখন তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহা হইলে বুঝি তাহার না আসাই ভাল ছিল। কিন্তু অনিতার অন্যত্র বিবাহ হইলেও তাহার সহিত এবম্প্রকার ব্যবহারের কোনও কারণ কেদার নির্দ্দেশ করিতে পারিল না অনিতার সহিত তাহার দেখা হইল না, তাহার এমন আনন্দটা তাহার নিকট প্রকাশ করিতে পারিল না মনে করিয়া কেদারের মনে বড়ই কষ্ট হইল। সে বিষণ্ণ বদনে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

অনিতা কেদারের গলার স্বর শুনিয়াই তাহার বিছানা পরিত্যাগ করিয়া জানালার নিকট আসিয়া কেদারকে দেখিতে লাগিল, তাহার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ঝি কেদারকে বলিয়া উঠিল, আপনি উপরে যাবেন না, মা মানা করেছেন। অনিতা দেখিল, কেদার কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল। অনিতার যেন মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে জানালার সিক ধরিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। এ ভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া পুনর্ব্বার যাইয়া বিছানায় শয়ন করিল।

কেদার বাড়ীতে ঢুকিতেই ভুবনমোহিনী তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, আজ যেন কি একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে। কেদার ত শত বিপদেও অটল, আজ ত সে বড়ই বিমর্ষ, এমন বিমর্ষ ভাব ত সে কোন দিনও দেখে নাই।

ভুবনমোহিনী কেদারের হাত পা ধুইবার জল আনিয়া দিল। কেদার হাত পা ধুইয়া জল খাইলে ভুবনমোহিনী কেদারের অতি নিকটে আসিয়া গায় হাত বুলাইয়া অতি সস্নেহে বলিল, দাদা, কি হয়েছে বল ত?

ভুবনমোহিনীর সস্নেহ আহ্বানেই যেন কেদারের হৃদয়ের গুরু ভার অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া গেল। সে হাসিয়া বলিল, "এমন কিছু না বোন্!" ইহা বলিয়া সে অনিতার বৃত্তি পাইবার কথা, আফিসে দশ টাকা ব্যয় করিয়া বন্ধুদিগকে খাওয়াইবার কথা, অনিতাদের বাসায় যাইয়া ঝির কথা শুনিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসার কথা একে একে বিবৃত করিয়া বলিল, "তা আমারই অন্যায় হয়েছে বোধ হয়, অনিতার অন্য জায়গায় বিয়ের কথা ঠিক হলে, আমার আর অনিতার সঙ্গে দেখা করা অন্যায়ও হতে পারে, এটা বর পক্ষরা পছন্দ নাও করতে পারে। আমি আর সেখানে যাব না, আমারই অন্যায় হয়েছে বোধ হয়।"

কেদার এমন ভাবে কথাগুলি বলিয়া গেল যেন তাহার জীবনে কোনও

বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু ভুবনমোহিনী জানিত, অনিতার বিচ্ছেদ কেদারের পক্ষে কতদূর মর্ম্মবিদারক, অন্য লোক হইলে ইহাতে সম্ভব তাহার জীবন মরণ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত।

কেদার একবার মনে করিয়াছিল, অনিতার নিকট চিঠি লিখিয়া তাহার হৃদয়ের আনন্দ অনিতাকে জ্ঞাপন করিবে, আবার তাহার মনে হইল, অনিতার যখন অন্যত্র বিবাহ সুস্থির হইয়াছে, তখন তাহার পক্ষে চিঠি লেখাও অন্যায় হইতে পারে। সুতরাং অনিতার নিকট চিঠি লিখিবার বাসনাও সে ত্যাগ করিল। কেদার হাসি মুখে বর্ত্তমান অবস্থাকে বরণ করিয়া নিল, সে নিয়মমত আফিসের কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

(২৯)

ভুবনমোহিনী প্রায় ছয় মাস হইল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে একটি টাকাও উপার্জ্জন করিতে পারে নাই। ক্রমেই যেন তাহার একটা হতাশের ভাব আসিতে লাগিল। এক এক বার তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার বুঝি ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষাই বৃথা হইল। এতদিন চলিয়া গেল, কই একটি টাকাও পাইলাম না, এই বিশাল সহরে তাহাকে কে চেনে, কে তাহাকে ডাকিবে? আবার মনে হইত, এত বড় সহরে এত অল্প দিনে কি তাহার উপার্জ্জন করা সম্ভবপর? তখন তাহার আবার একটু ভরসা হইত। আবার যখন সে শুনিত, ধাত্রীর মধ্যে এমন লোকও আছে যে মাসে ৩।৪ শত টাকা পায়, তখন তাহার মনে হইত, এমন দিন কি তাহার কখনও আসিবে? যদি ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন, তবে কেদার দাদাকে বিবাহ করাইয়া অজিতকে নিয়া সুখে থাকিতে পারিবে। আবার সেই মুহূর্ত্তেই তাহার স্বামীর কথা মনে হইত, তখন স্বামীর চিন্তায় সে অভিভূতা হইয়া পড়িত। না জানি তিনি এখন কি ভাবে আছেন, না জানি তিনি আর্থিক কষ্টে কত জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছেন, যে টাকা তিনি পাইয়াছিলেন তাহা তাহার কাছে আর কত-দিন? শারীরিক তিনি কুশল আছেন ত? এইরূপ চিন্তা, আশা, নৈরাশ্যের মধ্যে ভুবনমোহিনীর দিন যাইতে লাগিল।

কেদার আজ আফিসে যাইয়া দেখিল, আফিসে হুলুস্থুল ব্যপার, কি যেন একটা ভীষণ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সকলেই হৈ চৈ লাগাইয়া দিয়াছে! স্থানে স্থানে বসিয়া কয়েকজন মিলিয়া জটলা পাকাইতেছে। কেদার ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অবশেষে কেদার এক সহকর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল,—মশায়, কি হয়েছে? এত হৈ চৈ কেন?

তাহারা উত্তর করিল,—মশায় ত বেশ লোক দেখ্‌ছি, এখনও শোনেন নি? Strike, Strike ধর্ম্মঘট, ধর্ম্মঘট)।

কেদার জিজ্ঞাসা করিল,—কি ব্যাপারটা খুলেই বলুন না।

তাহারা উত্তর করিল, আসানসোলে আমাদের রেলওয়ে বিভাগের একটি বড় কর্ম্মচারীকে বিনাদোষে অন্যায় রকমে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই আসানসোলের রেলওয়ে কর্ম্মচারিরা ধর্ম্মঘট কর্‌তে, তাদের সঙ্গে যোগদান করবার জন্য তারা আমাদের কাছে টেলিগ্রাম করেছে, লোকও পাঠিয়েছে। তাই আফিসে আজ এত হুলুস্থুল।

"ও তাই!" ইহা বলিয়াই কেদার তাহার কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। আফিসে বহু কর্ম্মচারিই সারাদিন কেবল জটলা করিয়া কাটাইতে লাগিল, এখন কি করা উচিত। কেদার নিজ মনে কাজ করিতে লাগিল। বেলা প্রায় চার ঘটিকা, তখন যোগজীবন বাবু, নিরঞ্জন বাবু, যোগেন বাবু, রাম বাবু, কেদারের নিকট আসিয়া বলিলেন,—আপনি ত বেশ মশায়, আপনি সেই দশটা থেকে কাজই কর্‌ছেন?

কেদার উত্তর করিল, কাজ কর্‌ব না কেন?

নিরঞ্জন বাবু বলিলেন,—এই শালাদের আবার কাজ কর্‌তে হয়? নেহাৎ বেইমান, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের কাজ করুন, দয়া নাই, মায়া নাই, মান অপমান জ্ঞান নাই, আমাদের কুকুর বিড়ালের চেয়েও

অধম জ্ঞান করে। কথায় কথায় ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেওয়া। উঠে চলে আসুন, কিসের ওদের কাজ করা।

কেদার বলিল,—আগে সবটা শুনে নেই, তারপর চিন্তা করে যা হয় করব।

যোগজীবন বাবু বলিলেন,—আবার চিন্তার বিষয় এর মধ্যে কি হলো? সব ত শুনেইছেন, এবার আমাদের অস্তিত্ব শালাদের বুঝিয়ে দিব, দেখিয়ে দেব, আমরা না হলে শালাদের কোম্পানি কতদিন চলে। তা আর চালাতে হয় না, দুদিনেই কোম্পানি কুপোকাৎ হবে।

নিরঞ্জন বাবু বলিলেন,—শালাদের দেখিয়ে দিব আমাদের সঙ্গে বদমাই সিকরা কেমন। আমরা কিছু বলি না বলে শালারা আমাদের মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। কি কাজ করবেন, উঠে আসুন।

কেদার তাহাদের কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—দেখুন, এমনি করলে ত কাজ হবে না। আপনারা সকলে একত্র হয়ে ভাল মন্দ সব বিবেচনা করে যা করতে হয় করুন। তবে এটা আমি বলতে পারি, আপনাদের সকলের যা মত হবে, তা কল্যাণকরই হউক আর অকল্যাণকরই হউক আমি তাতে আছি। যে পর্য্যন্ত আপনারা সকলে একমত হয়ে কাজ না করেন, সেই পর্য্যন্ত আমি আফিসের কাজ করব, আর যতদিন পর্য্যন্ত কাজ করব তা মনোযোগ দিয়েই করব। আর যখন কাজ বন্ধ করব, তখন ভাল রকম করেই বন্ধ করব, যে পর্য্যন্ত আমাদের মানসম্ভ্রম উদ্ধার না হয় সে পর্য্যন্ত কাজ করব না।

নিরঞ্জন বাবু বলিলেন,—আরে মশায়, খুব হয়েছে, রেখে দিন এখন ওদের কাজ। আজ থেকেই আমরা ধর্ম্মঘট চালাব। অত বিবেচনা করে কাজ চলে না, আর অত মতামত নিয়ে ওকাজ হয় না, মতামত জিজ্ঞাসা করতে গেলেই নানা মুনির নানা মত হবে। আমরা ধর্ম্মঘট চালাব, সৎ

কাজ করব, যাদের বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, যাঁরা প্রকৃত মানুষ তারা এতে আপনি এসে যোগদান করবে, আর যারা আসবে না, তারা জানবেন মত প্রকাশ করেও পিছিয়ে পড়বে।

কেদার বলিল,—তা হলে কি আপনারা সকলের মতামত জিজ্ঞাসা না করেই ধর্ম্মঘট চালিয়ে দিবেন?

নিরঞ্জন বাবু বলিলেন, না, তা করবনা। অবশ্যি, আজ বিকেলে একটা সভা হবে স্থির করেছি, সেই সভাতে সকলকে আহ্বান করে আমরা প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করব, তারপর ধর্ম্মঘট চালাব। আপনার ধর্ম্মঘটে মত আছে ত?

কেদার বলিল, আমি এখন ও আমার মত ঠিক বলতে পারি না, আমি এ বিষয় এখন পর্য্যন্ত চিন্তাই কার নাই।

যোগজীবন বাবু হাসিয়া বলিলেন, আপনি যে মশায় বড়ই চিন্তাশীল হয়ে পড়লেন? এ Noble Cause (সাধু কাজ) এ আবার চিন্তা কি? বেশী চিন্তা করলে সব কাজ পণ্ড হয়ে যায়। এখনই বের হয়ে পড়ুন।

যোগেন বাবু বলিলেন, আমরা আমাদের মত ঠিক করে ফেলেছি, না খেয়ে মরি তাও স্বীকার, তবুও এর প্রতীকার চাই। হেস্ত ন্যাস্ত না করে আর ছাড়ছি না। আসানসোলের কর্ম্মচারীর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে আবার কাজে নেবে তবে ছাড়ব, আর আমাদের প্রকৃত Rights (সত্য) কতদূর আছে তাও এবার ঠিক করে নিতে হবে, আর পারা যায় না, একেবারে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। কথায় কথায় ঘার ধরে তাড়ান, আমরা যেন কেউ নই। ওদের রাজত্ব বলে ওরা যা তা করবে? আমরা যদি ওদের রাজত্বে সহায়তা না করি তবে ওদের প্রভুত্ব কত দিন? আর তাদের কোম্পানি চালিয়ে রেখেছে কে? সাহেব আর কজন? আমরা যদি মানুষ হয়ে একবার পায় দাঁড়াতে পারি তবে এ প্রতি পদে পদে

লাঞ্ছনার অবসান হবে। যদি এর প্রতিকার না হয় তবে এই রেলওয়ে বিভাগে এই নমস্কার। ইহা বলিয়া তিনি রেল আফিসের দিকে মাথা ফিরাইয়া নমস্কার করিলেন।

রাম বাবু বলিলেন, আচ্ছা আপনি চিন্তা করুন, বিকেলে মনুমেণ্টের কাছে সভা হবে, আপনি যাবেন।

কেদার বলিল, আচ্ছা যাব।

কেদার আফিসের নিয়মানুসারে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া ট্রামে উঠিয়া গড়ের মাঠের দিকে রওনা হইল। মনুমেণ্টের নিকট যাইয়া দেখে তাহাদের আফিসের প্রায় বিভাগের প্রায় সকল লোকই আসিয়াছে। তাহার সেখানে যাইবার কিছুক্ষণ বাদেই সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। এক বিভাগের বড় বাবু নগেন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সর্ব্ব প্রথমেই নিরঞ্জন বাবু উঠিয়া আসানসোলের কর্ম্মচারীর উপর কি ভীষণ অত্যাচার হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিলেন, তৎপরে ই, আই রেলওয়ে দেশীয় কর্ম্মচারাদের কার্য্যে কি অসুবিধা, অভিযোগ, তাহাদের বেতন ফিরিঙ্গি কিংবা সাহেবের তুলনায় কত কম, তাহাদের চাকরি স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কি অনিশ্চয়তা, আরও অন্যান্য বিষয়ে নানা অসুবিধার কথা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আমরা এই সব বিষয়ে সংশোধন চাই। তাই আমার প্রস্তাব আমাদের যতগুলা অভিযোগ কিংবা অসুবিধা আছে তা লিপিবদ্ধ করে এজেণ্টের নিকট পাঠিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় করে দেব, এ সময়ের মধ্যে এজেণ্ট যদি আমাদের দাবী পূরণ না করেন তবে সেই দিন থেকে আমরা ধর্ম্মঘট করব, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা আর কাজে যাব না, না খেয়ে মরি তাও স্বীকার।

যোগেন বাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সেই সভাতে অনেকেই নিরঞ্জন বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সকলেরই যেন খুব উত্তেজিত ভাব।

কেদার তখন উঠিয়া বলিল, আমার এবিষয়ে একটু বলবার আছে। আপনাদের সকলের যদি নিরঞ্জন বাবুর প্রস্তাব গ্রহণ করতে মত হয় তবে করতে পারেন, আমার কিন্তু মনে হয় এ বিষয়টা আর একটু চিন্তা করা উচিত। আমার কিন্তু মনে হয় আমরা ধর্ম্মঘট রাখতে পারব না, কারণ তার প্রধান অন্তরায়, আমাদের দারিদ্র্য, প্রতিদিন আহারের অভাব। নিত্য অনাটনের মধ্যে কি ধর্ম্মঘট সম্ভব ? স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও সে দিন বলেছিলেন, ধর্ম্মঘটটা আমাদের দেশের ভদ্রলোকদের মধ্যে সম্ভব নয়, তা আমাদের দেশের মুটে মজুরদের মধ্যেই কেবল সম্ভব। তার কয়েকটা কারণ আছে। প্রথম কারণ, তাদের অভাব কম, দ্বিতীয় কারণ তাদের কাজের অভাব হয় না, যে জায়গায় তারা কাজ করে সেই জায়গা ছেড়ে গেলে অনায়াসেই তারা অন্য জায়গায় কাজ পায়, তৃতীয় কারণ তাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রী সকলেই কাজ করে। আর আমাদের মধ্যে চাকরি ছাড়া উপায় নাই অথচ চাকরি পাওয়াও দুষ্কর, আমাদের কারোও ঘরে দুদিন বসে খাওয়ার সংস্থান নাই, আবার সমস্ত দায়িত্বও কেবল পুরুষের উপর, স্ত্রী ত আধা পয়সাও অর্থ সাহায্যের উপযোগী নয়, তারা আছে কেবল পুরুষদিকের মুখের দিকে হা করে চেয়ে। আমাদের আরও একটা দোষ আছে; মনে কিছু করবেন না, আমাদের সাধুতা ও একতারও অভাব, আমাদের হৃদয় স্বার্থপরতায় ভরা। এই সব কারণে স্বামীজি ধর্ম্মঘটটা ভদ্রলোকদের মধ্যে নেহাত না পছন্দ করেছেন, আমার বিশ্বাস স্বামীজিই ঠিক বলেছেন। আমার মনে হয়, ধর্ম্মঘট করবার আগে সব দিক বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা উচিত। ধর্ম্মঘট করে যদি তা না রাখতে পেরে তাদের পায় ধরে আবার কাজে ভর্ত্তি হতে হয় তার চেয়ে ধর্ম্মঘট না করাই ভাল। ধর্ম্মঘটের ভিত্তিই হচ্ছে, Longest purse will win (যে পক্ষের টাকা বেশী সে পক্ষই জিদবে)। আমাদের টাকার জোর

নাই, আমরা ধর্ম্মঘট রাখব কি করে? আমার মতে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করে ধর্ম্মঘট না করাই উচিত। আমরা বড়ই Senti menal (হুজুগ প্রিয়), আমাদের doggedness (স্থিরতা) নাই। আমরা সব কাজই প্রায় হুজুগের উপর করি, কিন্তু তা বেশী দিন ধরে রাখতে পারি না, তাই আমাদের এত অধঃপতন। তবে যদি আপনারা সব বিষয়ে বিবেচনা করে ধর্ম্মঘট করেন তাতে আমি আছি।

কেদারের কথা শুনিয়া অবিনাশ বাবু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, মশায় এজেণ্টের কাছে বুঝি খুব আশা পেয়েছেন? অল্প সময়ের মধ্যে খুব প্রমোশন পেয়ে লোভ বুঝি খুব বেড়ে গেছে। মশায়, ওদের কাছে প্রমোশন পেতেও বেশী দিন নয়, আবার ঘার ধরে তাড়িত হতেও বেশী দিন লাগে না। মশায়, এখন বক্তৃতা রাখুন, একবার মানুষ হন, কতকাল আর ভেড়ার মত থাকবেন? কেবল হট্ হট্ করে চালিয়ে নিবে। ভেড়াগুলোরও আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, আমাদের তা নাই! ভেড়াগুলোকে গুঁতা মারলে মাঝে মাঝে তারাও মাথা বেঁকিয়ে তেড়ে আসে, আমরা কি একটু মাথাও বেঁকাতে পারব না?

কেদার বলিল,—আমরা যে মানুষ না, এই ত দুঃখ, আমরা যে পশুর চেয়েও অধম, তা না হলে কি আজ আমাদের এই দশা! আমাদের দেশেই আমরা উপবাসী! আমাদের দেশে না আছে কি? সবই আছে, অথচ আমরা শুধু চাষের ভাগী— গ্রাসের ভাগী নই।

নিরঞ্জন বাবু বলিয়া উঠিলেন,—কেদার বাবু, বুঝেছি, আপনার মত বুঝেছি, আর আপনার কিছু বলতে হবে না। আপনি কাজ করতে থাকুন, সম্ভবতঃ আপনার মত খয়েরখা আমাদের মধ্যে বেশী নাই। আপনার মত লোককে আমরা বাদ দিয়েই ধর্ম্মঘট করব।

অমনি চারিদিক হইতে চীৎকারধ্বনি উঠিল,—Shame Kedar

Babu, Shame Kedar Babu (ঘৃনিত কেদার বাবু, ঘৃণিত কেদার বাবু)

কেদার তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, আপনারা আবারও বিশেষ চিন্তা করে দেখুন, যদি বোঝেন শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট রাখ্‌তে পার্‌বেন তবে করুন, আর যদি তা না পারেন তবে কর্‌বেন না। ধর্ম্মঘট করে যেন শেষকালে পা ধরে আবার চাকরিতে যেতে না হয়!

অমনি চারিদিক হইতে ধ্বনি উঠিল, আমরা ধর্ম্মঘট কর্‌ব, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের অভিযোগ দূর না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মঘট বজায় থাক্‌বে।

শ্রমজীবিদের নেতা ওসমানগণি ও রামভজন সিং সেই সভায় ছিল। তাহারা তখন বলিল,—বাবু, আপনারা যা বলেছেন তা ঠিক, আমাদের অবস্থা একটু ভাল করা উচিত, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও পেট পোষাতে পারি না। কিন্তু এক কথা, যদি কাজ ছেড়ে দিতে হয়, তবে কিন্তু আমাদের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত আর কাজে আস্‌তে পার্‌বেন না।

নিরঞ্জন বাবু বলিলেন,—দেখ্‌লেন কেদার বাবু, সামান্য মুটেমজুরদের মধ্যে যে আত্মসন্মান জ্ঞান আছে, আপনাদের মধ্যে তাও নাই। এর চেয়ে ঘৃণার বিষয়, পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে।

আবার চারিদিক হইতে ধ্বনি উঠিল, Shame Kedar Babu, Shame Shame (ঘৃণিত কেদার বাবু)।

কেদার আর কিছু উচ্চবাচ্য না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। সেই সভায় তখন নিরঞ্জন বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে যোগজীবন বাবু প্রস্তাব করিলেন,—আমাদের ধর্ম্মঘট করা ত ঠিক হলো, এখন কি কি অভিযোগ আমাদের লিপিবদ্ধ করতে হবে, তা

স্থির করার জন্য আমাদের মধ্য থেকে আপনারা তিন জন লোককে মনোনীত করুন, তারা তা লিপিবদ্ধ করে এজেণ্টের নিকট পাঠিয়ে দেবে।

রাম বাবু সেই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সেই প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইল।

অবিনাশ বাবু তখন প্রস্তাব করিলেন,—নিরঞ্জন বাবু, যোগজীবন বাবু, যোগেন বাবুর উপর আমাদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার ভার দেওয়া হউক।

এই প্রস্তাব সমর্থিত হইলে তাহা সভায় গৃহীত হইল। তৎপরে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

সেই দিন কেদারের বাড়ীতে আসিতে রাত্রি হইল। ভুবনমোহিনী কেদারের বাড়ীতে আসিবার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে তাহার নিকট তাহাদের সভার কথা উল্লেখ করিল।

ভুবনমোহিনী তাহা শুনিয়া বলিল,—তুমি চাকরি ছাড়ান দিলে আমাদের চলবে কি করে?

কেদার বলিল,—আমার কাছে যা আছে তাতে আমাদের দেড় মাস-খানেক চল্‌বে, তারপরে উপবাস, যদি ইতিমধ্যে তুই টাকা না পাস্‌।

আমি ত ঢের টাকাই উপার্জ্জন করছি, আমার আবার এমন কপাল।

কপালের কথা কেউ বল্‌তে পারে না লো দিদি। সকলের মত হলে উপোস কর্‌লেও তাদের সঙ্গে থাক্‌তে হবে। আর এত আর আমার তোমার কথা নয় এযে মনুষ্যত্বের কথা, এযে জাতীয়তার কথা। জাতীয়তার হিসাবের দিকে চেয়ে কাজ কর্‌তে হবে, জাতীয় সম্মান নিজের সম্মানের চেয়ে বড়, জাতীয় সম্মান রাখ্‌তে হলে মৃত্যুকেও বরণ কর্‌তে হয়; তা যারা পেরেছে তারাই আজ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ, তারাই আজ পৃথিবীতে আধিপত্য করছে। আর এটা জানিস্‌ দিদি, এই পতিত দেশে

কাজ কর্‌তে গেলে, তার প্রতি পদে পদে বিপদ, আরাম কেদারায় শয়ন করে কেউ পতিত দেশের সেবা কর্‌তে পারে না। যে জাতীয়তার জন্য, যে দেশের জন্য কাজ কর্‌তে যাবে, তার মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্‌তে প্রস্তুত থেকে কাজ কর্‌তে হবে।

ধর্ম্মঘট করা তোমাদের ঠিক হয়ে গেছে ?

একরকম।

"দেখো কি হয়।" ইহা বলিয়া ভুবনমোহিনী বলিল, "রাত অনেক হয়ে গেছে, এখন হাত পা ধুয়ে খেতে বসো। ভবিষ্যতে যা হবার তা হবে।"

উক্ত সভার পরদিবস অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিয়া এজেণ্ট সাহেবের নিকট পাঠান হইল। অভিযোগের প্রতিকার করিবার জন্য সাত দিবস সময় দেওয়া হইল।

সাত দিবসের মধ্যে এজেণ্ট সাহেব কোনও উত্তর দিলেন না। তখন আফিসের কর্ম্মচারীদের মধ্যে আবার জল্পনা হইতে লাগিল, এখন কি করা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মঘট করা উচিত কিনা। তাহাদের মতভেদ হইল, কেহ বলিল করা উচিত, কেহ বলিল ধর্ম্মঘট করা উচিত নয়; ইহা নিয়া জটলা চলিতে লাগিল। কেদার কাজ করিতে বসিয়াছিল, যেই শুনিল, সাত দিবস গতকল্য উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এজেণ্ট সাহেব উত্তর দেন নাই, সে সেই মুহূর্ত্তে কাহারও সহিত আলাপ না করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল। তাহার দৃষ্টান্তে পূর্ব্বের বাদানুবাদ বন্ধ হইয়া গেল, তাহাদের প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে আফিস ঘর প্রায় খালি হইয়া গেল।

ই, আই, রেলওয়ের ধর্ম্মঘট চলিতে লাগিল। রাস্তা ঘাটে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, অমনি নানা পত্রিকায় এই কথা বাহির হইয়া গেল। পত্রিকা বিক্রির ধূম পড়িয়া গেল।

(৩০)

অনিতার শরীর যেন আর কিছুতেই ভাল হইতেছে না, মুখের লাবণ্য যেন দিন দিনই কমিয়া আসিতে লাগিল। তাহার জ্বর যেন লাগিয়াই আছে, যদি বা দুদিন ভাল থাকে, আবার অসুখ হয়। ডাক্তার কবিরাজ আর বাদ রহিল না, কিন্তু অনিতার রোগের কোনও উপশম হইল না। দিন দিনই যেন সে ক্ষীণা হইয়া আসিতে লাগিল। রমেশ বাবু ও তাহার স্ত্রী অনিতার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কি যে করিবেন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কেন যে তাহার এই অসুখ করিল তাহাও অনুমান করিতে পরিলেন না।

কলেজ খুলিলে অনিতা বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হইল। রমেশ বাবু বলিয়াছিলেন, আর পড়ে তোর কাজ নেই, তোর শরীর যে খারাপ তাতে না পড়াই ভাল।

অনিতা বলিল,—না বাবা, বাড়ীতে সারাদিন একা বসে কি করব। পড়ার মধ্যে থাক্‌লে দিনটা একরকম কেটে যায়, তাতে আমার শরীর ভাল হবে।

অনিতা কলেজে ভর্ত্তি হইল সত্য, কিন্তু তাহার লেখাপড়া এক রকম হয়ই না, যদি বা একদিন কলেজে যায়, আবার পরদিন জ্বর আসে। দিন দিন তাহার আহারও কমিয়া আসিতে লাগিল। এম্‌নি ভাবে অনিতার দিন যাইতে লাগিল।

ই, আই রেলওয়ের ধর্ম্মঘটের জন্য রমেশ বাবুর এখন আর আফিসে

যাইতে হয় না। ধর্ম্মঘটের পরে মাসেক কাল চলিয়া গেল, রেল কোম্পানির ভয়ানক লোকসান হইতে লাগিল, অনেক ট্রেইন বন্ধ হইয়া গেল। দেশীয় ড্রাইভার নাই, দেশীয় গার্ড নাই, দেশীয় ফায়ারম্যান নাই, কুলি মজুর শ্রমজীবীরা এক রকম নাই, এমন ভাবে ট্রেইন কেমন করিয়া চলে? ওদিকে আফিসের কর্ম্মচারী নাই, ষ্টেসনে আর কুলি কুলি ধ্বনি নাই, ট্রেইন চলিবার হুড়মুড় শব্দ নাই, সমস্ত আফিস ঘর, ষ্টেসন মনে হয় এক বিরাট শ্মশান পুরী।

ওদিকে লোকেরও ভয়ানক অসুবিধা হইতে লাগিল, পত্রিকায় ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে লম্বা লম্বা প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। এজেণ্ট সাহেব ও ধর্ম্মঘট কারীদের মধ্যে নানা প্রকার বৈঠক বসিতে লাগিল, কিন্তু কোন পক্ষই তাহার জেদ এক চুল ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। পুরা দমে ধর্ম্মঘট চলিতে লাগিল।

যখন দেখিতে পাইল আপোষ মীমাংসার কোনও সম্ভাবনা নাই, তখন রেল কর্ত্তৃপক্ষ ধর্ম্মঘটকারীদের ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও কোনও ফল হইল না, ধর্ম্মঘট পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

এজেণ্ট সাহেব তখন মাথায় আর এক ফন্দি আটিলেন, তিনি তখন মনে করিলেন, প্রলোভনে কোনও ফল হয় কি না দেখা যাউক। তিনি ঠিক করিলেন, নেতাদের মধ্যে যদি কাহাকেও হাত করা যায়, তবে ধর্ম্মঘট সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইবে। ইহা মনে মনে সংকল্প করিয়া তিনি নিরঞ্জন বাবুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আপনারা কেন এই ধর্ম্মঘট চালাচ্ছেন? অনর্থক আমাদেরও লোকসান আপনারাও মারা পড়্‌ছেন। আমার মতে এই ধর্ম্মঘটটা অবিলম্বে শেষ হলে উভয়েরই মঙ্গল। আপনি আগে বুঝি একশ টাকা মাইনে পেতেন, আপনি কাজে আসুন, আপনার মাইনে দেড়শ করে হবে। আর আপনারা বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, এ ধর্ম্মঘটে ফল

কি। আপনারা কোম্পানির সাথে আর কতদিন লড়াই করে পারবেন? আমি জানি আপনারা আবার কাজে যোগদান করবেন, তবে লাভের মধ্যে আপনারা এখন কাজে যোগদান না করলে আপনাদের সার্ভিসে ব্রেক্ (service এ break) পড়বে, বোনাস্, প্রভিডেণ্ড ফণ্ড হারাবেন। আপনি সকলকে বুঝিয়ে বলুন, এ ধর্ম্মঘটে কোনও লাভ নাই। আপনারা কাজে যোগদান করুন, আপনাদের অভিযোগ দূর করতে আমরা অবশ্য চেষ্টা করব। আর আসানসোলের বরখাস্ত কর্ম্মচারী যদি একটু ক্ষমা চায় তবে তাকেও আমরা আবার কাজে নিতে পারি।”

হঠাৎ এক শত টাকা হইতে একেবারে দেড়শত টাকার লোভ পাইয়া নিরঞ্জন বাবুর মনটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। এজেণ্টের সেই কথাটুকু তাহার কর্ণে প্রবেশ হওয়া মাত্রই তাহার মন এজেণ্টের অন্যান্য বাজে কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত রহিল না। তিনি কেবলই দেড় শত টাকার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এজেণ্ট সাহেব তাহাকে মৌন দেখিয়া ভাবিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে। এজেণ্ট সাহেব প্রকৃত পক্ষেই সৎলোক ও সহানুভূতিশীল। তাহার একান্ত ইচ্ছা, উভয় পক্ষই কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া এই ধর্ম্মঘটটা অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া পূর্ব্ববৎ রীতিমত কাজ আরম্ভ করুক। প্রতিদিন যে কত লক্ষ টাকা কোম্পানির লোকসান হইতেছে তিনি তাহা বিবেচনা করিলেন। তিনি খবর পাইয়াছেন, নিরঞ্জন বাবু ধর্ম্মঘট কারীদের একজন প্রধান নেতা, তিনিই ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি সেই জন্য নিরঞ্জন বাবুকেই সর্ব্বপ্রথমে প্রলোভন দেখাইয়া হাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

এজেণ্ট সাহেব আবার নিরঞ্জন বাবুকে বলিতে লাগিলেন, দেখুন, এই দুর্দ্দিনে ধর্ম্মঘটা কোনও পক্ষেরই মঙ্গল জনক নয়। আমাদের রোজ

রোজ কত লক্ষ টাকা লোকসান হচ্ছে দেখতে ত পাচ্ছেন, লোকের অসুবিধার ত অন্তই নাই, আপনাদেরও সর্ব্বনাশ। আপনারা ছেলে পিলে নিয়ে কি খাবেন? আমি জানি, আপনাদের চাকরি গত প্রাণ, আমরা এও জানি, আপনাদের জিদ বেশী দিন বজায় থাকবে না, পেটে হাত পড়লে আপনারা আপনিই বাঁকে আসবেন। কোম্পানির কি, না হয় বহু টাকা লোকসান হবে, তারা ত আর ভাতে মরবেনা। আপনারা আগে কাজে যোগদান করুন, আমি পরে আপনাদের অভিযোগ দুর করবার চেষ্টা করব। আর আপনার মাইনে দেড়শ টাকা করে দেওয়া যাবে, এটা জানবেন আপনার পুরস্কার স্বরূপ। আপনি কাজে যোগদান করুন।

নিরঞ্জন বাবু কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, আমি অন্যান্য বন্ধুদের সাথে আলাপ করে নি। আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা ভালই। তা গ্রহণ না করা আমাদের পক্ষে আহাম্মুকি। আমাদের আজকের সভাতে এই কথা আমি উঠাব।

এজেণ্ট সাহেব বলিলেন, হ্যাঁ দেখবেন যাতে সহজেই সকালেই মিটমাট হয়ে যায়।

ধর্ম্মঘটকারীদের রোজই প্রায় বৈঠক বসে, আজ এ বড় বাবুর বাড়ী, কাল ঐ বড় বাবুর বাড়ী, কেদার কোনও বৈঠকেই যায় না। সে নিজ মনেই দিন কাটাইতেছে। আজ রমেশ বাবুর বাড়ীতে বৈঠক বসিবে, নিরঞ্জন বাবু সকল প্রকার নেতৃবর্গের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া বলিয়া আসিয়াছেন, আজ বৈঠকে যেন সকলেই যান, আজ বিশেষ কথা উঠিবে। নিরঞ্জন বাবু বিশেষ ভাবে জানিতেন, কেদার বড় এক গুঁয়ে লোক, সে যাহা করিবে তাহা হইতে তাহাকে নিরস্ত করা সহজ হইবে না, তাহারও এই বৈঠকে আসা কর্ত্তব্য। কেদারকে সেই বৈঠকে যাইবার জন্য নিরঞ্জন বাবু বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিলেন।

রমেশ বাবুর বাসার বৈঠকে আজ প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন ভদ্রলোক, শ্রমজীবীদের নেতা রামভজন সিং ও ওসমানগনিও উপস্থিত হইলেন। কেদারও সেই বৈঠকে উপস্থিত হইল। সকলে যথাস্থানে উপবেশন করিলে নিরঞ্জন বাবু বলিলেন, আজ ভোরে এজেণ্ট সাহেব আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বল্লেন, তোমরা কাজে যোগ দেও, আমি তোমাদের অভিযোগ দূর করবার চেষ্টা করব, আর আসানসোলের বরখাস্ত কর্ম্মচারী যদি একটু ক্ষমা চায় তবে তাকেও কাজে নেওয়া হবে।

নিরঞ্জন বাবু নিজের মাতব্বরি বুদ্ধির কথা অবশ্য বলিলেন না। নিরঞ্জন বাবু ঐ কথা বলিয়া বলিলেন, আমার মতে আর আমাদের অপেক্ষা করা উচিৎ নয়, এই টার্ম্‌স্ (সর্ত) আমাদের গ্রহণ করা উচিত। জিদ করলে এই সর্ত ও পরে পাব না। আপনারা সকলে বিশেষ করে ভেবে দেখুন।

যোগেন বাবু নিরঞ্জন বাবুর প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন, আপনি এ প্রস্তাব এ সভাতে উপস্থিত করলেন কোন্ সাহসে ? এ প্রস্তাব গ্রাহ্যের উপযুক্ত নয়, ধর্ম্মঘট আমরা করলাম কেন ? আমরা আগে কাজে যোগদান করব তারপর এজেণ্ট সাহেব আমাদের অভিযোগ দূর করবার চেষ্টা করবেন। এ যে অদ্ভুত প্রস্তাব দেখ্‌তে পাচ্ছি, তারপর যদি তিনি তা দূর না করেন ?

নিরঞ্জন বাবু বলিলেন, এটা সাহেবকে বিশ্বাস করতে পারেন। ওজাতের এই বাহাদুরি তারা মিথ্যাকথা বড় বলে না। আমার কাছে এজেণ্ট সাহেব যে ভাবে কথা বল্লেন তাতে আমার ধ্রুব বিশ্বাস, তার একান্ত ইচ্ছা যাতে এই ধর্ম্মঘট সহজেই মিটমাট হয়ে যায়। তিনি আমাদের অভিযোগের প্রতিকার করবেনই।

যোগেন বাবু বলিলেন, আপনার এইধ্রুব বিশ্বাসটা হঠাৎ জন্মে গেল কেন? যদি এত ধ্রুব বিশ্বাসই ছিল তবে ধর্ম্মঘট করবার আগে আপনিই না হয় এজেণ্ট সাহেবের কাছে যেয়ে এর একটা মিটমাট করতেন। মশায়, ওসব কিছু না, আমার মত হচ্ছে আগে আমাদের অভিযোগের প্রতিকার হোক, তারপর আমরা কাজে যোগদান করব।

নিরঞ্জন বাবু দেখিলেন যোগেন বাবু বড় সহজ পাত্র নহেন, তখন তিনি রমেশ বাবুকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার বিশ্বাস ছিল, রমেশ বাবু প্রাচীন লোক, তাহার মাহিয়ানাও বেশী, তিনি নিশ্চয়ই সকলকে কাজে যোগদান করিতে বলিবেন।

রমেশ বাবু নিরঞ্জন বাবুর কথায় বলিলেন, দেখুন, এবিষয়ে আমার মতামত জানা নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমি ঠিক করেছি আমি আর কাজে যাবই না। বহুদিন কাজ করেছি, আগে আমরা ও আমাদের উপর-ওয়ালা সাহেবদের দেবতার মধ্যেই এক প্রকার গণ্য করতাম, তাদের সাথে কথা বলবার সময় তাদের মুখের দিকেও চাইতে সাহস কর্‌তাম না, তাদের মুখের একটু হাসি দেখলে সাত পুরুষ ধন্য হয়েছি জ্ঞান কর্‌তাম, তখন আমরা নিজেদের অস্তিত্ব বুঝ্‌তে পারি নাই, আমরা নিজের আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে তাদের পদ লেহন কর্‌তাম, তখন সাহেবরাও আমাদের বড়ই ভাল বাসতেন, মাঝে মাঝে স্নেহ ভরে ড্যাম, শূয়র বলেও আদর করতেন, আমরা আনন্দে গলে যেতাম। আর এখন দিন বদলে গেছে, আমরা আমাদের অস্তিত্ব বুঝতে পেরেছি, জগতের অন্যান্য জাতীদিগকে দেখে আমাদের চক্ষু খুলে গেছে, আমারই এখন প্রতি পদে পদে মনে হয় সাহেবদের সাথে আমাদের পার্থক্য কি? আমরা কেন তাদের পদলেহন কর্‌ব? সুতরাং এখন আমরা আর তাদের পূর্ব্বের মত সম্মানের চক্ষে, শ্রেষ্ঠত্বের চক্ষে দেখি না, তারাও আমাদের

আর তেমন ভাল বাসে না। তাদের ব্যবহার পূর্ব্বের মতই আছে, তবে আমাদের মধ্যে ভাব বদলে গেছে, আগে যাকে আমরা সম্মান জ্ঞান করতাম, এখন তাকে আমরা অসম্মান বলে জ্ঞান করি। এখন আমি মনে করি যাদের মধ্যে আত্ম সম্মান জ্ঞান আছে তারা আর ওদের সঙ্গে কাজ করতে পারে না। তাই আমি ঠিক করেছি আমি আর কাজে যাব না। আমি কাজে ইস্তফা দিয়ে সাহেবের কাছে চিঠি লিখেছি, যদি ইস্তফা গ্রহণ করে আমার প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, বোনাস্ দেন ভালই, আর যদি তা না পাই তবে না পাব। সুতরাং আমার মতামতের উপর আপনারা কোনও কাজ করবেন না। আপনারা নিজেরা আলোচনা করে যা ভাল বোঝেন করুন।

রমেশ বাবুর স্বদেশ-প্রাণতা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার ভিতরে যে এত তেজ, এত আত্ম সম্মান জ্ঞান আছে তাহা কেহই জানিত না। সকলেই একে অন্যের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তখন এক একজন এক এক রকম বলিতে লাগিলেন, কেহ বলিতে লাগিলেন, এ প্রস্তাব কিছুই নয়, কেহ বলিতে লাগিলেন, এ প্রস্তাব মন্দ কি, এক গুঁয়েমি একেবারেই ভাল নয়, ইহার পরে এ সর্ত্তও পাওয়া যাবে না।

নিরঞ্জন বাবু অবিনাশ বাবুর যোগজীবন বাবুর কাণে কাণে কি যেন বলিলেন। অবিনাশ বাবু তখন বলিলেন, মশায়, কাজে না যেয়ে কি করব? খেতে দেবে কে? সংসারে ৫।৬ জন পোষ্য, এত দিন ত এক রকম চলেছে, ঘরে যা আছে তাতে আর মাস দুই চল্‌তে পারে, তার পর কি হবে? হাতের সম্বল থাকৃতেই পথ দেখা ভাল। শেষ কালে যখন হাতে এক পয়সাও থাকবে না তখন চোখে আর পথ দেখব

না, তখন গলায় পা দিয়ে কাজে ঢোকাবে। তখন পেটের দায়ে যা তা সর্ত্ত গ্রহণ করতে হবে। মশায়, সব সহ্য করা যায় কিন্তু ছেলে পিলের অনাহার চোখে দেখা যায় না। এখন যদি আমরা কাজে না যাই তবে অনেকেরই ঘরে হাহাকারের ধ্বনি উঠ্‌বে। অনেকেই পরে মান অপমান ভুলে যে কোনও সর্ত্ত পাবে, তাই গ্রহণ করবে, তাই বলি, আর দেরী করা উচিৎ নয়, এজেণ্টের প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিৎ।

অবিনাশ বাবুর কথা অনেকেরই মনঃপুত হইল বলিয়া বোঝা গেল। নিরঞ্জন বাবুর মুখে যেন আনন্দ প্রকাশ পাইতে লাগিল। নিরঞ্জন বাবু তখন অবিনাশ বাবুর কাণে কাণে যেন আবার কি বলিয়া দিলেন। অবিনাশ বাবুর মুখেও যেন আনন্দের জ্যোতি প্রকাশ পাইল।

কেদার এতক্ষণ কিছুই বলে নাই। সে তখন বলিল, আপনারা ত দেখ্‌ছি অনেকেই নিরঞ্জন বাবুর, অবিনাশ বাবুর প্রস্তাব মনঃপুত বলে মেনে নিচ্ছেন কিন্তু আমি এ বিষয় কয়েকটা কথা বল্‌তে চাই। যখন এই ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে প্রথম সভা হয়, সেই সভায় আপনারাই না বলেছিলেন, আপনারা মানুষ, ভেড়া নয়, ভেড়ারও আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, আমাদের তা নাই? এখন কোন্ আত্মসম্মান জ্ঞানে নিরঞ্জন বাবুর, অবিনাশ বাবুর প্রস্তাব আপনারা অনুমোদন কচ্ছেন? ধর্ম্মঘট করবার সময় আপনাদের মনে ছিল না, তখন আপনাদের জ্ঞান ছিল না, ধর্ম্মঘট করলে অনেক দিন পর্য্যন্ত কষ্ট সহ্য করতে হবে? গোষ্ঠি গোত্র নিয়ে সবংশে মরতেও হতে পারে? তখন না বলেছিলেন, যতদিন পর্য্যন্ত আপনাদের অভিযোগ দূর না হবে, যতদিন পর্য্যন্ত আপনাদের দাবী পূরণ না হবে, ততদিন পর্য্যন্ত আপনাদের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গবেন না? আপনাদের অভিযোগ দূর হয়েছে? এজেণ্ট সাহেব বলেছেন, আগে কাজে এস তারপর বিবেচনা করে দেখা যাবে

তোমাদের অভিযোগ। 'তবে ধর্ম্মঘট করলেন কেন? কাজে থেকেই অভিযোগ জানাতে পারতেন? যদি কাজে যোগদান করবার পর তিনি অভিযোগ দূর না করেন তবে কি করবেন? তখন আবার বেরিয়ে আসবেন নাকি? যোগেন বাবুর কথাটা বুঝি আপনাদের বিবেচনার যোগ্য হলো না? আর ওদিকে আসানসোলের বরখাস্ত কর্ম্মচারী ক্ষমা চাইলে এজেণ্ট সাহেব তাকে কাজে নিবেন, এই ত? এটা যে কতদূর ঘৃণিত তা আপনাদের ধারণাতেই এলো না? আপনারা না এতদিন বলেছেন, সেই ভদ্রলোকটী বিনা দোষে অপমানিত হয়ে তাড়িত হয়েছেন? তার সহানুভূতিতেই না এই ধর্ম্মঘটের সূচনাও পরিণতি? তিনি কোনও দোষ না করলে ক্ষমা চাইবেন কেন? একি মনুষ্যত্বের পরিচয়? নিরঞ্জন বাবুর অবিনাশ বাবুর প্রস্তাব আলোচনার যোগ্যই নয়।

যোগ জীবন বাবু বলিলেন, এক কাঠি কোনও দিন বাজে না। আসানসোলের কর্ম্মচারীর ও দোষ আছে। একেবারে নির্দ্দোষী হলে বড় সাহেব তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেবেন কেন? আপনারা শুধু এক তরফা বিচার করবেন না।

কেদার এবার আর আত্মসংযম রাখিতে পারিল না, সে উত্তেজিত হইয়া বলিল, যোগজীবন বাবু, আমার আজ এক খুব শিক্ষা হলো, জগতের লোককেও খুব শিক্ষা দিলেন। শেষ কালে আপনাদের মুখে এও শুনতে হলো? অবশেষে সেই আসানসোলের ভদ্রলোকেরই দোষ হলো? হ্যাঁ, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তারই সম্পূর্ণ দোষ, সাহেবের কোনই দোষ নাই। সে কেন তার স্বজাতি ভ্রাতাদের নিকট তার দুঃখের কাহিনী জ্ঞাপন করে ছিল? সে কেন তার অপমান, হৃদয়ের বেদনা নিজে সহ্য না করে তার ভ্রাতাদের নিকট তা জ্ঞাপন করেছিল? সে কেন তার ভ্রাতাদের উপর

বিশ্বাস স্থাপন করে ছিল? সে কেন তখন বোঝে নাই, এই ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে সৃজিত হয়েছে? সে কেন তখন জানে নাই, এ ভারতবর্ষে জাতীয়তার ভাব কোনও দিনও সৃষ্টি হতে পারে না? সে কেন তখন বোঝে নাই, এখানে সব সময়েই নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে হয়, পরের মুখের দিকে চাইলে দোষ? সে কেন তখন বোঝে নাই, বিপদে আপদে সব সময়েই সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে তার নিজের উপরই নির্ভর করতে হবে, তার ভ্রাতাদের কাছে তার সহায়তা চাওয়া অন্যায়? খুব শিক্ষা দিলেন, দেশবাসী, তোমরা দেশ বাসীর মুখের দিকে চেয়ে থেকো না, তুমি নিজে যদি তোমার অপমানের প্রতি শোধ নিতে পার, যদি নিজে তুমি বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পার, তা করবে, অপরের দিকে দৃষ্টিপাত কোরোনা, তাদের হতে কোনও সহায়তা পাবে না। আপনারা বললেন, সেই ভদ্রলোকেরও দোষ আছে, আমি ও সে বিষয় খবর নিয়েছি, আমি বলি, তার বল্‌তে গেলে কোনও দোষই নাই। আপনারা নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে অনর্থক এক নিরপরাধি ভদ্রলোকের উপর দোষ চাপাবেন না, কাজে যেতে হয় যান।

অবিনাশ বাবু বলিলেন, কেদার বাবু, আপনি ত খুব একদফা বলে গেলেন, যেন উপন্যাসের এক অধ্যায়। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ত দেখ্‌তে হবে? আপনি যে বড় বড় কথা বললেন, না খেয়ে সপরিবারে মারা যাব নাকি? আপনার বুঝি ঘরে খাওয়ার আছে, তাই খুব লম্বা গলায় বক্তৃতা করলেন? এখন কাজে যোগদান করলে তবুও কতকটা মান থাকবে, পরে সেই কাজে যোগদান করতে হবে, তখন গলায় গামছা দিয়ে হুড় হুড় করে টেনে নিয়ে যাবে। মশায়, কথায় বলে, "চাচা আপন পরাণ বাঁচা," আপনার প্রাণ বাঁচলে ত জাতীয়তার কথা।

কেদার অবিনাশ বাবুর কথায় যেন বড়ই হতাশ হইয়া পড়িল,

কেদারের মনে হইল, 'এ জাতির লোকের প্রতি ধমনি যেন স্বার্থ সিদ্ধির চিন্তায় ভরা।

সে বলিল, অবিনাশ বাবু, মরবার জন্য এত চিন্তা কেন? তা এত ভয় করলে চলবে কেন? মরতে ত একদিন হবেই, এখন জাতীয়তার দিকে চেয়ে মরবার জন্য প্রস্তুত হন। আজ ইংরেজ জাতি জগতে এত বড় কেন? তারা জাতীয়তার কাছে নিজকে ভুলে যায়, সেইরূপ জগতে বড় হতে হলে আপনাদের স্বত্ব ভাব জাতীয়তার কাছে ভুলতে হবে। যখন ধর্ম্মঘট করেছেন, তখন যে পর্য্যন্ত আপনাদের অভিযোগ দূর না হয়, অন্ততঃপক্ষে আপনাদের বিষয় সম্মান সূচক মিটমাট না হয় সেই পর্য্যন্ত আপনাদের ধর্ম্মঘট রাখতেই হবে। আমি আবারও বলি, আপনারা আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী, বিদ্বান, জাতীয়তার কথা ভুলবেন না। আপনারা যদিও জানেন, তাও ইতিহাসের দুই একটা কথা বলি, ইংরেজকে ত আপনারা কতই নিন্দা করেন, কিন্তু তাদেরই একটা দৃষ্টান্ত দেই, তারা কেমন করে দেশের দিকে চেয়ে, জাতীয়তার দিকে চেয়ে নিজের স্বার্থ ভুলে যায়। সম্রাট ফেরোকসিয়ারের গুরুতর পীড়া হলো, তাকে ডাক্তার হ্যামিল্টন সাহেব চিকিৎসা করে আরাম করলেন, তারপর যখন সম্রাট্ ফেরোকসিয়ার হ্যামিল্টন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি পুরস্কার চান, তখন তিনি কি চেয়েছিলেন জানেন? তিনি ইচ্ছা করলে অসংখ্য মণিমুক্তা, রত্ন নিতে পারতেন, তিনি নিজের জন্য কি না নিতে পারতেন, তিনি তা কিছুই না চেয়ে জাতীয়তার কাছে নিজের স্বার্থ ভুলে যেয়ে বল্‌লেন, "সম্রাট্, ধন, মান, উচ্চতম পদগৌরব কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। আমরা বহু দূর দেশ হতে বাণিজ্য করতে এসেছি, আপনার এই সাম্রাজ্য মধ্যে আমাদের পদমাত্র রাখবার স্থান নাই। আমার প্রার্থনা, অনুগ্রহ করে আমাদের দেশবাসীদের কিঞ্চিৎ স্থান দান

করুন এবং যাতে বাণিজ্য বিষয়ে সুবিধা হয় তদুপযুক্ত কোন স্বত্ব প্রদানের আদেশ হউক।" সম্রাট প্রীত হয়ে তার প্রার্থনা পূরণ করলেন। সেই দিন এই বিস্তৃত ভারতক্ষেত্রে ব্রিটিস প্রভুত্বের যে বীজ রোপিত হলো, কালে তা অঙ্কুরিত ও প্রকাণ্ড পাদপে পরিণত হয়ে সমস্ত ভারত ভূমিতে পরিব্যাপ্ত করে ফেলল। এমন করে যদি নিজকে জাতীয়তার কাছে না ভুলতে পারা যায় তবে কি পৃথিবীতে বড় হতে পারে? আমি আবারও বলি, আপনারা এখন কাজে যোগদান করবেন না। অবিনাশ বাবু বল্‌ছেন, আমার হাতে টাকা আছে তাই আমি ধর্ম্মঘট চালাতে বলেছি, এটা আপনাদের ভুল। আমি গরীবের ছেলে, বিশ্বসংসারে এক পয়সাও আমাকে সাহায্য করবার কেউ নাই, এই চাকরিই আমার জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। খরচ পত্র চালিয়ে আমার নিকট যা ছিল তা দিয়ে আমি এতদিন চালিয়ে ছিলাম, এখন আমার কাছে আর দশটি মাত্র টাকা আছে, সেই দশটী টাকা ফুরালে আমার কপালে উপবাস। আমি উপবাসকরে মরতেও রাজি আছি তবুও এ অবস্থায় কাজে যোগদান করব না। আমি আবার ও বলি, যদি এখনই এই সর্ত্তে কাজে যোগদান করতে হয় তবে ধর্ম্মঘট করেছিলেন কেন? কাজ করবার আগেই ভাব্‌তে হয়, কাজ করে ভাবলে ফল কি?

কেদারের কথা শুনিয়া রমেশ বাবু যেন মোহিত হইয়া গেলেন, তাহার হৃদয় তন্ত্রে যেন কেদারের কথা বীণার ঝঙ্কারের মত বাঁজিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, কেদার প্রকৃত অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহার অটল তেজ, জ্বালাময়ী ভাষা শুনিয়া, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাব দেখিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, এমন লোক দেশে জন্ম গ্রহণ করিলে দেশের দুঃখের অবসানের দিন সন্নিকট। তিনি এবার বলিলেন, দেখুন না আপনারা আরও কতকটা দিন। কেদার যা বলেছে তার প্রতি বর্ণ ঠিক।

নিরঞ্জন বাবু ইতি মধ্যে কেশব বাবুর কাণে কাণে কি যেন বলিলেন। কেশব বাবু বলিলেন, রমেশ বাবু, কেদার বাবু যা বলেছেন তা ঠিক, কিন্তু এযে জীবন-মরণ সমস্যা। কেদার বাবু বারবারই বলছেন, ধর্ম্মঘট করলাম কেন? যখন ধর্ম্মঘট করেছিলাম তখন ভেবেছিলাম কয়েক দিন ঠিক থাকৃতে পারলেই কোম্পানি জব্দ হয়ে আসবে। তখন কি মনে করেছিলাম, এ রকম হবে? কিন্তু এখন যা দাঁড়িয়েছে, কোম্পানী যে এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব দেয় তাত বিশ্বাস হয় না। আমার মতে এখন কাজে যোগদান করাই উচিত।

কেদার আবার উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনাদের যা ইচ্ছা করতে পারেন, এ বিষয়ে অপরের হাত নাই। কিন্তু এটাও বলি, আপনারাই না লম্বা লম্বা গলায় আমাকে shame shame (ঘৃণা, ঘৃণা) বলে বিদ্রুপ করেছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এখন সেইম কাদের? যদি মনুষ্যত্বের দিকে চান, যদি জাতীয়তার দিকে চান, যদি দেশের দিকে চান, তবে অন্ততঃপক্ষে আসানসোলের ভদ্রলোকের সৎ ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত আপনারা কাজে যোগদান করবেন না।

কেদারের কথা কাহারও কাহারও মনঃপুত হইল, কাহারও কাহারও হইল না। সভাভঙ্গের পর সকলেই প্রায় চিন্তাকুল চিত্তে বাড়ী চলিয়া গেল।

নীচের গোলযোগের মধ্যেও অনিতা কেদারের স্বর চিনিতে পারিল। সে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া কেদারকে দেখিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার শয্যা গ্রহণ করিল। কেদার যে জায়গায় বসিয়াছিল সেই জায়গা হইতে কেদারকে দেখা যায় না, অনিতা বহু চেষ্টা করিয়াও কেদারকে দেখিতে পারিল না। অবশেষে হতাশ হইয়া বিছানায় যাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

রমেশ বাবুর বাসার সভার পর দিবস নিরঞ্জন বাবু, যোগজীবন বাবু, অবিনাশ বাবু, কেশব বাবু আরও কয়েকজন কর্ম্মচারী কাজে যোগদান করিলেন। তাহাদিগের প্রত্যেকেরই বেতন বৃদ্ধি হইল। রোজই দুই চার জন ক'রয়া কর্ম্মচারীরা কাজে যোগদান করিতে লাগিলেন।

শ্রমজীবীদের নেতা রাম ভজন সিংহ, ওসমান গণি রমেশ বাবুর বাসার সভায় থাকিয়া যাহা শুনিল তাহাতে তাহারা সিদ্ধান্ত করিল, যদি বাঁচিতে হয় কেদার বাবুর সহিত বাঁচিব, যদি মরিতে হয় তাহার সাথেই মরিব। কেদারের প্রতি কথা তাহাদের হৃদয়ের অন্তস্থলে যাইয়া বিদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা এইরূপ কৃতসংকল্প করিয়া তাহাদের সহ শ্রমজীবীদের নিকট উপস্থিত হইল।

এজেন্ট সাহেব নিরঞ্জন বাবুকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, আপনাদের মধ্যে সর্দ্দারদের আগে বাগিয়ে আনুন, তখন দেখবেন সকলেই আসবে। আপনারা খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছেন। এ সব কি হুজুগের কাজ? কিন্তু একটা কথা, ভদ্রলোকদের মধ্যে কেউ কেউ আপনারা এসেছেন, আরও আসবেন, শ্রমজীবদের মধ্যে ত কেউ আজ পর্য্যন্ত আসে নাই। তাদের কাছেও আপনারা লোক পাঠান, আমিও পাঠাব। তাদের না হলে ত কোম্পানি চলতে পারেনা।

নিরঞ্জন বাবু বলিলেন, আচ্ছা সাহেব, সে বিষয়ে দেখ্‌ব।

আরও দশদিন্ চলিয়া গেল, ধর্ম্মঘট এখনও সম্পূর্ণ ভাঙ্গে নাই। ভদ্রলোকের মধ্যে দশ আনা পরিমাণ লোক কাজে যোগদান করিয়াছে। যোগেন বাবু কাজে যোগদান করিলেন না। তাহার প্রতিজ্ঞা, যদি সন্মান সহকারে বিবাদ না মিটে তবে তিনি আর এ আফিসে কাজ করিবেন না। শ্রমজীবীদের মধ্যে কেহ কাজে যোগদান না করায় রেল কোম্পানি বড়ই বিপদে পড়িয়া গেল, তাহাদের ছাড়া রেল চালান অসম্ভব।

এজেণ্ট সাহেব আবার নিরঞ্জন বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, কই, শ্রমজীবীদের মধ্যে কেউ ত এলো না? এখন কি করি বলুন ত? ভদ্রলোকেরা যা এসেছে, তাতেই কাজ চলে যাবে, কিন্তু মুটে মজুর না হলেত আর কোম্পানি চালান অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

নিরঞ্জন বাবু বলিলেন, কেদার বাবুকে ডাকুন, শ্রমজীবীরা তার বাড়ীতে প্রায়ই যাওয়া আসা করে; তারা তার খুব বাধ্য। তাকে বাগাতে পারলে শ্রমজিবীরা আসবে।

এজেণ্ট সাহেব বলিলেন, তার বিভাগের বড় সাহেব বলেছেন, তিনি বেশ কর্ম্মঠ ও কর্ত্তব্য পরায়ণ। আচ্ছা তাকে ডাকাচ্ছি।

সেই দিন বিকেলে এজেণ্টের নামে কেদারের কাছে চিঠি গেল, এজেণ্ট-সাহেব তাহার সহিত দেখা করিতে চাহেন। কেদার এজেণ্ট সাহেবের চিঠি পাইয়া একটু হাসিল, মনে মনে বলিল, রমেশ বাবুর বাসার সভার কথা বুঝি তার কাণে গিয়েছে, তাই আজ আমার ডাক পড়েছে।

কেদার তৎপর দিবস এজেণ্ট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেল, তাহার কার্ড দেওয়া মাত্রই এজেণ্ট সাহেব তাহাকে ডাকিয়া নিলেন। এজেণ্ট সাহেব কেদারকে বলিলেন, এই ধর্ম্মঘটটা মিটিয়ে ফেলুন না? এসে কাজে ঢুকে পড়ুন। দেখছেন ত প্রায় সকলেই এসেছে, আপনিও আসুন। আপনার মত কর্ম্মঠ কর্ম্মচারী আমার এ আফিসে বলতে গেলে কমই আছে। আপনার উপরওয়ালা সাহেবেরা আপনার খুব প্রশংসা করে। আপনি মাইনে পাচ্ছিলেন কত?

কেদার বলিল, একশ টাকা।

আপনি আসুন, আপনার মাইনে দুশ টাকা করে দেওয়া যাবে। এটা মনে করবেন না আপনাকে ঘুষ দেওয়া হচ্ছে, এটা আপনার গুণের পুরস্কার। দেখ্‌ছেন ত রেল কোম্পানির কত লোকসান হচ্ছে?

মাপ করুন, এখন কাজে আস্‌তে পারব না। আপনি যদি আমার প্রতি অনুগ্রহই প্রকাশ করতে চান, তবে আমাদের অভিযোগের প্রতিকার করুন, বিশেষতঃ আসানসোলের বরখাস্ত কর্ম্মচারীকে পুনর্ব্বার কাজে ভর্ত্তি করুন। আমরা হাসিমুখে কাজে যোগদান কর্‌ব।

এজেণ্ট সাহেব দেখিলেন, এ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাহাকে বাগান সহজ ব্যাপার নহে। তিনি বলিলেন, আপনি কি মনে করেন, এ ধর্ম্মঘট আপনি একা রাখ্‌তে পারবেন? একে একে ত সকলেই কাজে আস্‌ছে, শুধু আপনিই পড়ে থাক্‌বেন।

যদি তাই হয় হবে, আমি একাই না হয় ধর্ম্মঘট চালাব। যা সত্য বুঝেছি তা ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না।

এজেণ্ট সাহেবের বোধ হইতে লাগিল, এত বড় তেজের কথা যেন আজ পর্য্যন্ত এদেশে তিনি শোনেন নাই। তিনি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কেদারের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, আচ্ছা কেদার

বাবু, আপনাদের অভিযোগের কতকটা প্রতিকার আমি কর্‌তে পারি, আপনাদের প্রত্যেকের মাইনে আমি শত করা ১০৲ টাকা করে বাড়িয়ে দিতে পারি, অন্যান্য নিয়মাবলিও আপনাদের ইচ্ছানুসারে অনেকটা পরিবর্ত্তন কর্‌তে পারি; তা আমি ঠিকও করেছি, আপনি দেখ্‌তে পারেন।

ইহা বলিয়া তিনি পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলি কেদারকে দেখাইলেন। কেদার তাহা দেখিয়া মনে মনে বলিল, ধর্ম্মঘটের যে অবস্থা, এ প্রস্তাব নেহাৎ মন্দ নয়। তৎপরে কেদার বলিল, নিয়মাবলির একটা নকল আমাকে দিন, আমাদের অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের দেখাব। পরে তাদের মত আপনাকে জানাব। আসানসোলের বরখাস্ত কর্ম্মচারীর কি করবেন?

সে সম্বন্ধে কিছু কর্‌তে পার্‌ব না।

তা হলে আর এ বিষয় নিয়ে আপনার সাথে কোনও কথা চলে না। তা হলে আমি উঠি; আমায় ক্ষমা কর্‌বেন।

কেদারের কথায় এজেণ্ট সাহেব বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এত বড় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! তিনি বলিলেন, বসুন, যাবেন না। আচ্ছা, আপনি যে আসানসোলের বরখাস্ত কর্ম্মচারীর জন্য এত মাথা ঘামাচ্ছেন, আপনি জানেন এই ধর্ম্মঘট চল্‌লে কতলোক অনাহারে মর্‌বে? আপনারা ভদ্রলোকেরা যেন এক রকম চালাবেন, শ্রমজীবীদের কয়জন না খেয়ে মর্‌বে? আপনাদের হাতে যেন টাকা থাকে, তাদের হাতে কি টাকা থাকে? তারা যে নিত্যি আনে নিত্যি খায়, আর যারা মাইনে পায়, তাদেরও মাইনে কম।

সাহেব, আমার অবস্থা খুব খারাপ। আমার চাকরি বিনে উপায় নাই, আমার হাতে আর এক টাকা আছে, তা আমার ভাগনের খাওয়ার জন্য রাখব, আজ হতে আমার আর আমার বোনের উপবাস চলল। সকলের আগে আমারই চাকরির দরকার।

সাহেব প্রকৃতপক্ষেই সহানুভূতিশীল, তিনি কেদারের কথা'য় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, আপনি যে আসানসোলের বরখাস্ত কর্ম্মচারীর জন্য এত জিদ করছেন, আপনি তার বিষয়ে সবিশেষ খবর রাখেন? আমি যত দূর খবর পেয়েছি, সেই ভদ্রলোকেরও যথেষ্ট দোষ আছে, সেই ভদ্রলোকও তার উপর-ওয়ালাকে যথেষ্ট কটু কথা বলেছিল।

কেদার বলিল, আমি সে বিষয়ে সব খবর নিয়েছি। সেই ভদ্রলোকের উপরওয়ালা তাকে আগে অনর্থক কটূক্তি করেন, তারপর তিনি সাহেবকে কটূক্তি করেছিলেন। সেই জন্য তাকে অপমান করে বের করে দেওয়ার কোনও কারণ ছিল না।

সাহেব বলিলেন, আমিও সেই রকম কতকটা খবর পেয়েছি। তা হলে আপনার মতে সেই ব্যাপারটা কি হলে মিটমাট হতে পারে?

আমার মত হল, আগে সাহেব তার ব্যবহারের জন্য সেই ভদ্রলোকের নিকট দুঃখ প্রকাশ করবেন, তারপর সেই ভদ্রলোক তার কাজের জন্য সাহেবের নিকট দুঃখ প্রকাশ করবেন, আর সেই ভদ্রলোককে এ কয় মাসের মাইনে দিয়ে আপনাদের কাজে নিতে হবে।

সাহেব বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আপনি যা বললেন আমার সে বিষয়ে বিশেষ কোনও আপত্তি নাই। আচ্ছা, আমি এ বিষয় অন্যান্য সাহেবদের সাথে পরামর্শ করে আপনাকে জানাব।

আজ তা হলে যেতে পারি?

আচ্ছা আপনাকে আমি এবিষয়ে জানাব। আমার একান্ত ইচ্ছা এ ব্যাপার শীগ্‌গির মিটে যায়।

কেদার সাহেবের সাথে দেখা করিয়া প্রায় দুপ্রহরের সময় হাবড়া হইতে হাটিয়া বাসায় আসিল। তখন বৈশাখ মাস, প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে

কেদারের গৌরবর্ণ মুখ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেদার ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাসায় ফিরিল।

কেদার এ অবস্থায় বাসায় ফিরিলে ভুবনমোহিনী একখানা পাখা দিয়া কেদারকে বাতাস দিতে দিতে বলিল, কি হলো দাদা ?

কেদার বলিল, সম্ভব গোলমাল মিটে আস্তে পারে। আমাদের এজেণ্ট সাহেব বেশ্ ভাল লোক, ইংরেজদের মধ্যে এমন ভাল লোক খুব কমই আছে। তবে এ গোলমাল তার একা মিটাবার হাত নাই। তিনি অন্যান্য সাহেবদের সাথে পরামর্শ কর্‌বেন, তারপর একমত হলে আমাদের জানাবেন। দেখা যাক্ কি হয়। কোম্পানিও অনেকটা কাবু হয়ে এসেছে।

তোমাদের আফিসের নাকি অনেকেই কাজে গেছে, পত্রিকায় ত দেখ্‌লাম, তবে কোম্পানি কাবু হয়ে এলো কিসে ?

বাবুরা ত কাজে যোগ দিয়েছে, শুধু বাবুরা ত আর কোম্পানী চালায় না। মুটে মজুর আছে, ফায়ার ম্যান, লাইনস্ ম্যান ইত্যাদি আছে, শ্রমজীবীদের নানারকম কাজ আছে। শ্রমজীবীদের মধ্যে খুব কমই কাজে যোগ দিয়েছে, এক রকম তাদের কেউ যায় নাই বল্‌লেও হয়। তাদের ছাড়া কোম্পানী চালান অসম্ভব। তারা আমাদের সঙ্গে আছে, তাই কোম্পানী জব্দ হয়ে এসেছে। এখন এটা শ্রমজীবীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কচ্ছে।

তা হলে দেখা যায় তারা বাবুদের চেয়ে অনেক শ্রেয়ঃ।

“শত সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।” তৎপরে কেদার হাসিতে হাসিতে বলিল, এক কথা ত এখনও বলি নাই। আজ ত সাহেব দুশ টাকা মাইনে দিতে চেয়েছিলেন, যদি আমি এখন কাজে যাই, তা হলে বরং আরও কিছু বেশী আদায় করতে পারি। নেব নাকি মোহিনী ? তা হলে আর উপাস করে মরতে হয় না, আজ থেকে ত আমাদের উপাস চল্‌ল।

দাদা, তুমি একথা মুখ দিয়ে আনলে কি করে? আমি তোমার বোন্ নয়? শুধু টাকার লোভে ন্যায়ধর্ম্ম ছাড়বে? টাকা কয় দিন? কার জন্য? টাকা দেখ্‌তে দেখ্‌তে উড়ে যায়, শরীর দেখ্‌তে দেখ্‌তে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়, সেই টাকা ত তার জন্যই? ন্যায়ধর্ম্ম চিরকাল। তুমিই না বলেছ, জাতীয়তার কাছে নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বার্থ, এমন কি নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়? তুমি আমাকে এই শিক্ষা দিয়ে, একথা আজ মুখ দিয়ে বের কর্‌লে কোন্ সাহসে? দাদা! আমি কি এতই নীচ, তোমাকে এমন অসৎ পরামর্শ দিব?

ভুবনমোহিনীর কথায় কেদারের কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। সে আনন্দে ভুবনমোহিনীর হাত ধরিয়া বলিল, বোন্, দিদি, তোর ভিতরে এত তেজ, তোর ভিতরে এত নৈতিক জ্ঞান? তোকে বোন্ পেয়ে যে আজ আমিই ধন্য হলেম। তোর মত রমণী যখন ভারতে জন্মেছে, তখন ভারতের মুক্তির দিন এসেছে।

কেদার বিশ্রাম করিয়া স্নান করিয়া আসিল। ভুবনমোহিনী একখানা রেকাবিতে করিয়া কিছু খাবার আনিয়া দিল। কেদার তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, একি মোহিনী, তুই আজ আমার অবাধ্য হয়েছিস্? এ করেছিস্ কি? এ পয়সা ব্যয় কেন? চার আনার জল খাবার এনেছিস্? মোটেই এক টাকা সম্বল ছিল, তাই তোকে দিয়ে গিয়েছিলাম, তা থেকে চার আনা খরচ করেছিস্, এই চার আনাতে অজিতের এক-দিনের খরচ চল্‌তো।

দাদা, তোমাকে কি আমি উপাস দেখ্‌তে পারি? আরও সারা দিন কিছু খাবে না, এখেয়ে একটু জল খেলেও একটু সুস্থ লাগ্‌বে। সেই হাবড়া থেকে এই দুপুরে হেটে এসেছ, একি সহজ কথা!

তুইত খুব একগদ বলে গেলি, এখন আমাদের এই ব্যাপার কত দিনে

শেষ হয় তার ঠিক নাই। 'অজিতের খাওয়ার আগে ঠিক রাখি, তারপর আমাদের। আমরা ক্ষিদে এক রকম বরদাস্ত করতে পারব, অজিত ত তা পার্‌বে না। আর তাই বা কতদিন? যা করেছিস করেছিস্‌, আর করিস্‌ না, এই চার আনাতে অজিতের তিন দিন যাবে। তিন দিন ত তাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব। দেখা যাক্‌ ভবিতব্যে কি আছে। যখন এনেই-ছিস, তখন আয় এর সদ্ব্যবহার করা যাক্‌। আয় এদিকে আয়, অমনি করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? অর্দ্ধেক তুই খা, অর্দ্ধেক আমি খাই।

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল, পাগল নাকি, আমি যাব খেতে?

তুই খেতে যাবি না, মরতে যাবি? আয় এদিকে বলছি, পাগলামি করিস না। রোদের মধ্যে ভাজা পোড়া হয়ে এসেছি, মাথা গরম হয়ে গেছে, শেষকালে বুড়োবয়সে মারটার খাবি। আয় এখনও বল্‌ছি।

ভুবনমোহিনী আবার হাসিয়া বলিল, মার্‌তে হয় মার, আমি কিছু খেতে পার্‌ব না।

নিশ্চয় খেতে পার্‌বি, একশবার খেতে পারবি। ইহা বলিয়া ভুবনমোহিনীকে জোর করিয়া টান দিয়া তাহার মুখে জোর করিয়া একটা রসগোল্লা কেদার গুজিয়া দিল।

ভুবনমোহিনী বলিল, দাদা, এ তোমার ভারি অন্যায়, যা এনেছি তা তোমার একারই কিছু হবে না, তাতে আবার আমায় কেন? আমরা মেয়ে মানুষ, আমরা ক্ষিদে খুব বরদাস্ত করতে পারি, তোমরা আমাদের মত কষ্ট সইতে পার্‌বে কেন? যদি তুমি সবটা না খাও, আমার খুব কষ্ট হবে।

কেদার হাসিয়া বলিল, পাগলি, তোর কথাতেই ত তুই ঠেকে গেলি। তুই-ই ত বল্‌লি, এ খাবারে আমার কিছুই হবে না, তাই এই খাবার খাওয়াও যা না খাওয়াও তা। বোন্‌, তুই না খেলে আমার কষ্ট হবে না?

আয় বোন্ যা আছে তা দুজনে মিলে খাই, তাতে যে আনন্দ হবে সেই আনন্দে আপনিই পেট ভরে যাবে।

কেদারের কথায় ভুবনমোহিনীর প্রতি ধমনিতে যেন আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়া গেল, সেই আনন্দে যেন প্রকৃতই তাহার পেট ভরিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এমন প্রীতি মধুর, এমন ভালবাসা পূর্ণ ভাষা যেন আজ পর্য্যন্ত সে শ্রবণ করে নাই। কেদারের কথায় সে যেন আত্মহারা হইয়া গেল! তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, কেদার দা কি? সে বিস্মিত নেত্রে কেদারের প্রতি চাহিয়া রহিল!

ভুবনমোহিনীকে ঐ ভাবে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া কেদার হাসিয়া বলিল,—কি, তুই এ রকম করে রইলি যে? আয়, খাবি না?

ভুবনমোহিনী এতক্ষণ যেন এক কল্পনার রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল, সেখানে যেন হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মানবের প্রতি মানবের অবহেলা নাই, মানবের প্রতি মানবের অত্যাচার নাই, সেখানে আছে শুধু ভালবাসাবাসি। তাহা যেন তাহার নিকট বড়ই প্রেমময়, মধুমাখা বলিয়া মনে হইতেছিল। 'আনন্দম্, আনন্দম্,' শব্দটা যেন তাহার কর্ণে কেবল বাজিতেছিল।

কেদারের বাক্যে তাহাকে যেন আবার এ জগতে আনিয়া ফেলিল, তাহার মোহ যেন ভাঙ্গিয়া গেল। তখন যেন তাহার নিকট এ জগত কত কদাকার, কত জঘন্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এ জগতে আছে শুধু দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার। সমস্ত বিশ্ব-সংসার যেন এই অত্যাচারে ভরা। 'আনন্দম্' এর লেশমাত্রও নাই, কে কাহাকে পিসিয়া মারিতে পারে এই চিন্তায়ই যেন মানব বিভোর।

ভুবনমোহিনী স্বপ্নোত্থিত লোকের মত কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া নিজের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বলিল,—না দাদা, খাচ্চি।

কেদার ভুবনমোহিনী একত্রে জলযোগ করিল।

আরও দুই দিন চলিয়া গেল, কেদারের নিকট এজেণ্ট হইতে কোনও খবর আসিল না। আজ তিন দিন যাবৎ ভুবনমোহিনী ও কেদার উপবাসী। আর মাত্র তাহাদের নিকট চারি আনা পয়সা আছে। কেদার এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, সে আর বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। বাল্যকাল হইতেই কেদার কাহারও নিকট হইতে এক পয়সাও নিত না যাহার প্রতিদান সে দিতে না পারিত। আহারের সংস্থান নাই, উপবাসই তাহার একমাত্র পরিণাম, সেই জন্য অপরের নিকট হাত পাতিতে হইবে, ইহা তাহার ধারণাতেই আসিল না।

কেদারের সদাহাস্য বদনকমলে এ কয়দিনের বিনা আহারে এক মলিনতার ছায়া পড়িয়াছে।

প্রাতঃকালে ৮৷৯ ঘটিকার সময় তাহাদের রেলওয়ে বিভাগের শ্রমজীবী-দের নেতাদ্বয় রামভজন সিং ও ওসমান গণি কেদারের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। কেদার অতি কষ্টে হাটিয়া তাহাদের নিকট গেল। বাহির বাড়ীতে দুইটি রোয়াক ছিল, একটিতে সে উপবেশন করিল, অপরটিতে রামভজন ও ওসমান গণি উপবেশন করিল। কেদার অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাই, তোমরা কি মনে করে?

রামভজন, ওসমান গণি সমস্বরে বলিয়া উঠিল, একি, আপনি এমন ভাবে কথা বল্‌ছেন যে? আপনার কোনও অসুখ করেছে নাকি? একি আপনার মুখখানা যে একেবারে শুকিয়ে গেছে।

না, তেমন কোনও অসুখ করেনি, তবে শরীরটা বড়ই দুর্ব্বল লাগ্‌ছে। এখন বল্‌ত ভাই তোমরা কেন এসেছ?

রামভজন বলিল, আমাদের দলের লোকেরা বল্‌ছে আর কতদিন এই ধর্ম্মঘট থাক্‌বার সম্ভাবনা। আর যে তাদের রাখ্‌তে পারছি না। বাবুরা ত প্রায় সকলেই কাজে যাচ্ছে, তা দেখে তারা যেন হতাশ্বাস হয়ে পড়েছে।

এ ধর্ম্মঘট ত আজই ভাঙ্গতে পারে যদি তোমরা কাজে যাও, এ ধর্ম্মঘট ত শুধু তোমাদের জন্যই আছে। তোমাদের উপরই দেশের জাতীয় মান-সম্ভ্রম নির্ভর করছে। ভাই, একটা কথা বলি, কর্ত্তব্য নিজের কাছে, অপরে তা অবহেলা করে করুক, অপরে তা অবহেলা করে বলে আমি তা করব কেন? যদি আমার মত চাও, তবে বল্‌তে পারি, যারা মানুষ বলে জগতে পরিচয় দিতে চায়, তারা যেন এখনও কাজে যায় না, তাদের আমি মিনতি করি, তারা যেন নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করে, কি কর্‌তে হবে। বিবেকই বলে দেবে তাদের কি কর্‌তে হবে? যে পর্য্যন্ত সসম্মানে এ গোলমাল না মিটে, ততদিন পর্য্যন্ত তারা কি কাজে যেতে পারে?

একথাগুলি কেদার এত তেজের সহিত বলিল, তাহাতে মনে হইল, কেদারের শরীরে কোনও গ্লানি নাই, এ কথাগুলি বলিতে বলিতে যেন কেদারের মলিনবদনে আবার এক বিমল জ্যোতির আভা ফুটিয়া উঠিল।

রামভজন, ওসমান গণি নির্ণিমেষ নয়নে স্তাম্ভিত হইয়া কেদারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! তাহাদের নিকট যেন এক সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যের পন্থা যেন তাহাদের নিকট প্রকটিত হইয়া আসিতে লাগিল। ঐ ভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া ওসমান গণি বলিল, আপনাকে না সেদিন বড় সাহেব ডেকেছিলেন, তিনি কি বল্‌লেন?

সাহেবের সহিত কেদারের যে কথা হইয়াছিল তাহা সে আগাগোড়া তাহাদের নিকট বিবৃত করিয়া হাসিয়া বলিল, আমাকে বলেছিল যদি আমি কাজে যোগ দেই, তবে আমার মাইনে দুশ টাকা করে দেবে।

আপনি সে বিষয়ে কি বল্‌লেন ?

কেদার হাসিয়া বলিল, তোমরা কি মনে কর ?

আমরা ত মনে করি আপনি তা অগ্রাহ্য করেছেন, আপনি ত আর নিরঞ্জন বাবু বা যোগজীবন বাবু নন্‌ ?

ভাই, আশীর্ব্বাদ কর তোমাদের বিশ্বাসহারা যেন কোনও দিনও হই না, ভগবান যেন হৃদয়ে বল দেন, জীবন গেলেও যেন হৃদয়ে ক্ষণিকের জন্যও দুর্ব্বলতা না আসে। আমি তা অগ্রাহ্যই করেছি।

তা হলে আমরা তাদের কি বলব, আরও কতকদিন দেখ্‌ব ? আমাদের ত মনে হয়,কোনও মতে টিকে থাক্‌তে পারলে আমাদের জিত হবেই।

জিত হার বুঝি না, সত্য যা বুঝেছ তা ধরে থাক্‌বে, পরিণাম যাই হয়। তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কোরো। আজ ভাই আর কথা বল্‌তে পারি না, গলা শুকিয়ে আসছে, আজ তিন দিন থেকে উপবাসী।

কেন ?

কেদার হাসিয়া বলিল, পয়সা নাই খাব কি ? উঠি ভাই এখন ?

রামভজন, ওসমান গণি অমনি কেদারের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আপনি কি ? তিন দিন থেকে অর্থাভাবে উপোস কর্‌ছেন তবুও দুশ টাকা মাইনের চাকরি নিলেন না ? আমরা আপনাকে টাকা দেই, আপনি নিবেন ?

না ভাই, তা নিতে পারি না, কারণ তার প্রতিদান ত দিতে পার্‌ব না। তবে এখন যাই।

ওসমান গণি বলিল, আজ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল, যতদিন পর্য্যন্ত সসম্মানে এ গোলযোগ না মিটে, আমরা শ্রমজীবীরা আর ততদিন পর্য্যন্ত কাজে যাব না।

কেদার ওসমান গণির হাত ধরিয়া অতিকষ্টে বলিল, হ্যাঁ ভাই, তা আমি

বিশ্বাস করি, তোমরাই দেশের আশা। জগতের অন্যান্য প্রদেশকে তোমরাই নূতন জগত করে তুলেছ, এ ভারতকে তোমরাই নূতন করে গড়ে তুলবে। ভাই তোমরা আমায় কোল দেও।

রামভজন বলিল, আপনাদের মাথা দিয়ে আমাদের চালিয়ে নিন। আজ থেকে আপনাদের সঙ্গে আমরা চিরকলি আছি।

কেদার বলিল, "ভাইরা মনে রেখো আমাদের দেশ মরে রয়েছে, তোমরাই এদেশকে বাঁচিয়ে দেশে নূতন জীবন সঞ্চার করবে, জগতের সামনে এদেশকে দাঁড়া করতে হলে তোমরাই তা করবে, তোমাদের উপরেই এই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।" ইহা বলিয়া কেদার ওসমান গণি ও রামভজনের সহিত কোলাকলি করিয়া বলিল, আজ তবে যাই ভাই, আর যেন দাঁড়াতে পারি না।

ওসমান গণি, রামভজন আবার কেদারের পায়ের ধূলা নিয়া চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে কেদার ধীরে ধীরে যাইয়া শুইয়া পড়িল। এতক্ষণ কথা বলায় সে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সে বহুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া রহিল। ভুবনমোহিনী যাহা বলিয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে তাহাই ঘটিল. কেদার ছেলে বেলা হইতেই ক্ষুধা বরদাস্ত করিতে পারিত না, এখনও পারিল না, সে এই তিন দিনেই মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল। ভুবন-মোহিনীও তিন দিনে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও সে রীতিমত হাটিতে পারিত, কাজকর্ম্ম করিতে পারিত।

ভুবনমোহিনী ও কেদার রাত্রিতে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন, এমন সময় তাহাদের সদর দরজায় ক্রমান্বয়ে ঘাঁ পড়িতে লাগিল। উভয়েই জাগিল, তাহারা শুনিল, কে যেন ডাকিতেছে, কে আছেন? বাড়ীতে কে আছেন?

কেদার উত্তর দিল, কে?

নীচে আসুন ত, কথা আছে।

কেদার ল্যাম্প জ্বালাইয়া অতি ধীরে ধীরে নীচে গেল। দরজা খুলিয়া দেখে, দুই জন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা কেদারকে দেখিয়া বলিল, এবাড়ীতে কি ভুবনমোহিনী দেবী নামে কোনও ধাত্রী আছে ?

কেদার বলিল, আছে, কেন ?

এই গলির ভিতরেই ভূপেন্দ্র বাবু জমিদারের স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠেছে, এখনই একজন ধাত্রীর প্রয়োজন, তিনি যেতে পারেন ?

কেদার কিছুক্ষণ বিবেচনা করিয়া বলিল, তা পার্‌বে না কেন ? আচ্ছা আপনারা বসুন। কেদার উপরে যাইয়া ভুবনমোহিনীর নিকট একথা বলিল। ভুবনমোহিনী একথা শুনিয়া বলিল, এই দেখ, আমাদের কাল্‌কের খোরাকী জুটে গেছে।

ভুবনমোহিনী স্বর্ণময়ীকে উঠাইয়া আনিল, তাহাকে অজিতের নিকট রাখিয়া ভুবনমোহিনী কেদারকে সঙ্গে করিয়া ভূপেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে গেল। কেদার জমিদার বাড়ীর বৈঠকখানায় শুইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

ভুবনমোহিনী যাইয়া দেখে, ভূপেন্দ্র বাবুর স্ত্রী প্রসব বেদনায় বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। তিনি এই প্রথম সন্তানের মাতা হইতে চলিয়াছেন। বেদনায় তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। ভুবনমোহিনী তাহাকে আতুর ঘরে নিয়া গেল, সেখানে যাইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই কলিকাতার ধাত্রী বিদ্যার বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার নগেন্দ্র বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নগেন্দ্র বাবু আসিয়া প্রসূতিকে পরীক্ষা করিলেন। তৎপরে ভুবন-মোহিনীকে বলিলেন, প্রসূতির অবস্থা কেমন দেখ্‌ছ ?

ভুবনমোহিনী বলিল, প্রসূতির শারীরিক অবস্থা ত ভালই, তবে আমার মনে হয় সন্তানটি ঠিক মত নাই, উল্‌টা আস্‌ছে, যেমন বেদনা আছে তাতে ত প্রসব হওয়া উচিত। না হয় বেদনা আরও বাড়বার একটু ঔষধ দিন।

নগেন্দ্র বাবু আবার প্রসূতিকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেন। বেদনাও বাড়িল, কিন্তু প্রসব হয় না। প্রসূতিও যেন ক্রমেই বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। সকলেই প্রসূতির জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

ভুবনমোহিনী কিছুক্ষণ এঅবস্থা দেখিয়া ভিন্ন প্রকোষ্ঠে আসিয়া নগেন বাবুকে বলিল, সন্তানটি উল্টো অবস্থায়ই আছে, তাই প্রসব হতে এত বিলম্ব হচ্ছে, আর এঅবস্থায় ত প্রসব হইবেই না, প্রসূতিও মারা পড়বে। আমি চেষ্টা করে দেখ্‌ব সন্তানটি ঠিকমত করে দিতে পারি কিনা?

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, না হাত দিও না, তাতে সেপটিক হতে পারে।

নগেন্দ্র বাবুর কথায় ভুবনমোহিনী সন্তানটি আর ঠিক করিয়া দিল না। আরও ঘণ্টাখানেক চলিয়া গেল, প্রসব হয়ই না, প্রসূতি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন ভূপেন্দ্র বাবু বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

নগেন্দ্র বাবু ভূপেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, আপনি খগেন বাবুকে নিয়ে আসুন, সন্তানটি কেটে বের কর্‌তে হবে, এ ছাড়া আর উপায় নাই। দুজন না হলে ত তা পার্‌ব না।

সেই মুহূর্ত্তেই খগেন বাবুর জন্য লোক পাঠান হইল। খগেন বাবু যন্ত্রাদি নিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও আসিয়া প্রসূতিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তৎপরে নগেন্দ্র বাবু ও খগেন্দ্র বাবু পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন, সন্তানটি কাটিয়াই বাহির করিতে হইবে। আর কাল বিলম্ব করা ত চলে না, প্রসূতি যে ক্রমে ক্রমেই বলহীনা হইয়া আসিতেছে, এখন সন্তান না বাহির করিলে প্রসূতিকে বাঁচান কষ্টকর হইবে। ভূপেন্দ্র বাবুকে তাহা অবগত করাইলে ভূপেন্দ্র বাবু নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাতে মত দিলেন। তাহারা তখন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে বসিয়া যন্ত্রাদি ঠিক করিতে লাগিলেন।

এমন সময় ভুবনমোহিনী ডাক্তারদের নিকট আসিয়া বলিল, আপনারা

ত সন্তানটি কেটেই বের করবেন ঠিক করেছেন আমাকে একবার অনুমতি দিন, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি, হাতদিয়ে সন্তানটি ঠিক অবস্থায় এনে প্রসব করাতে পারি কিনা। যাতে সেপটিক না হয় সে বিষয়ে আমি খুব সতর্কতা নিব।

ভূপেন্দ্র বাবু বলিলেন, আপনি পারবেন প্রসব করাতে ?

ভুবনমোহিনী বলিল, খুব সম্ভব পারব, আপনারা অনুমতি করুন।

নগেন্দ্র বাবু, খগেন্দ্র বাবু ভুবনমোহিনীর কথার কোনও উত্তর না দিয়া তাহাদের অসম্মতি জানাইলেন। ভূপেন্দ্র বাবু বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা অনুমতি দিলাম, আপনি যান চেষ্টা করুন যেয়ে। সন্তানটি কেটে ফেলার চেয়ে চেষ্টা করে দেখ মন্দ কি।

ভুবনমোহিনী প্রসূতির নিকট যাইয়া প্রসবের চেষ্টা করিতে লাগিল। বাড়ীর সকলেই উৎকন্ঠিতচিত্তে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। এক ঘণ্টার চেষ্টার পর প্রসূতির প্রসব হইল, একটি সুকুমার শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া অমনি ডাক্তারদ্বয়, ভূপেন্দ্র বাবু সেই ঘরের নিকট আসিলেন, সুকুমার সন্তানটী দেখিয়া অতীব প্রীত হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে একটা আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

আরও ঘণ্টাখানেক থাকিয়া ভুবনমোহিনী প্রসূতিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইয়া তাহাকে এক পেয়ালা গরম চা পান করাইয়া তাহাকে একটু সুস্থ করিয়া প্রসূতির প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইল।

নগেন বাবু খগেন বাবু ভুবনমোহিনীর মুখে প্রসূতির অবস্থা শুনিয়া তাহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র বাবু ভুবনমোহিনীকে বলিলেন, তোমার এ কেইসে বল্‌তে গেলে আমি এক রকম আশ্চর্য্য হয়ে গেছি. তোমার কার্য্যদক্ষতায় আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি কেইস পাচ্ছ কেমন ?

প্রায় এক বছর হলো পাশ করেছি, এই আমার প্রথম কেইস।

সত্যি ? তা হলে বড় দুঃখের কথা।

কলকাতার সহরে আমাকে কে জানে বলুন ? আমার সহায় মুরুব্বি ত কেউ নাই।

আচ্ছা, আমি তোমাকে বলে গেলাম, কাল থেকে আমার যত কেইসে ধাত্রীর দরকার হবে, সব কেইসেই তুমি থাকবে। তোমার ঠিকানাটা আমায় লিখে দেও।

নগেন্দ্র বাবুর নিকট ভুবনমোহিনী পড়িয়াছিল। সে একখানা কাগজে তাহার বাসার ঠিকানা লিখিয়া নগেন্দ্র বাবুর নিকট দিয়া বলিল, আপনি যদি আমাকে অনুগ্রহ করেন, তবে ত আমি ছেলে নিয়ে বেঁচেই যাই। আপনার মত স্ত্রী চিকিৎসায় পারিদর্শী কলকাতার সহরে আর কে আছে ?

আর বল্‌তে হবে না, আমি বাস্তবিকই তোমার কার্য্যদক্ষতায় বড়ই প্রীত হয়েছি, আজ তুমি আমাকেও হার মানিয়ে দিয়েছ, এ কেইসে যে এ রকম প্রসব হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আজ তোমার জন্য দুইটি প্রাণীই বেঁচে গেল। আমরা সন্তানটিকে ত কেটে ফেলতাম, হয় ত তাতে প্রসূতিও মারা পড়্‌তে পার্‌ত। আর ওদিকে ভূপেন্দ্র বাবুরও বংশ রক্ষা হল গেল। তার এই প্রথম ছেলে, কত আনন্দ। তোমাকে যে আমি কি বলে প্রশংসা কর্‌ব তাই আমি ঠিক পাই না। কাল থেকে দেখ্‌বে তোমার আমি কেমন পশার করে দেই, এটা যেন আমার একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলেই মনে হয়।

এটা আপনার সৌজন্য, আমার কপাল গুণে এ কেইসে ভাল ফল ফলে গেছে।

ডাক্তারেরা তাহাদের পারিতোষিক নিয়া চলিয়া গেলেন। ভূপেন্দ্রবাবু ভুবনমোহিনীর নিকট আসিয়া বলিলেন, নগেন্দ্র বাবুর অত তত বড়

ডাক্তার আপনাকে যা বলেছেন এর উপর আমি আর কি বলব। আমি সারা জীবন আপনার কাছে কেনা হয়ে রইলাম। অনুগ্রহ করে মাঝে মাঝে এসে প্রসূতিকে দেখে যাবেন। আর আপনাকে এখন সব টাকা দিতে পারলাম না, হাতে এখন টাকা নাই। কাল বাকী টাকা পাঠিয়ে দেব। আজ এই এক শ টাকা নিন, মনে কিছু করবেন না।

ভুবনমোহিনী এত টাকার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। সে বলিল, এত কেন? 'আমি করেছি কি? না না, এত দিতে হবে না।

ভূপেন্দ্র বাবু বলিলেন, বলেন কি? কই, বেশী আর দিলাম কি? আপনি আমার যে উপকার করেছেন, তার তুলনায় এ কিছুই নয়।

ভুবনমোহিনী কেদারকে জাগাইয়া তাহার সঙ্গে বাসায় আসিল। রাস্তায় ভুবনমোহিনী, সমস্ত কথা কেদারকে বলিল, তৎপরে আবার হাসিয়া বলিল, আমাদের কপাল ফিরে গেছে, আর টাকার দুঃখ নাই। নগেন্দ্র বাবুর দয়া থাকলে মাসে অন্ততঃ পক্ষে দু তিন শ টাকা করে পাবই।

কেদার বলিল, তা হলে আজ থেকে আমিও কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম। দেখলি মোহিনী, এক দিনেই কপাল ফিরে যায়।

বাসায় আসিয়া ভুবনমোহিনী কেদারের হাতে এক শ টাকা দিল। কেদার হাসিয়া বলিল, এ বুঝি পাল্টা শোধ দিলি? আমি টাকা রোজগার করে তোর কাছে দিয়েছি, তুইও টাকা রোজগার করে আমাকে দিচ্ছিস? পাগলি, টাকা কি পুরুষের কাছে থাকে? তা ত সংসারের কর্ত্রীর কাছেই থাকে। যে দিন থেকে তুই দিদিমণি আমার সংসারে এসেছিস সেই দিন থেকেই তুই সংসারের কর্ত্রী হয়েছিস, তবে আবার আমার কাছে টাকা পয়সা কেন? এ তোর কাছেই রেখে দে।

ভুবনমোহিনী বলিল, দাদা, তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি।

তৎপর দিবস অতি প্রত্যূষে কেদার দোকান হইতে ডাল, চাউল

ইত্যাদি নিয়া আসিল। রান্না হইলে উভয়ে একসাথে বসিয়া পরিতোষ রকমে ভোজন করিল।

খাইতে বসিয়া ভুবনমোহিনী হাসিয়া কেদারকে বলিল, কি দাদা, বড় না বাহাদুরি করেছিলে ? এখন যে তিন দিনেই চিৎপটাং হয়ে পড়েছিলে ? আমাদের সঙ্গে আবার তোমাদের তুলনা ?

হঁ্যা বোন্, আমি হার মেনেছি। জানিস্ মোহিনী, আমি ছেলেবেলা থেকেই বড় রাক্ষস, ক্ষুধাটা আমি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারি না, তাই দুদিনেই আমি ঢলে পড়ি।

দাদা, তা নয়; তুমি বলে কেন,—তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমরা আমাদের মত কষ্ট সহ্য করতে পারবে কেন ? জান আমরা ভারতের নারী, জ্ঞানাবধিই আমরা কষ্ট সহ্য করতে শিখি ?

আহারের পর তাহারা বসিয়া গল্প করিতেছে, এমন সময় ভূপেন্দ্র বাবুর বাসা হইতে ভুবনমোহিনীর নিকট আরও একশ টাকা দিয়া গেল। ইহার কিছুক্ষণ পরেই ডাক পিয়ন চিঠি বিলি করিয়া গেল। কেদার চিঠি পড়িয়া লাফ দিয়া উঠিয়া বলিল, দেখলি মোহিনী, নিয়তির কি খেলা ? কাল আমরা না খেয়ে অনাহারে মরতে বসেছিলাম, আজ আমাদের টাকার ছড়াছড়ি ! সাহেব লিখেছেন, সে দিন আমার সঙ্গে যে কথা হয়েছিল, সেই মত তিনি আপোষ করতে রাজি আছেন। আমি এখনই যোগেন বাবুকে নিয়ে রামভজন, ওসমান গণির ওখানে যাব। যারা এখন পর্য্যন্ত কাজে যোগ দেয় নাই, তাদের সকলকে ডেকে সাহেবের চিঠি দেখাতে হবে, তাদের মত হলে গোলমাল মিটে যায়। কেমন ভাল হলো না ?

নিশ্চয়ই ভাল।

কেদার হাসিতে হাসিতে আবার বলিল, আর একটা খবর আছে, সেটাও মন্দ নয়। বল্ ত কি মোহিনী ?

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল, তা আমি কেমন করে বল্‌বো ?

কেদার হাসিয়া বলিল, যদি তা না পার্‌বি তবে আমার বোন্ হয়েছিলি কেন ?

ভুবনমোহিনী এবার হাসিয়া বলিল, বল্‌তে পারি একটা, তবে ঠিক হবে কিনা জানি না। বল্‌ব কি ?

সে দিন কেদার তাঁহার মাহিয়ানা বৃদ্ধির কথা ভুবনমোহিনীর নিকট বলিয়াছিল। ভুবনমোহিনী মনে মনে তাহাই অনুমান করিয়া বলিল, তোমার মাইনে বাড়ার কথাও আছে, কেমন ?

দেখ্‌ত মোহিনী! তাই ত বলি, তুই আমার মার পেটের বোন। তাইলো দিদি, তাই! সাহেব লিখেছেন, তিনি আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হয়ে দুশ টাকা মাইনে করে দিলেন। দেখেছিস্ দিদি, এসব অদৃষ্টের পরিহাস, এসব নিয়তির খেলা!

কেদার যোগেন বাবুর বাসায় যাইয়া তাহাকে সাহেবের চিঠি দেখাইল, তারপর সে যে সর্ত্ত সাহেবের কাছে দিয়াছিল তাহা বলিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাহিয়ানা বৃদ্ধির কথাও বলিল। যোগেন্দ্র বাবু কেদারের মতে সম্পূর্ণ মত দিলেন। কেদারের মাহিয়ানা বৃদ্ধির সম্পর্কে যোগেন বাবু বলিলেন,—কেদার, তুমি আমার বয়সে ছোট, কিন্তু তাও বলি তোমার জন্যই এই সর্ত্ত পাওয়া গেল। তোমার মত লোকের মাইনে বাড়াই উচিত, তাতে আমি অতীব সন্তুষ্ট হয়েছি।

যোগেন বাবুকে সঙ্গে করিয়া কেদার ওসমান গণি ও রামভজনসিংএর বাড়ীতে গেল। তাহাদের নিকট এজেণ্ট সাহেবের প্রস্তাব সবিশেষ বর্ণনা করিয়া তাহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা সানন্দচিত্তে তাহা অনুমোদন করিল।

ওসমান গণি কেদারকে বলিল, বাবু, আজ আপনারা আমাদের দেশের,

দশের মান রেখেছেন। আপনার মাইনে বাড়াতে আজ আমরা সকলেই খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনার মত সাধু লোকের ত পুরস্কার পাওয়া চাই-ই। এই কথা বলিয়া সে যোগেন বাবুকে বলিল, কেদার বাবুর সব কথা জানেন ?

যোগেন বাবু বলিলেন,—সে কি রকম ?

ওসমানগণি—কেদারের অর্থাভাবে উপবাসের কথা, ও সেই দিনকার কেদারের শারীরিক অবস্থার কথা বিবৃত করিল। যোগেন বাবু তাহা শুনিয়া বলিলেন,—কেদার, ভাই, তুমি আমার বয়সে অনেক ছোট, তবুও তুমি আমাকে তোমার পায়ের ধূলা দেও, তোমার পায়ের ধূলা নিয়ে আমি জীবন সার্থক করি, এ পতিত দেশে এ রকম লোকও জন্ম গ্রহণ করে ?

কেদার বলিল, আপনি বল্‌ছেন কি ? আমার যে পাপ হবে! আপনি আমায় পায়ের ধূলা দিন, আশীর্ব্বাদ করুন কর্ত্তব্য কার্য্যে যেন কোনও দিন অবহেলা না করি।

ইহা বলিয়া কেদার যোগেন বাবুর পায়ের ধূলা নিয়া আবার বলিল, আপনিই এই ব্যাপারে কি কম করেছেন ? আপনি তিনশ টাকা মাইনে পান, প্রভিডেণ্ড ফণ্ডে আপনার কত টাকা জমেছে, আপনি ত তার মায়া পরিত্যাগ করে কর্ত্তব্য পালন করেছেন। আপনার স্বার্থত্যাগ ত কারো চেয়ে কম নয়।

যোগেন বাবু কেদারকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আজ বাস্তবিকই আমি ধন্য হলাম। আজ ত তোমার খাওয়া হয়েছে ?

হ্যাঁ, অদৃষ্ট অনেক টাকার মুখ দেখিয়ে দিয়েছে। আমার একটি বোন আছে, সে ধাত্রী ; কাল রাত্রিতে সে একশ টাকা পেয়েছে, আজও সে একশ টাকা পেয়েছে। আপনার বাসায় আজ বিকেলেই সভা করুন, সকলের মত হলে কাল সাহেবকে আমাদের মত জানাব।

সেই কথা মত বৈকালে যোগেন বাবুর বাসায় সভা হইল। সকলেরই সেই সর্ত্ত গ্রহণ করার অভিমত হইল। তৎপর দিবস কেদার যোগেন বাবুকে নিয়া এজেণ্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাদের মত জানাইল। এজেণ্ট সাহেবও তাহা গ্রহণ করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই সকলে কাজে যোগদান করিল। দেখিতে দেখিতে ষ্টেশন আবার সজীব হইয়া উঠিল। ই, আই, রেলওয়ের ধর্ম্মঘট শেষ হইয়া গেল।

সুখ সুখ করিয়া এ বিশ্বসংসারে সকলেই পাগল, কিন্তু সুখ কাহাকেও ধরা দেয় না। যদি বা কোনও লোক দুই দণ্ড মনে করে আমি বেশ সুখে আছি, আবার অমনিই তাহার মনে হইবে, কই সুখ কই? না, ইহাতেই বা সুখ কি? দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ আছে, দুঃখ না থাকিলে সুখ বলিয়া মনে যে একটা ভাব আসে তাহা উপলব্ধি করা যাইত না, অভাব থাকিলেই অভাব পূরণের আনন্দ, অন্ধকার আছে বলিয়াই জ্যোৎস্নার আদর, সূর্য্যের তেজ আছে বলিয়াই চন্দ্রের কিরণ এত মধুর।

বহুদিনের অনটনের পর কেদারের এখন বেশ স্বচ্ছল অবস্থা। তাহার একবার মনে হইত, এক্ষণে বেশ সুখে আছি, আবার সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইত, কই সুখ কই? টাকাতেই কি সুখ? বাস্তবিকই সে তাহার নিজের অবস্থার বিষয় কোন দিনও বড় চিন্তা করিত না, যখন যে অবস্থায় পতিত হইত তাহাই বিধির লিখন বলিয়া মানিয়া নিত। তাহার মনে হইত, এ পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র বিশেষ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি সবই যেন সেই বিরাট যন্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া সকলেই সেই বিরাট যন্ত্র চালনের সাহায্য করিতেছে, নিয়তি দেবী অলক্ষ্যে থাকিয়া সেই যন্ত্র চালাইতেছেন। সুখও তাহার, দুঃখও তাহার, ঘোর অন্ধকার যামিনীও

তাহার, শারদ পূর্ণিমা রজনীও তাহার, তবে আর সুখ সুখ করিয়া উন্মাদ হইবার ত কোনও কারণ নাই।

আজ প্রাতঃকালে ডাক আসিলে চিঠি পড়িয়াই কেদার ভুবনমোহিনীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন ভুবনমোহিনী রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত। কেদার বলিল,—নে, এখন পাকটা একটু রাখ্। আরও কয়েকজনের পাক আজ কর্‌তে হবে। এই দেখ্ চিঠি।

ভুবনমোহিনী বলিল,—বল না হয়েছে কি ?

সুশীল মালতীকে নিয়ে আস্‌ছে।

ভুবনমোহিনী তাহা শুনিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল,—তারা আমাকে দেখে কি বল্‌বে ?

কেদার বুঝিতে পারিল কেন ভুবনমোহিনী এ প্রশ্ন করিল, সে হাসিয়া উত্তর করিল,—তোকে দেখে বাঘও মনে কর্‌বে না, ভাল্লুকও মনে করবে না, তোকে দেখে মনে কর্‌বে তুই আমার বোন্, মালতীর বোন্।

তুমি তা কেমন করে জান্‌লে ?

তা আবার কেমন করে জান্‌ব ? বোনকে চিন্‌তে বোনের দেরী হয় নাকি ? তোকে আমি কেমন করে চিনেছিলাম ? কেউ আমাকে তোর পরিচয় দিয়ে দিয়েছিল ? অত লোকের মধ্যে তোকে আমি চিনে ফেল্‌তে পার্‌লাম, আর মালতী তোকে এই বাসায়ই চিন্‌তে পার্‌বে না ? পাগ্‌লি কোথাকার, মালতী আমার বোন্ নয় ?

ভুবনমোহিনীর এবার মনের অন্ধকার কতকটা যেন কাটিয়া গেল। সে হাসিয়া বলিল,—সত্যি দাদা ? দেখা যাবে বোন্‌টি ভাইয়ের মত কি না ?

দেখ্‌বিই আস্‌লে।

যাক্, এখন সে কথা, তারা কখন আস্‌বে ?

এগারটার গাড়ীতে।

তবে তুমি বাজারে যাও, গিয়ে ভাল মাছ ঠাছ আন।

মাছ ত ভাল দেখে আন্‌ব বুঝ্‌লাম, এখন ঠাছ আন্‌ব কি? মাছটা ত আমি চিন্‌ব এখন, ঠাছটা কি আন্‌ব বলে দে।

তোমার কেবলই ঠাট্টা। মুখ্‌খু বলে বুঝি বোন্‌কে এত ঠাট্টা কর্‌তে হয়? না হয় আমি মুখখু আছি, একটু বিদ্যা বুদ্ধি শিখিয়ে দিলেই পার্‌তে।

বাপ্‌রে, মানিনীর আবার অভিমান আছে! না, না, বল্‌ছি কি, এ ত অভিমান নয়, এ যে অহঙ্কার। মাস মাস দু তিন শ টাকা রোজগার কর্‌ছেন কিনা, তাই আজ বল্‌ছেন, তিনি মুখ্‌খু মানুষ।

দাদা, বলি ভাল হবে না, আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমায় এ কথা বল্‌লে? আমি আজ থেকেই ধাত্রীর ব্যবসা ছেড়ে দিলাম। আর আমাকে কেউ ঘর থেকে বের করতে পার্‌বে না। সে ইহা বলিয়াই পাশ ফিরিয়া পাকের দিকে মন দিল।

কেদার দেখিল, ভুবনমোহিনী সত্য সত্যই তাহার কথায় দুঃখিতা হইয়াছে। সে ঘুরিয়া যাইয়া ভুবনমোহিনীর সম্মুখে উপবেশন করিয়া বলিল, —দিদি, ভাইকে কি ক্ষমা কর্‌তে নাই?

ভুবনমোহিনী সেই দণ্ডেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—না, তোমার সঙ্গে রাগও করা যাবে না। তুমি বড় দুষ্টু। আচ্ছা, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, এই যে টাকা পাচ্ছি, এটা কার? আমার না তোমার?

আচ্ছা তা ত যেন হলো। আমি যা বলেছিলাম তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

বল, আর কোনও দিন একথা মুখে আন্‌বে না।

না, আন্‌ব না।

তিন সত্যি দেও।

বাবা, কি এক কথা বলেছি, তার জন্য এত, আস্ত পাগলি! আচ্ছা

দিয়েছি। প্রতিজ্ঞা করলাম আর কখনও একথা বলব না। এখন বল্ ঠাছটা কি আন্‌ব।

আবার ঠাট্টা !

ভুল হয়েছিল, এখন বল্ কি কি আন্‌তে হবে।

ভাল দেখে মাছ আন্‌বে, ঘরে ভাল ঘি নাই কতকটুকু ঘি আনবে, আলু, কফি, বেগুন, রাবরি, রসগোল্লা, সন্দেশ আর যা পছন্দ হয় তোমার তাই এনো।

বাজারে যে এ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়, বোন্ আমার ত মনে হয় না। আমার ত মনে হয় বাজার শুদ্ধ কিনে আন্‌লে হয়। না হয় আর এক কাজ করা যাক্, একখানা গাড়ী করে তুই আমার সঙ্গে চল্, তুই গাড়ীতে বসে বসে ফরমাইশ কর্‌বি, আমি কিনে কিনে গাড়ী ভর্‌ব।

আবার ঠাট্টা আরম্ভ হলো! তোমার আজ হয়েছে কি? গুরুজন কেউ বাড়ীতে নাই কিনা, তাই শাসনের অভাবে তোমার মাথাই খারাপ হয়ে গেছে।

বাবা, এর উপর আবার গুরুজন! যে লঘু জন বাসায় আছে তার চোট সাম্‌লাতেই আমার প্রাণান্ত, এর উপর আবার গুরুজন, তা হলে ত আমি মারাই পড়তাম। আচ্ছা, তুই যে আমার কথায় বড় দোষ ধর্‌লি, বলত এতগুলি আমার কি মনে থাকবে?

আর দুষ্টামি কোরো না, তা হলে আমি এখনই রান্না ফেলে ঘরে দরজা দিয়ে শুয়ে থাক্‌ব, আমাকে কেউ ডেকে বের কর্‌তে পার্‌বে না।

তা আর কবে হলো! ঘরে দরজা দিয়ে আর কতক্ষণ থাক্‌বে? আর দু ঘণ্টা পরেই ত ডাকাডাকি আরম্ভ হবে।

না দাদা, আর দেরী কোরো না, বাজার থেকে জিনিষ পত্রগুলা

নিয়ে এস। সুশীল বাবু কি কোনও দিন এখানে এসেছে? তাকে একটু ভাল রকমেই সমাদর কর্‌তে হবে।

আচ্ছা যাচ্ছি।

আর এক কথা, আজ তোমার আফিসে না গেলে হয় না? আমার আজ আবার একটার সময় বেরোতে হবে, হাতে তিনটা কেইস আছে, তাদের দেখে আস্‌তেই হবে। আমিও বাসায় থাক্‌ব না, তারা কি তবে একলা থাক্‌বে?

কথাটা বলেছিস্ মন্দ নয়। আচ্ছা, আমি বাজারে যাই. বাজারের সাম্‌নেই যোগেন বাবুর বাসা, তার সঙ্গে সাত দিনের ছুটীর জন্য একখানা দরখাস্ত দিয়ে আস্‌ব। আর তোর প্র্যাক্‌টিসের জ্বালায়ই এখন অস্থির হয়ে পড়্‌লাম।

এ তোমারই স্বকৃত অপরাধের ফল। ছেড়ে দিব?

আবার পাগ্‌লামি?

ইহা বলিয়াই কেদার বাজারে চলিয়া গেল। ভুবনমোহিনী ঘর দরজা বিছানা পত্র একটু বিশেষ ভাবে পরিষ্কৃত করিয়া রাখিল। কিছুক্ষণ বাদে কেদার দুইটী কুলির মাথায় দিয়া বাজার হইতে নানা প্রকার জিনিষ পত্র নিয়া আসিল। ভুবনমোহিনী তাহা সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া মাছ তরকারি কাটিয়া আবার রন্ধন কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

কেদার হাত পা ধুইয়া বারান্দায় একখানা চেয়ারে উপবেশন করিল, ভুবনমোহিনী রন্ধন করিতে লাগিল। শীতকাল, সুতরাং রন্ধনে কোনও কষ্টই হইতেছিল না। ভুবনমোহিনীর আজ রন্ধনের উৎসাহ দেখিয়া কেদার বলিল,—আজ যে এত পাক কচ্ছিস্, বলি এত খাবে কে?

কেন, আমি খাব।

হ্যাঁ, তোকেই খেতে হবে। এত ত আমরা খেতে পার্‌ব না।

কেন, তুমি আবার নিখাতুরি কবে থেকে হলে? শালাটি যেমন, বোনাই যদি তেমন হয়, তবে ত এতেও কুলাবে না।

কি, তুই আমাকে রাক্ষস বল্লি? জানিস্, এ বদনামটি আমার কোনও কালেও নাই?

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল,—না, তা ত ঠিকই, মেসে পর্য্যন্ত নাম করে ফেলেছিলে।

কেদার হাসিয়া বলিল,—আগে নাই থাকুক, এখন আমার খাওয়া কমেছে, কেমন?

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল,—কমেছে ত নিশ্চয়ই, আমি এসে প্রথম যা দেখেছিলাম তার তিন গুণ হয়েছে মাত্র। পেটটার দিকে দেখ্ছ কি? এ যে বাড়্তে বাড়্তেই চলেছে।

এ ত তোরই দোষ, তুই আবার বলিস্?

কেন, আমার দোষ কিসে?

তুই এত ভাল রান্না করিস্ কেন? এত আদর করে খাওয়াস্ কেন?

হয়েছে, আর সে কথা বল্তে হবে না, আজ তোমার মা থাক্লে তোমাকে কত আদর যত্ন কর্তেন।

পাগ্লি, মা কি চিরকাল কারো থাকে? মা-ই ত আমাকে তোর হাতে সপে দিয়েছিল, তুই যা আদর যত্ন করিস্ সম্ভবতঃ মাও আমাকে এত করত না।

এমন সময় অজিতকুমার তথায় আসিয়া কেদারের কোলে চড়িয়া বসিল। কেদার অজিতকে বলিল,—মামু, তোর ত এক মাসীমা আর মেসো আস্ছে।

সত্যি? তারা কেমন মামু?

খুব ভাল।

তোমার মত ?

আমার চেয়েও ভাল ,

অজিত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—উঁহু,তাকি হতে পারে ?

কেদার হাসিয়া বলিল, কেন হতে পারে না ?

অজিত দৃঢ়স্বরে বলিল, না, তা হতেই পারে না। তোমার থেকেও কি ভাল হতে পারে ?

খুব পারে।

না, পারেই না।

ভুবনমোহিনী এবার হাসিয়া বলিল,—দাদা, তুমি অনর্থক ওকে বুঝাবার চেষ্টা কর্‌ছ। ও যে তোমাকেই তার আদর্শ করে রেখেছে, এ ওর মন থেকে কিছুতেই দূর কর্‌তে পার্‌বে না। আশীর্ব্বাদ করি, এ ধারণা ওর মন থেকে যেন কোনও দিনও দূর হয় না।

তুইও দেখছি যা তা বক্‌তে আরম্ভ কর্‌লি! বুঝেছি, আগুণের জালে বসে তোর মাথা গরম হয়ে গেছে। এখন এদিকে আয়, মাথায় একটু জল দেই।

না দাদা, মাথা আমার গরম হয়নি, তোমার মত চরিত্রবান এ সংসারে আর কয় জন আছে ?

থাক্‌ ও সব বাজে কথা, তোর পাকের কতদূর ?

দূর আর বেশী নয়, এই গোটা দুই পদ বাকী আছে। কয়টা বেজেছে ?

প্রায় এগারটা বাজে।

তাহলে ত তাদের আস্‌বার সময় হয়েছে ?

হ্যাঁ, তারা এলো বলে।

এমন সময় তাহাদের সদর দরজায় একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল।

কেদার বলিয়া উঠিল,—ঐ বুঝি তারা এসেছে। ইহা বলিয়াই সে অজিতকে কোলে করিয়া সদর দরজায় গেল।

কেদারকে দেখিয়াই মালতী, সুশীল গাড়ী হইতে নামিল। কেদার অজিতকে কোল হইতে নামাইয়া মালতীর পুত্রকে কোলে করিয়া তাহার গালে দুইটী চুম্বন বসাইয়া দিল। তৎপর অজিতকে বলিল, "তোর মাসীমা, মেসোকে প্রণাম কর্।" অজিত তৎক্ষণাৎ সুশীল ও মালতীকে প্রণাম করিল। মালতী অজিতকে কোলে করিয়া তাহার গালে চুম্বন দিতে দিতে বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল। অজিত মালতীর মুখের দিকেই তাকাইয়া রহিল, সে যেন তাহাকে চিনিতে চেষ্টা করিতেছিল।

কতকদূর যাইতেই ভুবনমোহিনীর সহিত মালতীর দেখা হইল, সে অমনি ঢিপ করিয়া ভুবনমোহিনীকে প্রণাম করিল। ভুবনমোহিনী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। মালতী মুখ তুলিয়া ভুবনমোহিনীর দিকে চাহিয়া রহিল, কিছুক্ষণ পরে বলিল,—দিদি, তুমি এত সুন্দরী? আমি কি একখানা ছবি দেখ্‌ছি?

মালতীকে ভুবনমোহিনী বক্ষে টানিয়া আনিয়া বলিল,—বোন্, কে বেশী সুন্দরী? ঘরে আয়না আছে, চল ঘরে যেয়ে দেখি।

আর আমার দেখ্‌তে হবে না, তোমার যেমন রূপ তেমন গুণ।

বোন্, ঠিক বল ত তুমি আমায় চিন্‌লে কেমন করে?

মালতী হাসিয়া বলিল,—পাগলি কোথাকার! নিজের বোন্‌কে আবার চিনিয়ে দিতে হয় নাকি? দাদা চিনেছিল কেমন করে? দিদি, ফুলের গন্ধ কি কেউ ঢেকে রাখ্‌তে পারে? তার গন্ধ আপনিই ছড়িয়ে পড়ে, তোমা হেন ফুলের গন্ধ আমাদের সুদূর দেশে গিয়েও পৌঁছেছে। তোমরা আমাদের খবর নেও না বলে, আমরা তোমাদের সব খবর রাখি।

এমন সময় সুশীল ও কেদার পোর্টমেণ্ট, বিছানা পত্র নিয়া বাড়ীর

ভিতর ঢুকিল। কেদার ভুবনমোহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,— কিলো পাগ্‌লি, দেখ্‌লি, আমার কথা ঠিক কি না? কেমন মালতী তোকে চিন্‌তে পেরেছে? পাগ্‌লি, বোন্‌কে আবার চিনিয়ে দিতে হয়?

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল,—তা তোমরা দু ভাই বোনই কথাতে পটু। যাক্‌, এখন তোমরা হাত পা ধোও, বিশ্রাম করে স্নান টান কর, বেলা কম হয় নি।

ভুবনমোহিনী ইহা বলিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। মালতীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। রান্নার নমুনা দেখিয়া মালতী বলিল,—দিদি, আর কাকেও খেতে বলেছ?

কেন, একথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে যে?

এত খাবে কে?

যেমন ভাই তেমন বোন্‌, যেন সবই নিখাতুরি! আচ্ছা না হয় আমি একাই খাব। সুশীল বাবু বুঝি শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়েই দিন কাটায়?

মালতী হাসিয়া বলিল,—তুমি বড় দুষ্টু, তোমার সঙ্গে কথায় পেরে উঠা যাবে না

আচ্ছা বল ত বোন্‌, তোমরা কি করে জান্‌লে আমি এখানে আছি?

সেও একটি ইতিহাস মন্দ নয়। তুমি এই গলির ভূপেন বাবুর বাড়ী না কার বাড়ীতে কখনও কাকে প্রসব করাতে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, সে ত দু্'তিন মাসের কথা।

সেই বাড়ীর কেইদে তোমার খুব নাম হয়। তোমার কার্য্যকলাপ দেখেই তাদের মনে হয়েছিল তোমাতে আর অন্যান্য ধাত্রীতে অনেক প্রভেদ আছে। তাতে আবার তুমি দাদার সাথে থাক। ই, আই, রেলওয়ের ধর্ম্মঘটের পর দাদাকে এখন সকলেই চিনে, সকলেই জানে

তিনি একটা মানুষের মত মানুষ, তাই তার কাছে থাক বলে ভূপেন বাবুদের বাড়ীর সকলেই উৎসুক হল তোমার পরিচয় জান্‌তে। ভূপেন বাবু নাকি একদিন দাদাকে ধর্‌লেন তোমার পরিচয় জান্‌তে। দাদা তোমার পরিচয় দিতে প্রথমে অনেক আপত্তি কর্‌লেন, শেষকালে অনুরোধ এড়াতে না পেরে, তার কাছে তোমার সবিশেষ পরিচয় বল্লেন। যখন দাদার সঙ্গে ভূপেন বাবুর বাসায় তোমার বিষয় নিয়ে আলাপ হয়, তখন সেখানে তার এক শ্যালক উপস্থিত ছিলেন, তিনি এখন আমাদের ওখানেই মুন্সেফ, তিনি একদিন কথায় কথায় আমাদের বাবুর কাছে তোমার কথা, দাদার কথা বল্লেন, তিনি ত আর জানেন না যে সেই কেদারই আমার দাদা। তোমার কথা শুনেই ত আমি তোমাকে দেখ্‌বার জন্য পাগল হলাম, দাদাকেও অনেক দিন থেকে দেখি না, মাকে ত দেখ্‌তে পার্‌লামই না। বাবুকে ধরলাম, ১৫ দিনের ছুটি নিয়েছেন, এসে পড়লাম।

মাতার কথা বলিতে বলিতে মালতীর চক্ষে জল আসিল, ভুবনমোহিনী তাহা লক্ষ্য করিল। ভুবনমোহিনী মালতীর কথা শুনিতে শুনিতে যেন মোহিত হইয়া গেল, মনে মনে বলিল, যেমন ভাই তেমন বোন্।

ভুবনমোহিনী রান্না শেষ করিয়া মালতীর পুত্রকে কোলে করিয়া নিয়া দুধ খাওয়াইল। মালতীকে বলিল. তুমি বোন্ নেয়ে আস, আমিও স্নান করে আসি। দাদার আর সুশীল বাবুর স্নান হবে না? বাবা তাদের গল্পই যেন আর ফুরায় না, যেন দুইটিই গল্পের ফোয়ারা, দুইটিকেই উপাধি দিলে হয় "গল্পার্ণব"।

মালতী হাসিতে হাসিতে বলিল,—ভাল উপাধি দিয়েছ, আজ তাকে বল্‌তে হবে।

আমার নাম কোরো না কিন্তু, সুশীল বাবু কি মনে কর্‌বেন।

না, মনে আর কর্‌বেন কি, ঠিক উপাধিই ত দিয়েছ। উনি গল্প পেলে আর সব ভুলে যান।

তোমাকে পর্য্যন্ত ?

আমি ত কোন্ ছার ? এমন যে তামাক, তামাক পর্য্যন্ত।

সুশীল বাবু খুব তামাক খোর নাকি ?

দেখছ না, চুরুটটা মুখে লেগেই আছে ? আমি তামাক খোরদের দেখ্‌তেই পারতাম না, আমার কপালে তেমনই তামাক খোর জুটেছে।

তামাক খোরদের প্রতি এত ঘেন্না কেন ?

আর দিদি, তাদের কথা বোলো না। প্রথমতঃ, তামাক খোরদের মুখেই এক বিদ্‌ঘুটে গন্ধ, দ্বিতীয়তঃ, এগুলোর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানই থাকে না। এক ঘটনা বলি তাহেত বুঝ্‌বে ওরা ঘৃণার পাত্র কি না। আমার শ্বশুরের খুব ব্যারাম, তখন কয়েকজন ভদ্রলোক তাকে দেখ্‌তে এলেন, আমরা শ্বশুর মশায়কে নিয়ে বসে আছি, তাকে নিয়ে আমরা সকলেই ব্যস্ত, ঐ ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন বলে বস্‌লেন, এখানে তামাকের বন্দোবস্ত নাই ? আমরা আছি আমাদের রোগী নিয়ে ব্যস্ত, ঐ ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন হয়েছেন তার তামাকের জন্য। বল ত দিদি, ঐ ভদ্রলোকের এটা কোন্ ভদ্রত্ব ?

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল,—এ আবার তামাক খোরের রাজা, এরকম বড় দেখা যায় না।

না দিদি, তামাক খোরদের পরিণতিই ঐ রকম। আমার কর্ত্তাকেই দেখেছি, রাস্তাঘাটে চলেছেন, সঙ্গে ভুলক্রমে চুরুট নাই, তখন চেনা শুনা নাই, সাধারণ লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতিয়ে তামাক টান্‌তে বসে গেলেন।

এটা কিন্তু একদিকে হিসাব কর্‌তে গেলে দেখা যায় মধ্যে

খুব উদারতার ভাব আছে, মনের থেকে আত্মপর ভাবটা দূর করে ফেলে, যাকে বলে "বসুধৈব কুটুম্বকম্"।

রেখে দাও তোমার "বসুধৈব কুটুম্বকম্"। আমি তামাক খোরদের দেখ্‌তেই পারি না।

না দিদি রাগ কোরো না, তোমার কর্ত্তার মুন্সেফি চাকরি করতে গিয়ে অনেক মাথা খাটাতে হয়, তামাক খেলে মাথা পরিষ্কার থাকে।

মদ খেলে মাথা আরও পরিষ্কার থাকে শুনেছি।

আচ্ছা, তোমার কর্ত্তাকে আমি বলে দিব।

বল না, আমি কি তাকে ডরাই। বল না, সত্যি কথাই ত বলেছি।

ভুবনমোহিনী সেই দণ্ডেই চেচাইয়া বলিল,—বলি ও মশায়, আপনারা যে গল্পের ফোয়ারা ছুটিয়েছেন, এদিকে ত এক জন রাগ কচ্ছেন। বলি, আজ খাওয়া দাওয়া হবে না? আর দাদা, তোমার আক্কেলই বা কি, বেলা কি কম হয়েছে?

কেদার বলিল,—তাই ত বোন্, ঠিক বলেছিস্। নাহে সুশীল বাবু, স্নান করে নেও, মোহিনীর আবার শীগ্‌গির বেরুতে হবে।

ভুবনমোহিনী বলিল,—দাদা, ভাল হবে না কিন্তু, আমাকে শুধু লোকের কাছে অপদস্থ করা, আমি বুঝি আমার জন্য বলেছিলাম?

কেদার বলিল,—আহা ক্ষেপিস্ কেন? না হয় আমার জন্যই বলেছি, তোর ত বের হতে হবে।

ভুবনমোহিনী এবার রাগিয়া বলিল,—তোমার মুণ্ডু করতে হবে, আমি আর কিছু বল্‌ব না।

সুশীল বলিল,—দিদির বুঝি খুব প্র্যাক্‌টিস্?

কেদার হাসিয়া বলিল,—নাহে ভায়া, আমি কিছু বল্‌ব না। দেখ্‌ছ না আমার বোন্‌টি তার প্র্যাক্‌টিসের কথা বল্‌লেই কেমন রাগ করে উঠে!

ভুবনমোহিনী বলিল, আপনারা আসুন সুশীল বাবু, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

কেদার সুশীল আহার করিতে বসিল, ভুবনমোহিনী তাহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিল।

সুশীল আহার করিতে বসিয়া আবার কেদারকে জিজ্ঞাসা করিল, দিদির বুঝি খুব প্র্যাক্‌টিস ?

কেদার এবার ভুবনমোহিনীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, কি কর্‌ব বল্‌? উত্তর দিব ?

ভুবনমোহিনী মুখ ফিরাইয়া বলিল, আমি জানি কি ?

কেদার এবার বলিল, ওর প্র্যাক্‌টিসের যন্ত্রণায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। কত রাত যে আমার এখন বসে বসে ঘর পাহারা দিতে হয়, তার আর অন্ত নাই।

দাদা, মিথ্যা কথা বোলো না, কবে তুমি জেগে ঘর পাহারা দিয়েছ ? কোনও দিনও রাত্রিতে ফিরে এসে গলা না ভাঙ্‌বার আগে তোমাকে জাগাতে পারিনি। তুমি আবার জাগ্‌বে, তুমি ত একটি কলিকালের কুম্ভকর্ণ।

সুশীল বলিল, বাস্তবিকই দিদির প্র্যাক্‌টিসের কথা শুনে বড়ই খুসী হলাম।

এমন সময় বাহির বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল। কেদার তাহা শুনিয়া বলিল, ঐ দেখ সুশীল, আবার মোহিনীকে যেন কে ডাক্‌তে এসেছে।

আবার কড়া নাড়ার শব্দ হইল, এবার ভুবনমোহিনী বলিল, তোমরা খাও, আমি দেখে আস্‌ছি কে ডাক্‌ছে।

ভুবনমোহিনী হাত ধুইয়া উপরে যাইয়া একটি সেমিজ গায় দিয়া বাহির বাড়ীর দরজা খুলিয়া দেখিল, একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন।

ভদ্রলোকটী তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, আপনার নামই কি ভুবনমোহিনী দেবী? নগেন বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হ্যাঁ, আমার নামই ভুবনমোহিনী, নগেন বাবু কেন পাঠিয়েছেন?

তার সঙ্গে একটা কেইস্ দেখ্‌তে হবে।

কখন যেতে হবে?

এখনই।

না, এখন ত যেতে পারব না, এখন পর্য্যন্ত ত আমাদের খাওয়া দাওয়াই হয় নাই। আপনাদের কেইস কি খুব জরুরি?

না তেমন নয়, তবে আর দুতিন ঘণ্টা পরে গেলেও হয়।

কাল গেলে হয় না?

না, তা হতে পারে না।

তবেই ত মুস্কিল দেখ্‌ছি।

আজ বিকেল পর্য্যন্ত গেলেও হয়। যদি বিকেলে যান, নগেন বাবুকেও সেই মত বলে রাখ্‌তে পারি।

ভুবনমোহিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, আমি বিকেলে পাঁচটার সময় যাব। আপনি নগেন বাবুকে বলে রাখ্‌বেন। অন্য দিন হলে আমি এর আগেই যেতে পারতাম, আজ আমাদের বাড়ীতে আমাদের কয়েকটি আত্মীয় এসেছে, তাই যেতে একটু দেরী হবে, নগেন বাবুকে একথা বল্‌বেন। বিকেলে গোটা পাঁচেকের সময় আপনাদের ওখানে যাব, হাতে আরও তিনটি জরুরি কেইস আছে, তাদের দেখেই আপনাদের ওখানে যাব।

ভদ্রলোকটি তাহার বাসার ঠিকানা বলিয়া চলিয়া গেলেন। ভুবন-মোহিনী দরজা বন্ধ করিয়া রান্না ঘরে আসিল। আসিয়া দেখে সুশীল কেদারের উভয়েরই পাত খালি। তাহা দেখিয়া ভুবনমোহিনীর বড়ই

লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। সে মালতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—যখন দেখ্‌লি পাত খালি, তখন ত তুইও দিতে পার্‌তি?

মালতী হাসিয়া বলিল, আমি এ বিষয়ে একেবারে আনাড়ি। দেখ, পাক করলেই ভাল খাওয়া হয় না, ভাল খাওয়া পরিবেশনকারীর উপরও অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। তোমার মত এমন মিষ্টি হাত কোথা পাব দিদি?

দাদারই ত বোন, কথায় যেন কথার সাগর।

মালতী হাসিয়া বলিল, বল, দিদিরই ত ছোট বোন্।

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল, আচ্ছা বোন্, হার মেনেছি।

ভুবনমোহিনী আবার উভয়কে পরিবেশন করিতে লাগিল। সুশীল আহার করিতে করিতে বলিল, কে এসেছিল দিদি?

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল, এ একটা নূতন কেইস।

সুশীল বলিল, তা হলে আপনার আজ ক জায়গায় যেতে হবে?

এখন আপাততঃ চার জায়গায়।

কেদার বলিল, দেখত ভায়া এই জন্যই ত আমি বলি, ওর যন্ত্রণায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি।

সুশীল বলিল, আচ্ছা দিদি, এখন মাসে মাসে আপনি কত পান?

আমি ঠিক বল্‌তে পারব না, দাদা বল্‌তে পারবে।

সুশীল হাসিয়া বলিল, আপনি কত পান কেদার কেমন করে বল্‌বে?

কেদার বলিল,—তা আমিই বল্‌তে পারব, ও যা টাকা পায় তা এনে আমার কাছেই দেয়, ও তার হিসাবও রাখে না, একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না কোন্ মাসে কত পায়। এখন মাস মাস দু শ টাকার কম পায় না।

কেদারের কথা শুনিয়া ভুবনমোহিনীর প্রতি সুশীলের সম্ভ্রম আরও বাড়িয়া উঠিল।

সুশীল বলিল, তা না হলে কি দিদি আপনার সুযশ আমাদের ওখান পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছেছে।

ভুবনমোহিনী বলিল, এখন ওসব কথা রেখে দিন্। বলি, পাতে যে এত জমাচ্ছেন, পাতের টা খাবে কে? জানেন ত আপনার পাতের টা খাওয়ার কেউ নাই?

সুশীল হাসিয়া বলিল, কি কর্‌ব দিদি, পেটের গহ্বরটা ভগবান যা দিয়েছেন তাই মাত্র সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, এখানে আস্‌বার সময় তার চেয়ে বড় করে ত তা আর আন্‌তে পারিনি। আগে যদি এমনটা জান্‌তাম, তবে না হয় গোটা দুই তিন পেট হাওলাত বরাত করেই নিয়ে আস্‌তাম।

না, না, ওসব বাজে কথা রেখে দিন। আমি জানি আপনি একদিন উকিল ছিলেন, আপনার সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না। এই দুর্দ্দিনে অত গুলি জিনিষ অপব্যয় কর্‌বেন না, আপনার পাতে রেখে দিলে ত তা রাস্তায় গড়াগড়ি যাবে।

যদি একান্ত এগুলিকে নাই উদ্ধার করতে পারি, তবে আমার সহধর্ম্মিনী, এ পুণ্য কার্য্যে না হয় আমার একটু সাহায্য কর্‌বেন।

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল,—সে বিষয়ে নিমাই, মালতী আপনার সহধর্ম্মিনী অন্য বিষয়ে হতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে নয়। তার কথা শুনেছেন?

সে কি রকম?

আপনি তামাক খান বলে আপনার কাছে যেতেও নাকি তার ঘেন্না করে, সে আবার খাবে পাতেরটা? হিন্দুদের মধ্যে ডাইভোর্স নাই

বলে, তা না হলে তার যা ঘেন্না, কোন্ দিন না জানি আপনাকে ডাই-ভোর্স করেই বস্তো।

বাবা, তামাকের উপর তার এত ঘেন্না! ঘোর পাপী সে, ঘোর পাপী সে! দিদি, জানেন, ভগবান এ পৃথিবীতে যত জিনিষ পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে বহু গবেষণা করে তামাকটা পঠিয়েছেন? এই তামাকের শত গুণ, এক মুখে তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। পুরাকালে পৃথিবীতে দুই রকম লোক বাস করত, এক হচ্ছে দেবতা, আর এক হচ্ছে অসুর। অসুরের প্রধান দেবতা শিব ঠাকুর, শিব ঠাকুরের প্রধান পানীয় হচ্ছে, সিদ্ধি আর গাঁজা। আমরা যে দেবতার বংশধর নই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, আমাদের স্বভাবেই তা প্রকাশ পায়। আমরা যে অসুরের বংশধর সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই, সুতরাং আমাদের পরমারাধ্যদেব মহাদেবকে ভজনা করতে হলে সিদ্ধি আর গাঁজা খাওয়া উচিত, তবে আমরা পাপী বলে তাঁর ভজনা ভাল করে শিখি নাই, গাঁজা টান্‌তে পারি না, সিদ্ধিও খেতে পারি না, গাঁজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তামাকটাকেই একটু সেবা করি, তাতেও যদি দেবতা একটু সন্তুষ্ট হন। দিদি, যারা প্রকৃত সাধু পুরুষ, যারা আমাদের পরমারাধ্যদেব শিব ঠাকুরকে প্রকৃত ভজনা করে, তারা গাঁজা খাবেই। যেমন দেখুন, যত সাধু সন্ন্যাসী সকলেই গাঁজা খায়। এখন বুঝলেন দিদি, তামাকের নিন্দা বা অপমান করবেন না, তাতে ভগবান অপ্রসন্ন হবেন। আর দিদি, হুকোর চেহারাটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন, কি এক অদ্ভুত আবিষ্কার! সাধন-ভজনের কি চমৎকার উপাদান! হুকোর খুলটা হচ্ছে, ব্রহ্মার কমণ্ডলু, নইচেটা হচ্ছে, বিষ্ণু ঠাকুরের মোহন বাঁশরী, আর কলকেটা হচ্ছে শিবঠাকুরের ধুতরা ফুল! এ তিন দেবতার তিন প্রিয় বস্তু দিয়ে এ হুকার জন্ম! দিদি, হুকার সেবা যে করতে পারে, তার হাতে হাতে মোক্ষ লাভ! আর আমার গিন্নী

ঠাকুরুণের কথা ছেড়ে দিন, সেত মহাপাপী, আমি হেন স্বামী দেবতা, তার অবজ্ঞা, তার নরকেও স্থান নাই।

সুশীলের তামাকের ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে কেদার বলিল,—ভাই, তামাকের একটা ব্যাখ্যা বের করেছ বটে, এটা তোমার সম্পূর্ণ original (মৌলিক গবেষণা), তুমি রীতিমত একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ হে!

ভুবনমোহিনী বলিল,—যা হোক্ সুশীল বাবু, আপনি এটা বড়ই অন্যায় কর্‌ছেন। আপনি কিছুই খাচ্ছেন না। আমি তবে এত পরিশ্রম করে পাক কর্‌লাম কেন?

আপনি পরিশ্রম করে পাক করেছেন বলে আমার পেটটির মায়া আমার পরিত্যাগ কর্‌তে হবে নাকি? শেষ কালে পেট ফেটে অকালে প্রাণত্যাগ করতে হবে যে, জিনিষ গুলো যেন আপনার হলো, পেটটি ত আমার, এটা আমার একেবারে নিজস্ব সম্পত্তি, তাত জানেন?

না, আপনার সঙ্গে কথায় আর পারা যাবে না। এখন খান।

তখন সুশীল কেদারকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—আচ্ছা দেখ, তোমাদের কি ইচ্ছা, আমি এ বেলাই চলে যাই?

সে কি প্রকার?

তা নয় ত কি? এত খাচ্ছি তাও দিদি বল্‌ছে কিছুই খেলাম না, এ যে রীতিমত অত্যাচার। এ যে রীতিমত Cruelty to animals (পশুর উপর নির্দ্দয় ব্যবহার)।

ভুবনমোহিনী হাসিতে হাসিতে বলিল,—না, আপনার সঙ্গে আর পার্‌ব না।

বেশ গল্প গুজবে কেদার সুশীলের ভোজন শেষ হইল। পাত্র ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াই সুশীল বলিল,—না দিদি, সত্যিই আমাকে নেহাৎ

গোবেচারি পেয়ে আমার উপর রীতিমত অত্যাচার করেছেন। দেখুন ত আমার পেটটার অবস্থা কি হয়েছে? এখন সোডা ঠোডা কিছু আনুন। আর পোড়া কপাল, তা আন্‌লেই বা কি হবে? তা খাবারও যে জায়গা নেই।

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল, আর ঢং কর্‌বেন না, হাস্‌তে হাস্‌তে আমার পেট ব্যথা হয়ে গেছে।

তৎপরে ভুবনমোহিনী, মালতী আহার করিতে বসিল। তাহারাও গল্প গুজব করিয়া বহুক্ষণ বসিয়া আহার করিল। বেলা তিন ঘটিকার সময় ভুবনমোহিনী গাড়ী করিয়া তাহার কেইস দেখিতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পরেই ভুবনমোহিনী বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আসিয়া দেখে সুশীল বাবু, কেদার, মালতী বেশ গল্প জমাইয়া বসিয়াছে। ভুবনমোহিনী বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া বলিল, আজ বুঝি গল্পটা বেশ জমেছে? কি বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল?

সুশীলই সর্ব্ব প্রথমে উত্তর দিল,—গল্প জমা দূরে থাকুক, সব বিষয়ই যেন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। আপনি না হলে আসর জমে না। আজ কত হলো দিদি?

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল,—বার টাকা।

সুশীল হাসিয়া বলিল,—আপনাকে আমারও হিংসা কর্‌তে ইচ্ছা করে।

আরও কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া ভুবনমোহিনী বলিল,—না, রাত হয়েছে রান্না চড়াই গিয়ে।

মালতী বলিল,—দিদি, এ বেলা আমি পাক কর্‌ব।

কেন? আমার রান্না ভাল হয়েছিল না?

তুমি কেবলই দুষ্টামি কর, আমি বুঝি তার জন্য বলেছি? তুমি খেটেখুটে এসেছ, আবার এখন পাক কর্‌তে যাবে?

এ পরিশ্রম ত আজ আমার নূতন নয়, পরিশ্রম না কর্‌লে আমার শরীর ভালই থাকে না। আর এ বেলা বেশী কিছু পাক কর্‌ব না, তোমরা সকলেই বল্‌ছ, তোমাদের ক্ষিদে বেশী নাই, তাই এ বেলা কয়েকখানা লুচি, আর দুই একটা তরকারি পাক কর্‌ব।

সুশীল বলিয়া উঠিল,—দিদি, লুচি নামক স্বদেশী দ্রব্যটির উপর আমার মমতাটা একটু বরাবরই বেশী। আমার মনে হয়, মুনি ঋষিরা যত জিনিষ আবিষ্কার করেছিলেন, তার মধ্যে এটাই প্রধান। যখন ফুলকো লুচি গুলো ঘির মধ্যে নেচে নেচে ভাস্‌তে থাকে, তখন মনে হয় কি জানেন? লুচি গুলো যেন ডেকে ডেকে বলছে, কে আছ রসস্বাদজ্ঞ, আমায় সাদরে গ্রহণ করবে এস। দিদি, ওটা যতই কেন না খাই, ওটার তৃপ্তি আমার কিছুতেই মিটে না।

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল,—দেখ্‌বেন সুশীল বাবু, যেমন স্বদেশী দেখ্‌ছি আপনাকে শেষকালে না চাকরিটি যায়?

না দিদি, আমি বুঝি শুধু এবিষয়েই স্বদেশী? আমার সঙ্গে যা জিনিষ এসেছে তার মধ্যে একটা জিনিষ বিদেশী বের করুন ত। আমি দেশের আর কিছু করতে না পারি, দেশী জিনিষটা ব্যবহার কর্‌তে পারি ত, এটা ত আর কেউ আমায় মানা করে না। কিন্তু এটা বল্‌তে পারি, তোমাদের মেয়ে মহালে এখনও বিদেশীর মায়াটা ছাড়তে পার নি।

সে বিষয়ে আপনি অনুযোগ দিতে পারেন। আমাদের মেয়েদের দিকে দেখা যায়, দিন দিনই বাবুগিরির মাত্রা বেড়ে চলেছে। বাবুগিরি কমাতে না পার্‌লে তারা বিদেশীর মায়া কমাতে পারবে না।

যে দেশে বার মাসই এক প্রকার সমস্ত দেশময় হাহাকার সে দেশে আবার বাবুগিরি কেন? এটা আমাদের প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে রাখা উচিত, বিদেশী যে জিনিষটুকুই কিন্‌ব, সেই পরিমাণে

আমি গরীব হলাম। দেশের মোটা জিনিষও ভাল, বিদেশীর চাকচক্য, অতি মসৃণ জিনিষও ভাল নয়, যদি আমার নিজের ছেলে সুন্দর না হয়, তবে কি পরের সুন্দর ছেলের সৌন্দর্য্য দিয়ে আমার ছেলের সৌন্দর্য্যের সাধ মিটাব? দিদি, তুমি আর যাই অনুযোগ দেও, এ বিষয় আমাকে অনুযোগ দিতে পার না। তৎপরে হাসিয়া বলিল, আর লুচি নামক যে দ্রব্যটীর কথা বলেছ, তা ত দেব-ভোগ্য; তার উপর যদি সন্দেশ রসগোল্লা থাকে তবে ত কথাই নাই।

সে কেমন?

এখনকার দিনে দেবতা কারা? যাদের আমরা পূজা করি তারাই ত দেবতা? কাদের আমরা পূজা করি? নিশ্চয়ই সাহেবদের। সেই সাহেবরাও লুচি নামক জিনিষটাকে খুব আদর করে। আজ কয়েক বছর হলো চিকাগোতে একটা একজিবিসন হয়েছিল, তাতে এদেশ হতে কয়েকজন ময়রা গিয়েছিল, তারা সারাদিন লুচি বানিয়েই অবসর পেত না, সাহেবরা সেই লুচি খেয়ে ভারতবর্ষের বড়ই ভক্ত হয়ে উঠেছিল। আর এক সাহেব ভ্রমণকারীর কথা বলি, তা আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছি, সে তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তা বলেছে। তার বাড়ী রাণাঘাট অঞ্চলে, ট্রাঙ্ক রোডের পারে। সে বলেছে, একদিন তারা কয়েক জন রাস্তা দিয়ে বেড়াচ্ছে, এমন সময় একটা মোটর গাড়ী ভস্ ভস্ করে এসেই তাদের কাছে থট্ করে থেমে পড়ল। মোটর থেকে এক সাহেব নাম্‌ল, ইঞ্জিনের সামনে গিয়ে ইঞ্জিনটা ঘট্ ঘট্ করতে লাগল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। সাহেব ঘণ্টা খানেক ত ইঞ্জিনটা সমান করতে চেষ্টা করল, কিন্তু কৃতকার্য্য হল না। তখন সাহেব মহা বিপদে পড়ে গেল, এখন করে কি? সাহেব এসে আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলো, এখানে কোনও কামার মিস্তির আছে? আমার বন্ধু বল্লো, এখানে এখন

কোনও কামার মিস্তিরি পাওয়া যাবে না, কাল ভোরে পাওয়া যাবে। তখন সাহেব বল্‌ল, এখানে কোনও ডাক বাঙ্গালা আছে? আমার বন্ধু বল্‌ল, না, এখানে ডাকবাঙ্গালা নাই। তখন সাহেব মহা বিপদে পড়ে গেল, এখন সে রাত্রিতে থাকে কৈ? তার সেই অবস্থা দেখে আমার বন্ধু সাহেবকে বল্‌ল, আমাদের বাড়ীতে চলুন, আজ রাত্রিতে আমাদের ওখানেই থাক্‌বেন। সাহেব আমার বন্ধুর বাড়ীতে গেল। রাত্রিতে খাওয়ার জন্য সাহেবকে খান কতক ফুলকো লুচি, কয়েকটা সন্দেশ, কয়েকটা রসগোল্লা আর কিছু বুটের ডাল মাংস মিশিয়ে তারা দিল। সাহেব সর্ব্ব প্রথমেই লুচি বুটের ডাল দিয়ে খেল; তা খেয়েই সাহেব বলে উঠ্‌ল, Oh! it is very nice (এটা ত খুব ভাল), তারপর সন্দেশ মুখে দিল, তা মুখে দিয়ে সাহেব বলে উঠ্‌ল, It is really very very nice (এটা ত খুবই ভাল), তারপর রসগোল্লা মুখে দিয়ে সাহেব বলে উঠ্‌ল, Oh, it is heavenly (এটা একেবারে স্বর্গীয়)! এখন দেখ দিদি, দেবতারা যদি এসবকে এত সমাদর কর্‌তে পারে, আমরা ত কোন্ ছার?

ভুবনমোহিনী হাসিতে হাসিতে বলিল, না, আপনি দেখ্‌ছি হাসাতে হাসাতে মার্‌বেন।

ভুবনমোহিনী রন্ধনাদি শেষ করিয়া সুশীল কেদারকে বলিল, তোমরা এসে এখন খেতে বস, মালতী বেলে দিক্, আমি গরম গরম লুচি ভেজে দিবো।

মালতী লুচি বেলিয়া দিতে লাগিল, ভুবনমোহিনী ভাজিতে লাগিল। কয়েক খানা লুচি ভাজা হইলে সুশীল, কেদার আহার করিতে বসিল। আহার করিতে বসিবার সময় সুশীল দুই খানা লুচি থালা হইতে উঠাইয়া গালে পুরিয়া পিড়িতে উপবেশন করিল।

ভুবনমোহিনী তাহা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—ছেলে মানুষি এখনও গেল না।

সুশীল বলিল, দিদি,—আশীর্ব্বাদ করুন. তা যেন এ জীবনে যায়ও না, বুড়ো ত এক কালে হবই, কালের নিয়ম ত আর আমি ধরে রাখ্‌তে পার্‌ব না, যতদিন ছেলে মানুষ থাকা যায় ততই ভাল। সুশীল লুচির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিল।

সুশীলচন্দ্রের ছুটি ফুরাইয়া আসিল, এ কয়টা দিন বেশ আমোদ আহ্লাদেই কাটিল।

আগামী কল্য সুশীল মালতীকে নিয়া চলিয়া যাইবে। রাত্রিতে মালতী ভুবনমোহিনীকে ধরিল, দিদি, আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বে?

বল না বোন্ কি বল্‌বে? তোমায় অদেয় আমার কি আছে?

তা হলে বলি, হতাশ কোরো না কিন্তু, দিন কয়েকের জন্য আমাদের ওখানে চল না?

একথা শুনিবামাত্র ভুবনমোহিনীর বদনকমল যেন একেবারে ম্লান হইয়া গেল। কে যেন হঠাৎ একটা কালির তুলি দ্বারা ভুবনমোহিনীর বদনকমল লেপন করিয়া দিল। সেই দণ্ডেই তাহার মনে হইল, সে যে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, সে যে সমাজের বাহিরে, সে যে স্বামী কর্ত্তৃক কলঙ্কিনী বলিয়া ঘৃণিতা, লাঞ্ছিতা।

সে তখন ধীরে ধীরে বলিল, বোন্, তোমার অনুরোধটা আমি রাখ্‌তে পারলাম না, আমায় ক্ষমা করো।

কেন দিদি? তুমি যে আমার বোন্, মায়ের পেটের বোন্।

বোন্ কি বল্‌ব আর! আমি কুলবধূ হয়ে কুলচ্যুতা হয়েছি, আমি আমার ন্যায্য আসন পুনর্ব্বার দখল না করা পর্য্যন্ত আমার পরিচয় লোক

সমাজে দিব না, যখন আমি আবার আমার আসন দখল কর্‌ব, তখন তোমাদের সকলের কাছে যাব, এর আগে না।

মালতী বুঝিল ভুবনমোহিনী কত দুঃখের সহিত এই কথা গুলি বলিল। সে ভুবনমোহিনীকে আর তাহাদের ওখানে নিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিল না। ভুবনমোহিনীর কথা শুনিয়া মালতীরও মনে হইতে লাগিল, আমাদের সমাজে পুরুষ যখন ইচ্ছা করিবে আদর করিয়া স্ত্রীলোককে কোলে তুলিয়া নি.ব,'যখন বীতরাগ হইবে পদাঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিবে! এই ত আমাদের নারীর স্থান? নারীর নারীত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে না পারায় এই নারীর মতও পবিত্রা, এই নারীর মতও পতিব্রতা, এই নারীর মতও উদার হৃদয়া, এই নারীর মতও পুতচরিত্রা, আজ স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, সমাজে ঘৃণিতা, লাঞ্ছিতা! ভুবনমোহিনীর অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া মালতী ভুবনমোহিনীর কোলে মুখ লুক্কায়িত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, দিদি, আর তোমায় এখন এ অনুরোধ কর্‌ব না। তুমি তোমার স্থান আবার দখল কর্‌বেই কর্‌বে, তখন আমার দিদিকে আমি নিয়ে যাব।

ভুবন মাহিনীর এ অবস্থা সহিয়া গিয়াছিল, সে ধীর স্থিরভাবে বলিল,— হ্যাঁ বোন্, তাই আশীর্ব্বাদ কর।

তৎপর দিবস সুশীল মালতীকে নিয়া চলিয়া গেল।

মাস ছয় চলিয়া গেলে ভুবনমোহিনী মনে করিল, এখন কেদার দাদাকে বিবাহের কথা বলা যাইতে পারে, এখনত আর তাহাদের টাকার কোনও দুঃখ নাই। টাকার সচ্ছলতা দেখিয়া প্রায়ই তাহার মনে হইত, না জানি স্বামী এখন কি ভাবে আছেন, তিনি অনাহারে দিন কাটাইতেছেন না ত? কেদার দাদাকে পাঠাইয়া স্বামীর খবর আনিতে তাহার এক একবার প্রবল বাসনা হইত, আবার তখনই তাহার মনে হইত, কেদার দাদা স্বামীকে যে অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছে, স্বামীর চরিত্র যেরূপ সেই অবস্থায় এই দেবতুল্য লোককে কেমন করিয়া সেই পুতি গন্ধময় স্থানে পাঠাইয়া দেয়? কেদার দাদাও কি আর সেই স্থানে যাইতে স্বীকৃত হইবেন? সেই বা তাহাকে এমন অন্যায় অনুরোধ কেমন করিয়া করিবে? যদিও স্বামীর চিন্তা তাহাকে অনুক্ষণ উৎপীড়িত করিত, তবুও স্বামীর চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া শত বাসনা সত্বেও স্বামীর কোনও খবর নিতে পারিল না।

একদিন ভুবনমোহিনী কেদারকে বলিল, দাদা, আমার একটা কথা রাখ্‌বে?

কি বল্‌ না? আজ আবার দেখ্‌ছি তোর এক অদ্ভুত ভাব? বল্‌ত আজ পর্য্যন্ত কোন্‌ কথা তোর রাখিনি?

একথার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে তাই তোমাকে আগেই বলে নিচ্ছি।

বল্‌না তুই কি বল্‌বি, রাখ্‌বার সাধ্য থাকলে নিশ্চয়ই রাখ্‌ব। তোর

কথা রাখ্‌ব না ত কার কথা রাখ্‌ব ? তোর কথা ফেল্‌বার ক্ষ
আমার রেখেছিস্ দিদি ?

এখনত আর টাকার কোনও কষ্ট নাই, তুমি এখন দুশ টাকা পাচ্ছ, আমিও এখন বেশ পাচ্ছি, এখন তুমি বিয়ে কর না কেন ? অনিতা ছাড়াও ত এসংসারে অনেক গুণবতী রূপবতী মেয়ে আছে।

ভুবনমোহিনীর কথায় কেদারকে একটু অন্যমনস্ক করিয়া ফেলিল। অনিতার সদা হাস্যময়ী বদনকমল তাহার স্মৃতিপটে উদয় হইল, অনিতার সহিত অতীত জীবনের সৌখ্যভাব স্মৃতিপথে উদয় হওয়ায় সেই সুখ স্মৃতি তাহাকে বড়ই ব্যথিত করিল। সে এতদিন সকল কাজ কর্ম্মে যেন অনিতার স্মৃতিকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, আজ ভুবনমোহিনীর কথায় আবার অনিতার মুখচ্ছবি খানা তাহার হৃদয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল। তাহার বিশ্বাস ছিল সে অনিতাকে কালের স্রোতে বিস্মৃতির সলিলে ডুবাইতে পারিবে, কিন্তু সে ত অনিতাকে সাময়িক উত্তেজনার বশে ভালবাসে নাই, অনিতা যে ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রেতন্ত্রে তাহার রাজত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে, অনিতার স্মৃতি ভোলা যে তাহার জীবনব্যাপী চেষ্টা করিলেও অসাধ্য, অনিতার স্মৃতি তাহার মানস পটে উদয় হওয়ায় তাহাকে অনিতার চিন্তায় একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকিয়া বলিল, মোহিনী, তুই কথাটা যত সহজে বল্‌লি, আমি কিন্তু কথাটা তত সহজে নিতে পারি না। আমি কিন্তু অপর কোনও মেয়েকে বিয়ে করার কথা এতদিন তেমন করে একদিনও ভাবি নাই। চিন্তা করে দেখ্‌ব কি করি, তোকে আমার মত শীগ্‌গিরই জানাব।

অনিতার শরীর বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। রমেশ বাবুর মুখে অনিতা কেদারের মাহিয়ানা বৃদ্ধির কথা শুনিতে পাইল, ধর্ম্মঘটের সময় কেদার অনাহারে তাহার জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে চলিয়াছিল, সে

...জন্য, জাতীয়তার জন্য নিজের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে ..., তাহারই একপ্রকার স্বার্থত্যাগে ধর্ম্মঘট কিপ্রকার সসম্মানে মিটমাট হইয়াছে, এসব কথা অনিতা শুনিতে পাইয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, কেদার দা, আজ তুমি কোথায়? তোমার অমানুষিক কার্য্যের কথা শুনিয়াও আজ আমার হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস তোমার কাছে জ্ঞাপন করিতে পারিলাম না। একবার তাহার মনে হইল, একখানা চিঠি লিখিয়া তাহার আন্তরিক ভক্তি ও আনন্দ কেদার দার নিকট প্রকাশ করিয়া পাঠায়, আবার সেই দণ্ডেই তাহার মনে হইল, না তাহা ত হইতে পারে না, সে না অপরের পত্নী হইতে চলিয়াছে! অনিতা তাহার মাতার নিকট শুনিয়াছে, সুধীরের সহিত তাহার বিবাহ হইবে ঠিক হইয়াছে, তাহার শরীর ভাল হইলেই বিবাহ হইবে। সে মনে মনে তখন বলিল, তাহার শরীরটা ভাল না হইলেই ভাল হয়, তাহার এই উৎসৃষ্ট হৃদয় অপরকে কি করিয়া দান করিবে? তাহার আকাঙ্ক্ষাও যেন পূরণ হইল। তাহার শরীর এত খারাপ হইয়া পড়িল যে সে আর বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। ডাক্তাররা যখন দেখিলেন, আর কোনও চিকিৎসাতেই ফল হয় না, তখন তাহারা বলিলেন, একে চেইঞ্জে নিয়ে যান, সেখানে এর শরীর ভাল হতে পারে।

রমেশ বাবুও তাহাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। বহু স্থানের অনুসন্ধান করিয়া তাহারা পুরুলিয়া যাওয়া সুস্থির করিলেন। অনিতাকে নিয়া রমেশ বাবু তাহার স্ত্রী ও পুরাতন ঝি সহ পুরুলিয়া চলিয়া গেলেন।

লোককে যেন নিয়তিদেবী কিছুতেই শান্তিতে থাকিতে দেন না। লোকে আট ঘাট বাঁধিয়া কত সাধের সংসার পাতিয়া বসে, কত আশা বুকে ধরিয়া কত সুখের ভিত্তি স্থাপন করে, নিয়তিদেবী তখন অলক্ষ্যে থাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলেন, অন্ধ মানবগণ, তোমরা ভাব এক, আমি

করি আর এক, তোমাদের সমস্ত আশা ভরসা আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে ধূলিস্মাৎ করিয়া দেই।

ভুবনমোহিনী এখন বেশ রোজগার করিতেছে, সে মনে মনে সংকল্প করিল, অজিতকে সে এখন মানুষ করাইয়া উঠিতে পারিবে, তাহার শ্বশ্রুঠাকুরের শেষ আজ্ঞা সে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে পারিবে, কেদারদাকে বিবাহ করাইয়া সে সংসার পাতিয়া বসিবে, কিন্তু তাহার সে সাধে বড় বাঁধা পড়িল। অজিতকে নিয়া তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল, অজিতের ঘুরিয়া ঘুরিয়াই জ্বর হইতে লাগিল, তাহার সেই দিব্য বদনকমলে যেন এক কালির ছায়া পড়িয়া গেল, চক্ষুদ্বয় কোটরাগত হইয়া গেল, হাত পা শুকাইয়া চলিতে লাগিল। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে আবার পেটের পীড়া দেখা দিল। কেদার, ভুবনমোহিনী বড় বড় হোমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক ডাক্তার দ্বারা অজিতের চিকিৎসা করাইল, তাহাতে যখন কোনও ফল দর্শিল না, তখন ভাল কবিরাজ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করাইল, কিন্তু তাহাতেও তাহার রোগের কোন উপশম না হইয়া বরং রোগ দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। অজিতকে নিয়া তাহারা বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল।

অজিতের অসুখ বৃদ্ধি হওয়ার পর হইতে কেদারের যেন কাজ করিতে আর ভাল লাগিতেছে না, প্রায়ই কেদারের কাজে শিথিলতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহার কার্য্যের শিথিলতা অন্যান্য কর্ম্মচারীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

যোগেন বাবু কেদারের ঐ অবস্থা দেখিয়া একদিন কেদারকে বলিলেন, কেদার, তুমি এখন বসে বসে ভাব কি? তোমার মুখে যেন সেই হাসি আর এখন দেখ্‌তে পাই না, কাজেও দেখছি এখন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়। এতদিন থেকে এক সঙ্গে কাজ করছি, এ ভাব ত তোমার কোনও দিনও দেখিনি। ব্যাপারটা কি হয়েছে বলত?

কেদার বলিল, আমার ভাগ্‌নের বড় অসুখ। এ সংসারে এখন যদি আমার কেউ প্রিয় থাকে, তবে আমার এই ভাগ্‌নে। চিকিৎসার ত ত্রুটি কর্‌লাম না, কিন্তু তাকে যে বাঁচাতে পারি বিশ্বাস হয় না।

কি অসুখ

জ্বর, সঙ্গে সঙ্গে পেটের অসুখ। দুদিনও ভাল থাকে না। শরীরে এখন আর কিছু নাই, শুধু হাড় কখানার উপর চাম আছে।

তা হলে তুমি এক কাজ কর, ওকে স্থানপরিবর্ত্তন কর। সময় সময়ে এ সব রোগীর স্থান পরিবর্ত্তনেও শত চিকিৎসার ফল ফলে যায়। আমি এমনও দেখেছি, এই সব রোগীকে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে নিয়ে গেলে, হাওয়া পরিবর্ত্তনেই বিনা চিকিৎসাতেও রোগী আরোগ্য হয়ে যায়।

আমিও ভাব্‌ছি একে অন্য কোথায়ও নিয়ে যাব, কিন্তু কোথায় যাব ঠিক করে উঠ্‌তে পার্‌ছি না।

তুমি এক কাজ কর না কেন? পুরুলিয়ায় আমার একখানা বাড়ী আছে, তা এখন খালি। বাড়ীখানা বেশ ভাল জায়গায়। পুরুলিয়ার জল বায়ু খুব ভাল। তুমি সেখানে যেয়ে আমার বাসায় গিয়ে থাক, পুরুলিয়া জ্বরের পক্ষেও ভাল, পেটে অসুখের পক্ষেও ভাল। আমার ওখানে গেলে বাসাও ভাল পাবে, তোমার টাকারও সাহায্য হবে।

কেদার হাসিয়া বলিল, কেন, বাসাটি মাগ্‌নাই পাওয়া যাবে নাকি?

যোগেন বাবু কেদারের পিঠে এক চাপড় দিয়া বলিল,—আহাম্মক কোথাকার, ছোট ভাইয়ের থেকে বড় ভাই আবার বাসা ভাড়া নেয় নাকি?

কেদার যোগেন বাবুর পদধূলি নিয়া বলিল,—দাদা, আমি তোমাকে এত দিনেও চিন্‌তে পারি নাই, তার জন্য আমি ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি।

যোগেন বাবু হাসিয়া বলিল, খুব কথা শিখেছ ত! ছেলে [illegible]

থিয়েটার করতে নাকি? এখন যে নাটকের গদই আওড়াচ্ছ। যাক্ সে কথা, এখন তোমার পুরুলিয়া যাওয়ার কি করলে?

নিশ্চয়ই যাব। এ বিষয়ে কি আর আপত্তি আছে? দাদা তুমি যে আমার কি উপকার করলে তা আর কি বল্‌ব? আমি কালই ৬ মাসের ছুটির দরখাস্ত কর্‌ব। এখন কি আর দেরী করতে পারি?

না, যে রকম তোমার ভাগ্‌নের কথা শুন্‌লাম তাতে আর দেরী করা উচিত নয়।

কেদার দুই মাসের ছুটী নিয়া ভুবনমোহিনী ও অজিতকে নিয়া পুরুলিয়া যাইয়া যোগেন বাবুর বাসায় উঠিল। এখানে আসিবার কতক দিন পরেই অজিতের পীড়ার যেন একটু উপশম হইল, তাহার চেহারারও একটু পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, এখন আর তাহার জ্বর আসে না।

মাসেক কাল হইল কেদার ভুবনমোহিনী ও অজিতকে নিয়া পুরুলিয়া আছে। এখানের জল বায়ু প্রকৃত পক্ষেই অতি স্বাস্থ্যকর। এখানকার হাওটাই যেন স্নিগ্ধকর, জলেও একটু বিশেষ স্বাদ আছে। এখানকার জলের হজম শক্তিই বেশী। এখানকার হাওয়া গায় লাগিলেই যেন শরীরে বেশ স্ফূর্ত্তি হয়, শরীরের জড়তা যেন অনেক পরিমাণে লাঘব হয়। সাহেব বাঁধ নামে একটি দীর্ঘিকা আছে, তাহার পার দিয়া ভ্রমণ করিলে শরীরের গ্লানি যেন আপনা আপনিই দরীভূত হইয়া যায়। প্রাতে ও বৈকালে বহু লোক এই স্থানে ভ্রমণ করতে আসে।

কেদার ভুবনমোহিনীকে বলিল, অজিত ত রোজই বিকেলে সাহেব বাঁধের ধারে বেড়াতে যায়, চল না আজ আমরা এক জায়গায় বেড়িয়ে আসি?

ভুবনমোহিনী বলিল,—কোথায়?

এমন জায়গায় তোকে আজ নিয়ে যাব, সেখানে গিয়ে দেখ্‌বি আত্মোৎসর্গের চরম দৃষ্টান্ত, কত লোক নিজের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করে অপরের সেবার জন্য অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছে, যে ব্যাধিগ্রস্ত লোককে দেখ্‌লে অপর লোক দশ হাত পরিমাণ দূরে সরে পড়ে, সেখানে যেয়ে দেখ্‌বি সেই ব্যাধিগ্রস্ত লোককে কি প্রকারে অপরে সেবা করছে। সেটা কি জানিস্? সেটা হচ্ছে কুষ্ঠাশ্রম। মানবের যত প্রকার ব্যাধি হতে পারে, কুষ্ঠ ব্যাধির মত আর ব্যাধি নাই; লোকে কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত লোককে দেখ্‌লেই ঘৃণায় ও ভয়ে দূরে সরে পড়ে, আর সেইখানে দেখ্‌বি

সেই কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত লোকের ক্ষত কত লোক ধৌত করে দিচ্ছে। এই আশ্রমটি সেবা ধর্ম্মের চরম দৃষ্টান্ত। চল না আজ সেই আশ্রমটি দেখে আসি।

চলনা দাদা, তাতে কি আর আমার আপত্তি আছে?

বৈকালবেলা কেদার ভুবনমোহিনীকে নিয়া কুষ্ঠাশ্রম দেখিতে গেল। কুষ্ঠাশ্রমটি সহরের বাহিরে অবস্থিত, সহরের লোকালয়ের সহিত সম্পর্ক নাই। সেখানে বহু কুষ্ঠ রোগী থাকিবার স্থান আছে। আশ্রমের ফণ্ড হইতে রোগীদিগের খাওয়া চলে। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পুরুষদের জন্য, কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের জন্য, আবার কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শিশুদের জন্য বিভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। আবার যে সব রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়াছে; অথচ সেই সব সন্তানের এখনও রোগ হয় নাই, তাহাদের জন্য আবার ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। ছেলেদিগের পাঠের ব্যবস্থা আছে, তাহাদের জন্য শিক্ষক আছে, তাহাদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানকার এসব বিষয়ের ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা দেখিলে বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয়। দেশের লোকের সহানুভূতির উপরই আশ্রমটি স্থাপিত, যাহারা সেই আশ্রম পরিদর্শন করতে যায়, সকলেই প্রায় সেই আশ্রমের সাহায্য কল্পে কিছু দান করিয়া আসে।

কেদার ও ভুবনমোহিনী সেই আশ্রমটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। শিশুদের ঘর দেখা হইল, স্ত্রীলোকদিগের ঘর দেখা হইল, পুরুষদিগের ঘর তাহারা দেখিতে লাগিল। এক ঘরে যাইয়া হঠাৎ তাহাদের দৃষ্টি এক ব্যক্তির উপর পতিত হইল। ভুবনমোহিনী তাহাকে দেখিয়াই ছুটিয়া যাইয়া তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইল। ঐ লোকটি ভুবনমোহিনীকে চিনিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। সে অবাক্ হইয়া কেদারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল!

কেদার তখন তাহাকে বলিল,—নিশি বাবু, চিন্‌তে পাচ্ছেন না আপনার পায়ের নীচে কে পড়ে?

নিশিকান্ত বলিয়া উঠিল,—অ্যাঁ, আপনি না সুরেন বাবু? ইহা বলিয়া সে ভুবনমোহিনীকে ধরিয়া উঠাইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভুবনমোহিনী নিশিকান্তের ঐ অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতেছিল। নিশিকান্ত ভুবনমোহিনীর মুখের দিকে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিল, তৎপরে তাহার চক্ষুদ্বয় হাত দিয়া মুছিয়া বলিল, আমি কি ঠিক দেখ্‌ছি, আমি ত পাগল হলেম না? একি আমার স্ত্রী নয়?

কেদার বলিল,—এ আপনার হতভাগিনী স্ত্রী ও আমার বোন্ বটে।

নিশিকান্ত এই কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নিশিকান্তের চক্ষে কেহ কোনও দিন জল দেখে নাই, আজই সম্ভবতঃ জ্ঞান হওয়ার পরে নিশিকান্তের চক্ষে প্রথম জল বাহির হইল। ভুবনমোহিনীকে দেখা মাত্র তাহার ভুবনমোহিনীর প্রতি অতীত ব্যবহারের কথা স্মরণ পথে উদিত হইল, তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে ভুবনমোহিনীকে বলিল,—আমি পাপিষ্ঠ, নরাধম, তাই তোমার সাথে এমন ব্যাভার করেছি। আমি হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌তে পেরেছি, সতী সাধ্বীর উপর এরূপ অমানুষিক অত্যাচার কর্‌লে তার পরিণাম এই হয়। তোমার মত অমূল্য রত্নকে আমি চিন্‌তে পেরেছিলাম না। আমি নরপিশাচ, আমার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে, আমি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হয়েছি, এর চেয়ে বড় সাজা আর কি আছে?

নিশিকান্তের মাথা যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। কেদার ভুবনমোহিনীকে সেইখানে বসাইয়া রাখিয়া আশ্রমের অধ্যক্ষের সহিত দেখা করিতে গেল। কেদার চলিয়া গেলে ভুবনমোহিনী নিশিকান্তের মাথায় বাতাস দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নিশিকান্ত

লাফ দিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল,—সরে যাও, সরে যাও. আমার ছায়াও মারিও না। আমার বাতাসও যেন মানুষের গায় লাগে না। তোমাকে তোমার বাপ মা ছেলেবেলা বিষ খাওয়িয়ে মেরেছিল না কেন? তা হলে ত আর আমার মত নরপিশাচের সঙ্গে তোমার বিয়ে হতো না? সরে যাও, সরে যাও আমি কি, আর তুমি কি? আমি জেনেছি, তুমি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রা, সতী সাধ্বী, আর আমি—

ভুবনমোহিনী দেখিল, নিশিকান্তের অতীত জীবনের কথা স্মরণ হওয়ায় আত্মগ্লানি আসিয়াছে। দেখিল, এমন ভাবে বকিলে ত জীবন-সংশয় হইতে পারে। সে তাহাকে ধরিয়া আবার বিছানায় শোওয়াইয়া মাথায় একটু জল দিয়া বাতাস দিতে দিতে বলিল, এমন বক্‌ছ কেন? আর তোমাকে আমি কথা বল্‌তে দেব না, তোমার জ্বর হয়েছে, মাথাও বড় গরম, কথা বল্‌লে মাথা আরও গরম হয়ে যাবে। তুমি এখন চুপ করে শুয়ে থাক। তুমি যে জেনেছ, আমি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রা, এই ঢের। কেদার দাদা আশ্রমের অধ্যক্ষের নিকট গিয়েছে, সে তার অনুমতি নিয়ে আস্‌লে তোমাকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাব।

না, না, তা হবে না। তা আমি কিছুতেই যাব না। এই জায়গাই আমার মত লোকের উপযুক্ত স্থান। তুমি এত মহৎ আর আমি এত নীচ! তোমার সংসর্গে আমি

ভুবনমোহিনী নিশিকান্তের আত্মগ্লানি দূর করিবার জন্য তাহাকে আর কথা বলিতে না দিয়া বলিল,—তুমি চুপ কর, পরে কথা হবে। এত লোকের মধ্যে কি স্বামী স্ত্রীতে কথা হয়?

কিছুক্ষণ পরে কেদার আশ্রমের অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়া আসিল। কেদার আশ্রমের অধ্যক্ষের নিকট নিশিকান্তের নামে এক শত টাকা দান করিয়া আসিল। নিশিকান্তকে নিয়া তাহারা বাসায় চলিয়া আসিল।

বাসায় যাইয়া তাহারা দেখিতে পাইল, নিশিকান্তের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে কুষ্ঠ ব্যাধিতে ক্ষত হইয়াছে, সমস্ত শরীর ফুলিয়া গিয়াছে, তাহাও ফাটিয়া যেন শীঘ্রই ক্ষত বাহির হইবে প্রায় সারাদিনই জ্বর লাগিয়া আছে, শরীরের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহার আর বেশী দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।

অজিত তখনও বেড়াইয়া আসে নাই। তাহারা আসিবার কিছুক্ষণ পরেই অজিত বেড়াইয়া আসিল। অজিত নিশিকান্তকে দেখিয়া কেদারকে জিজ্ঞাসা করিল, এ কে মামু?

কেদার বলিল,—কে চিনছিস্ না বল্‌দা বেটা? এ যে তোর বাবা।

"ও বাবা!" ইহা বলিয়া সে কেদারের নিকট ঘেষিয়া বলিল, "মামু কোলে।" সে কেদারের কোলে চড়িয়া বসিল। বাবা তাহার বড় মনঃপূত হইল না, বাবাকে দেখিয়া সে বরং কিছু ভীতই হইল।

অজিতকে দেখিয়া নিশিকান্ত আবার কাঁদিতে লাগিল। এমন সুন্দর, ননীর পুতুলের সঙ্গে সে কি পাপিষ্ঠ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার পরিণাম এই দাঁড়াইয়াছে, তাহার শত প্রবল বাসনা সত্ত্বেও সে তাহার ননীর পুত্তলিকে বুকের মধ্যে আনিয়া প্রাণ শীতল করিতে পারিতেছে না। তাহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

নিশিকান্ত কেদারকে বলিল, সুরেন বাবু।

অমনি কেদার তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, মশায়, আমার নাম সুরেন নয়, আমার নাম কেদার। আমার চৌদ্দপুরুষের মধ্যেও কেউ সুরেন নাই।

নিশিকান্ত থতমত খাইয়া বলিল,—আচ্ছা কেদার বাবু, আপনি আমার এত হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে আমার এই সর্ব্বনাশ করলেন কেন? আমি নরকের ঘৃণিত কীট, আমি কি লোকালয়ে থাকার উপযুক্ত? আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন? এ ব্যাধি সংক্রামক, এ ব্যাধিগ্রস্ত লোকের কাছে কি কেউ থাকে? আপনারা আমায় আবার সেখানে দিয়ে আসুন।

কেদার বলিল,— নিশিবাবু আপনি কেন বাজে কথা বল্‌ছেন ? আমরা যা ভাল বুঝেছি তাই করেছি।

ভুবনমোহিনী বলিল,—এত বক্‌ছ কেন ? চুপ করে শুয়ে থাক।

ভুবনমোহিনীর কথায় নিশিকান্তের প্রাণে আবার ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ভাগ্যগুণে এমন স্ত্রী পাইয়াও সে জীবন-তরী ঠিক ভাবে চালাইতে না পারায় আজ তাহার এই শোচনীয় পরিণাম ! 'যদি এই রমণী-রত্নের প্রকৃত গুণের মর্ম্ম বুঝিয়া তাহারই উপদেশ মত জীবন অতিবাহিত করিত, তবে আজ এই ননীর পুত্তলির ন্যায় পুত্র নিয়া ও এমন গুণবতী, রূপবতী স্ত্রী নিয়া কত সুখেই না তাহার জীবন অতিবাহিত হইত !

ভুবনমোহিনী নিশিকান্তের মাথায়, চক্ষে গোলাপ জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নিশিকান্ত ঘুমাইয়া পড়িল। সেই রাত্রিতে নিশিকান্ত আর জাগিল না। তাহারাও আর কেহ তাহাকে জাগাইল না। কেদার ও ভুবনমোহিনী মনে করিল, এই উত্তেজনার পর সুনিদ্রা হইলে শরীরের পক্ষে ভাল।

তৎপর দিবস ভুবনমোহিনী ও কেদার দেখিতে পাইল, নিশিকান্ত কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। ভুবনমোহিনী নিশিকান্তকে একবাটি গরম দুগ্ধ ও একটু পাওয়ারুটি টোষ্ট করিয়া খাইতে দিল। নিশিকান্ত তাহা আহার করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। অজিতকে চাকর দিয়া বেড়াইতে পাঠান হইল। কেদার ও ভুবনমোহিনী নিশিকান্তের নিকট আসিয়া বসিল।

কেদার বলিল,—বলুন ত নিশিবাবু, আমি সেই আপনার সাথে দেখা করে আসার পর হতে এ পর্য্যন্ত কি কি হয়েছে ?

নিশিকান্ত বলিতে লাগিল,—আপনি ত আমাকে প্রায় নয় শ টাকা দিয়ে এলেন, আমার কাছে টাকা দেওয়া ? টাকা পেয়ে আমি মদ আর

মাগীতে সেই টাকা ছয় সাত মাসের মধ্যেই প্রায় খরচ করে ফেল্‌লাম, তার পর অনেক কষ্টে আরও কয়েক দিন চালালাম। শরীরের উপর অত্যাচার আর কত সয়? আমার এই ব্যাধি হলো। জমিদারের কর্ত্রী হয়েছেন এখন নরেন্দ্র বাবুর স্ত্রী, যে দিন আমি এই সতী সাধ্বীকে পরিত্যাগ করে বাড়ী ফির্‌লাম, সে দিন থেকেই তিনি আমার উপর মনে মনে চটে রইলেন। তিনিই তারপরে দেওয়ানকে পাঠিয়ে আমার তহবিল তছ্রুপ ধরেন। আমার স্ত্রীর উপর তার একটা প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, এই সব কথা আমি পরে শুনেছি। আমার কুষ্ঠব্যাধি হওয়ার কথা শুনে তিনি বল্লেন, আমার জায়গায় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক থাকৃতে পাবে না, তিনিই আমাকে এই আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌লেন, আর বল্‌লেন, তিনি দশ টাকা করে মাস মাস আমার শেষ পক্ষের স্ত্রীর ও কন্যার ভরণ পোষণের জন্য দিবেন, এবং তা দিচ্ছেনও। আমিও তখন অনাহারে মরি, সেই ব্যবস্থা আমিও অনুমোদন করলাম। তাই আমি চার মাস যাবৎ এখানে, আমার শেষ পক্ষের স্ত্রী ও কন্যা বাড়ীতে আছে। এই ব্যাধি হওয়ার পর একদিন বসন্তকে ডেকে এনে শপথ করিয়ে আমি নরেন্দ্রনারায়ণের খুনের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, তখন সে প্রকৃত কথা বলে বল্‌ল, বাবু, আপনার স্ত্রী সতী, সাধ্বী, আমি যা বলেছি তা আগাগোড়া মিথ্যা, আপনার স্ত্রী যা আদালতে বলেছেন তাই ঠিক। তখন হতেই আমি অনুতাপানলে জ্বল্‌ছি। ইহা বলিতে বলিতে নিশিকান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, সে শুইয়া পড়িল।

কেদারের ছুটির দিন ফুরাইয়া আসিল, তাহারা সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়ার আয়োজন করিতে লাগিল। পরামর্শ করিয়া ইহাও ঠিক হইল, কলিকাতায় যাইয়া কেদার নিশিকান্তের এ পক্ষের স্ত্রী ও কন্যাকে কলিকাতায় নিয়া আসিবে।

কেদারের কলিকাতা যাওয়ার আয়োজন ঠিক হইয়া গিয়াছে, তাহার ছুটির আর মাত্র তিন দিন বাকী। নিশিকান্তের রোজ জ্বর হয়, শরীর ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। ভুবনমোহিনী প্রভৃতি সকলেই বুঝিতে পারিল, নিশিকান্তের কালের ডাক পড়িয়াছে। ভুবনমোহিনী নিশিকান্তের যথা-সাধ্য সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল, কিন্তু নিশিকান্তের ব্যাধি দুরারোগ্য, তাহা সেবা বা চিকিৎসাতে কি হইবে? মানব কাজ করিয়া যাইতে পারে, ফলের উপর ত তাহার কোনও হাত নাই। দিনের পর রাত্রি হয়, রাত্রির পর দিন হয়, মানব জীবনেও সেইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ভুবনমোহিনী স্ত্রীর আসন দখল করিল বটে, স্বামী দর্শন পাইয়াও তাহার সিঁথির সিন্দুর চিরদিনের জন্য ঘুচিতে চালল।

কেদার আজ বৈকাল বেলা বেড়াইয়া বাসার দিকে চিন্তিত চিত্তে আসিতেছে, সে যে জীবনের গতি কোন্ দিকে প্রবাহিত করিবে, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ভুবনমোহিনীর প্রস্তাবের উত্তর আজ পর্য্যন্ত সে দিয়া উঠিতে পারে নাই। সে বিবাহ করিবে কি না তাহাও সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এক এক বার সে মনে করিত, বিবাহের প্রয়োজন কি, বর্ত্তমান জীবনই ত বেশ, মুক্ত জীবন, এই ত সুখের, আবার সময় সময় মনে হইত, গার্হস্থ্য ধর্ম্মও কি ধর্ম্ম নয়? তাহার বিবাহ করাই উচিত। জীবন সমস্যা কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে রাস্তা দিয়া নিজ মনে চিন্তা করিতে করিতে আসিতেছিল, হঠাৎ

তাহার দৃষ্টি পড়িল, রমেশ বাবুর পুরাতন ঝি যেন একটি বাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া আছে। সে তাহাকে দেখিয়াই তাহার নিকটে গেল। ঝিকে বলিল,—কি, তুমি এখানে যে?

ঝি উত্তর করিল,—অনিতাদির বড্ড ব্যারাম, সম্ভব বাঁচবে না, তাকে এখানে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য আনা হয়েছে।

তোমরা আজ কতদিন যাবৎ এখানে আছ?

প্রায় চার মাস হলো।

এখানে আছে কে কে?

বাবু, ঠাকুরুণ, অনিতাদি আর আমি।

কেন অনিতার স্বামী আসে নাই?

ঝি হাসিয়া বলিল,—অনিতাদির কি বিয়ে হয়েছিল যে তার স্বামী আসবে?

কেন, তার সম্বন্ধ না ঠিক হয়েছিল, তুমিই না বলেছিলে?

সম্বন্ধত ঠিকই আছে, এখন বিয়ে হবে কি? অনিতাদি আজ বছর খানেক যাবৎ ত ব্যারামেই ভুগছে। ব্যারাম ভাল হলেই বিয়ে হতো। আর যে বিয়ে হয় মনে হয় না, যমের সঙ্গেই না জানি বিয়ে হয়।

তাদের কোন্ বাড়ী?

এই বাড়ীই।

কেদার আর কিছু শুনিতে চাহিল না, সে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল, ঝির কিংবা বাড়ীর কর্তৃপক্ষের আদেশের বা অনুমতির প্রতীক্ষায় রহিল না। সে একেবারে অনিতার প্রকোষ্ঠে যাইয়া উপস্থিত হইল। যাইয়া দেখে, অনিতা কঙ্কাল সদৃশ বিছানায় চক্ষু বুজিয়া শুইয়া আছে। সে অনিতার বিছানায় যাইয়া অনিতার একখানা হাত ধরিয়া বলিল,—অনু, চেয়ে দেখ তোমার কেদার দা এসেছে।

অনিতা যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিল, সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, তৎপরে অতি মৃদু স্বরে বলিল,—একি সত্যি, না আমি এখনও স্বপ্নই দেখ্‌ছি ?

কেদার বলিল, সত্যি, আমিই অনু।

কেদার এই কথা বলা মাত্রই অনিতা কেদারের একখানা হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিয়া বলিল,—আর তোমাকে যেতে দেবো না, তুমি বড় নিষ্ঠুর !

অনিতার কথা শুনিয়া কেদারের হৃদয়ে ভয়ানক আন্দোলন চলিতে লাগিল, অনিতার কথা শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল, অনিতার হৃদয়ের স্রোত কোন্ দিকে বহিতেছে, তখন তাহার মনে হইতে লাগিল, অনিতা না অপরের বাগ্‌দত্তা কন্যা। তাহার কি করা কর্ত্তব্য, সে যেন কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তাহার হৃদয়ে তখন তুমুল ঝড় বহিতে লাগিল।

অনিতা হঠাৎ বলিয়া ফেলিল,—কেদার দা, যদি আমি না বাঁচি, আমার গুরুদক্ষিণা ত দেওয়া হবে না, আমার গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করলে না ?

কেদার চাহিয়া দেখিল, অনিতার চক্ষু মুদ্রিত, সে যেন স্বপ্নের ঘোরে এ কথাগুলি বলিয়া ফেলিল। এ কথাগুলি বলিয়াই অনিতা চুপ করিয়া রহিল। কেদারের হৃদয়ের ভীষণ ঝড় এক মুহূর্ত্তেই প্রশমিত হইয়া গেল, এক মুহূর্ত্তে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল।

কেদার অনিতার হাত ধরিয়া বলিল,—অনু, আমার গুরুদক্ষিণা আমি গ্রহণ কর্‌লাম। আজ থেকে আমার দক্ষিণা আমা হতে কেউ নিতে পার্‌বে না, আজ থেকে তুমি আমারই।

কেদার দেখিল, এই কথা শুনিবামাত্রই অনিতার বদন কমলে যেন এক আনন্দের জ্যোতিঃ বিকশিত হইয়া উঠিল, মরণের যাত্রী যেন আবার বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, এক মুহূর্ত্তেই যেন অনিতার বিষাদক্লিষ্ট বদন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, এক মুহূর্ত্তেই যেন বহু চিকিৎসকের

বহুদিনের গবেষণাযুক্ত চিকিৎসার ফল তাহা দেহে ফলিয়া গেল। অনিতার বদনের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কেদারের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল।

রমেশ বাবু তাহার স্ত্রী ভিন্ন প্রকোষ্ঠে কাজ করিতেছিলেন। রমেশ বাবু অনিতার প্রকোষ্ঠে আসিয়া দেখেন, অনিতার বিছানায় কেদার বসিয়া। তিনি যেন তাহার চক্ষুকে হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি কেদারের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—একি কেদার, তুমি এখানে?

কেদার রমেশ বাবুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল,—হাঁ, আমি এখানে আজ প্রায় দুমাস হলো এসেছি. অনিতার এত অসুখ, আমাকে জানান নি কেন? আমি কি এতই পর?

রমেশ বাবু কেদারের হাত ধরিয়া বলিল,—বাবা, আর লজ্জা দিও না, ভুল ভ্রান্তি সকলেরই আছে। পিতার দোষ কি সন্তান মার্জ্জনা করতে পারে না?

রমেশ বাবুর কথা শুনিয়া কেদারের আনন্দাশ্রু বহিল, সে বলিল,— আমাকে কি বল্‌ছেন? আমি যে আপনার সেই আশ্রিত, অনুগৃহীত কেদার, আপনি কি আমার কাছে কোনও দোষ করতে পারেন? না আপনার দোষ দেখা আমার সাধ্য আছে?

রমেশ বাবু বলিলেন, -এখন তুমি এসেছ, তোমার অনিতাকে তুমি বাঁচাও, অনিতা তোমার হাতেই বড় হয়েছে, তুমিই তাকে মরণের পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। ইহা বলিয়াই তিনি তাহার স্ত্রীকে ডাক দিলেন,--ওগো, এদিকে একবার এসত।

রমেশ বাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়া কেদারকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! তিনি কিছুক্ষণ ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন, তখন রমেশ বাবু বলিলেন,—কি, অমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইলে যে?

রমেশ বাবু স্ত্রী বলিলেন,—কে, কেদার না ?

কেদার উঠিয়া যাইয়া রমেশ বাবুর স্ত্রীর পদধূলি নিয়া বলিল,—হাঁ মা, আপনার ছেলে কেদারই।

কেদারের কথায় রমেশ বাবুর স্ত্রীর মন স্নিগ্ধ হইয়া গেল, এ যে সেই পূর্ব্বস্বর, এই যে বহু পূর্ব্বের মধুর "মা" ডাক, সে ডাক ত তিনি বহুদিন যাবৎ শোনেন নাই, কেদারের "মা" ডাকে আবার তাহার মনে পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই যেন কেদার তাহার আবার সেই কেদার রূপে মনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন,—তুমি এখানে কবে এলে, বাবা?

কেদার বলিল,—জানেন ত মা আমার একটি বোন্ আছে যার ছেলেকে আপনারা দেখেছেন, তাকে নিয়ে আমি এখানে প্রায় দুমাস হলো এসেছি। অজিতের ম্যালেরিয়া হয়েছিল, তাই তার হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে নিয়ে এসেছিলাম।

তোমরা এখানে আছ কে কে ?

আর কে থাকবে মা, আমি আছি, আমার বোন আছে, আর তার স্বামীর ব্যারাম, তিনিও আছেন, আর অজিত ত আছেই।

কেদারের কথা শুনিয়া রমেশ বাবুর স্ত্রীর হৃদয় আত্মগ্লানিতে ভরিয়া গেল। কেদারের প্রতি কি অন্যায় সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া কি অন্যায় ব্যবহারই না এতদিন তিনি করিয়াছেন। তিনি কিছুক্ষণ কেদারের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—বাবা, আমি তোমার প্রতি এতদিন কি অন্যায় ব্যবহারই করেছি, তুমি তা ভুলে যাও, অনিতাকে তোমায় দিলাম, তোমার অনিতাকে তুমি বাঁচাও। আমার দোষে আজ আমি অনিতাকে হারাতে বসেছি।

কেদার হাসিয়া বলিল,—মা কুপুত্র হয়, কুমাতা ত হয় না, মার কি দোষ হতে পারে? আর অনিতা, সেত ভাল হবেই।

কেদার সেই বেলা সেখানে আহার করিল। বহুদিন পরে আজ অনিতা উঠিয়া বসিয়া রমেশ বাবুর ও কেদারের খাওয়া দেখিল। আহার করিতে বসিয়া কেদার ভুবনমোহিনীর ও শশিকান্তের অতীত কাহিনী তাহাদের নিকট বিবৃত করিল। ভুবনমোহিনীর ইতিহাস শুনিয়া রমেশ বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—এ রকম স্ত্রীলোক এখনকার দিনেও জন্মে? আমি তার প্রতি কি অবিচারই করেছি

রমেশ বাবু বলিলেন, এ রকম স্ত্রীলোক শুধু ভারতেই সম্ভবে।

অনিতা বলিল, কেদার দা, দিদিকে এনে একদিন আমাকে দেখাবে না?

অনিতার এই কথা শুনিয়া কেদার মনে মনে বলিল, হাঁ, এখন তাকে এখানে নিয়ে আস্‌তে পারি, এখন সে তার ন্যায্য আসন দখল করে বসেছে, এখন তার অন্যস্থানে যেতে কোনও বাধা নাই। অনিতাকে সে বলিল,—আচ্ছা, কাল তাকে তোমাদের এখানে নিয়ে আস্‌ব, তোমরা দেখ্‌বে আমার বোনের বর্ণনার প্রতি বর্ণ ঠিক।

কেদার বাসায় যাইয়া ভুবনমোহিনীর নিকট রমেশ বাবুর বাসার ঘটনা বিবৃত করিল। তৎপর দিবস কেদার ভুবনমোহিনীকে নিয়া রমেশ বাবুর বাসায় বেড়াইতে গেল। ভুবনমোহিনী রমেশ বাবু ও তাহার স্ত্রীর পদধূলি গ্রহণ করিল। ভুবনমোহিনীর কাহিনী শুনিয়া রমেশ বাবুর বাসার সকলের হৃদয়ই ভুবনমোহিনীর প্রতি সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিয়াছিল। ভুবনমোহিনীকে দেখিয়া তাহারা মনে মনে বলিলেন কেদারের বর্ণনার এক চুলও ভুল হয় নাই।

রমেশ বাবুর স্ত্রী ভুবনমোহিনীকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, তুই কি মা কোনও স্বর্গের ছদ্মবেশী দেবী

ভুবনমোহিনী হাসিয়া বলিল,—সন্তানের মুখের উপর তাকে কি এত প্রশংসা করতে হয় মা?

অনিতা ভুবনমোহিনীর পদধূলি গ্রহণ করিল, ভুবনমোহিনী তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া হাসিয়া বলিল, কর্‌লি কি লো বোন্? তুই যে আমার গুরুজন হতে চলেছিস্। কেদার দাকে দেখে বুঝি জ্ঞান-হারা হয়েছিস্?

অনিতা হাসিয়া বলিল,—তোমার মত নারীর পায়ের ধূলা মাথায় পেলে যে সশরীরে স্বর্গবাস!

ভুবনমোহিনী হাসিয়া অনিতার গালে এক ঠোনা মারিয়া বলিল,—এত কথা বল্‌তে না পারলে কি আমার কেদার দা এমন ভাবে মজেছে? বোন্, পতির মতই পতি পাবে।

ভুবনমোহিনী, কেদার সেই বেলা রমেশ বাবুর বাসায়ই আহার করিল। বৈকাল বেলা তাহারা বাসায় ফিরিল, কিন্তু অজিতকে অনিতা রাখিয়া দিল। বাধ্য হইয়া কেদারের আরও দশ দিনের ছুটি নিতে হইল। তৎপরে কেদার, ভুবনমোহিনী নিশিকান্ত অজিতকে নিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল। অনিতার শরীর এ কয় দিনেই এক রকম সারিয়া উঠিয়াছে, এখন আর জ্বর হয় না। আরও কতক দিন সেখানে থাকিয়া রমেশ বাবু সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া কেদার অনিতার বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

নিশিকান্তের শরীরের অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সমস্ত শরীর ফাটিয়া ঘাঁ হইয়া গিয়াছে, সমস্ত দিন সে যন্ত্রণায় চীৎকার করে। আজ চারি মাস হইল ভুবনমোহিনী নিশিকান্তকে নিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে, চিকিৎসাও অনেক প্রকার করাইল, ভুবনমোহিনী প্রাণপণে সেবা করিল, কিন্তু নিশিকান্তের দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম না হইয়া তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল।

ভুবনমোহিনী ভোলানাথ বাবুর নিকট চিঠি লিখিল, বাবা, আপনার মেয়েকে একবার দেখিয়া যাইবেন, সে পুনরায় তাহার আপন দখল করিয়াছে, তাহার স্বামী তাহার নিকট মৃত্যুশয্যায়। যদি পারেন আসিবার সময় মাকে এবং দাদাকে নিয়া আসিবেন।

ভোলানাথ বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি একটি বড় মোকদ্দমার কাগজ দেখিতেছিলেন, সেই মোকদ্দমার মক্কেল তাহাকে দৈনিক বহু টাকা দিতেছিল, আট দিবস যাবৎ সেই মোকদ্দমা চলিতেছে, আরও মাসেককাল সেই মোকদ্দমা চলিবে, সঙ্গে তিন চারিজন জুনিয়ার উকিল আছেন, সেই উকিল বাবুরাও তাহার বৈঠকখানায় বসিয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজাদি দেখিয়া মোকদ্দমার পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময় ডাক পিয়ন তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া গেল। মেয়েলোকের হাতের লেখা দেখিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ চিঠিখানা খুলিলেন, চিঠিখানা পড়িয়াই আনন্দে তিনি বিছানা হইতে

লাফাইয়া উঠিলেন, অন্যান্য উকিল বাবুদিগকে ও মক্কেলকে বলিলেন, আপনারা একটু বসুন, আমি বাড়ীর ভিতর থেকে আসি।

ভোলানাথবাবু এক রকম উৰ্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর ভিতরে গেলেন। গিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—গিন্নি কই, এদিকে এস, মায়ের খবর পেয়েছি।

ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী আসিলে ভোলানাথ বাবু বলিলেন, মা চিঠি লিখেছে, পড়। আজকের বারটার গাড়ীতেই যাবো, তার উদ্যোগ কর।

ইহা বলিয়াই তিনি বাহির বাড়ী আসিয়া মক্কেলকে বলিলেন,—দেখুন, আজ আমি কলকাতায় যাবো, আপনার মোকদ্দমা আমি আর কর্‌তে পার্‌ব না, আমি আমার মাকে দেখ্‌তে যাবো।

অন্যান্য উকিল বাবুরা বলিলেন, -সে কি রকম?

ভোলানাথ বাবু বলিলেন,—আমি আমার মাকে আগে দেখে আসি পরে এবিষয় আপনাদের কাছে সব বল্‌ব। এখন কিছুই বল্‌তে পার্‌ব না।

মক্কেল বলিলেন,—আমার মোকদ্দমার কি হবে?

বড়ই দুঃখের বিষয় আমি আর এ মোকদ্দমা কর্‌তে পার্‌লাম না, হয় আপনি আমার সঙ্গে যে উকিল বাবুরা আছেন তাদের দিয়েই মোকদ্দমা করান, না হয় অন্য কোনও সিনিয়ার উকিল রেখে নিন্, আমি সম্ভবতঃ মাসেক কালের মধ্যে আস্‌তে পার্‌ব না।

ভোলানাথ বাবুর প্রতি মক্কেলের অগাধ বিশ্বাস, তাঁহার বহু টাকার সম্পত্তি নিয়া মোকদ্দমা। তিনি ভোলানাথ বাবুকে বলিলেন,—আপনাকে চাই-ই, আপনি না হয় আরও বেশী টাকা নিন, আপনি গেলে আমার সৰ্ব্বনাশ।

ভোলানাথ বাবু মক্কেলকে হাসিয়া বলিলেন,—দেখুন, টাকাতে কি আর

সব ক্ষতি পূরণ করা যায়? আমার প্রাণ যে কলকাতায় চলে গেছে, আমি যদি আজ যেতে না পারি তবে আমি বাঁচবই না। আপনার মোকদ্দমা করবে কে? আমাকে মাপ করুন। আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চল্লাম।

মক্কেল এবং অন্যান্য উকিল বাবুরা দেখিলেন, কি যেন ঘটনা ঘটিয়াছে, কলিকাতা যাইবার জন্য ভোলানাথ বাবু যেন উন্মত্ত হইয়াছেন, ভোলানাথ বাবুকে ত তাহারা কোনও দিনও এত উত্তেজিত দেখেন নাই। তাহারা অগত্যা ভোলানাথ বাবু হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

ভোলানাথ বাবু সপরিবারে কলিকাতায় গেলেন। ভোলানাথ বাবুর গাড়ীর শব্দ শুনিয়া ভুবনমোহিনী দোতালা হইতে নীচে নামিয়া আসিল; ভোলানাথ বাবুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া সে বলিল,—বাবা, মেয়ে পালিয়ে এসেছিল বলে ক্ষমা করলেন ত?

ভোলানাথ বাবু বলিলেন,—তোকে যে এ জীবনে আর দেখতে পাব এমন ভরসা ত করিনি মা। তুই-ই আমাকে ক্ষমা করবি, তোকে আমি খুব আশ্রয় দিয়েছিলাম!

বাবা, আর ও কথা তুলবেন না, অতীতের কথা সকলই ভুলে যান। আশীর্বাদ করুন আপনারই যেন উপযুক্ত মেয়ে হতে পারি।

তৎপরে ভুবনমোহিনী ভোলানাথ বাবুর স্ত্রীর ও অতুলের পায়ের ধূলা নিল। ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী ভুবনমোহিনীকে বলিলেন,—মা, আমায় ক্ষমা করেছিস্ ত? তোর উপর আমি কি অবিচারই করেছিলাম!

ভুবনমোহিনী বলিল, কন্যার কাছে মা কি কোনও অপরাধ করতে পারে?

অতুল এতক্ষণ কোনও কথা বলে নাই, সে এক্ষণে বলিল,—মোহিনী, আমার কি ক্ষমা আছে? আমি যে মহা পাপী।

ভুবনমোহিনী বলিল,—কি বলছ দাদা, তুমি যে আমার দাদা, তুমি পাপী হলে ত আমিও পাপী। এখন বৌদি কবে আসবে বল ?

ভুবনমোহিনী তাহাদিগকে উপরে নিয়া গেল, তখন নিশিকান্তের জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। ভুবনমোহিনী স্বামীকে দেখাইয়া ভোলানাথ বাবুকে বলিল,—বাবা, আশীর্ব্বাদ করুন তাঁর আত্মা যেন পরকালে শান্তি পায়। আপনার পায়ের ধূলা তাঁর মাথায় দিন, তবেই তিনি মুক্তি পাবেন।

ভোলানাথ বাবু তাহার পায়ের ধূলা নিশিকান্তের মাথায় দিল। নিশিকান্তের আত্মা ভবধামের মায়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সমাপ্ত।